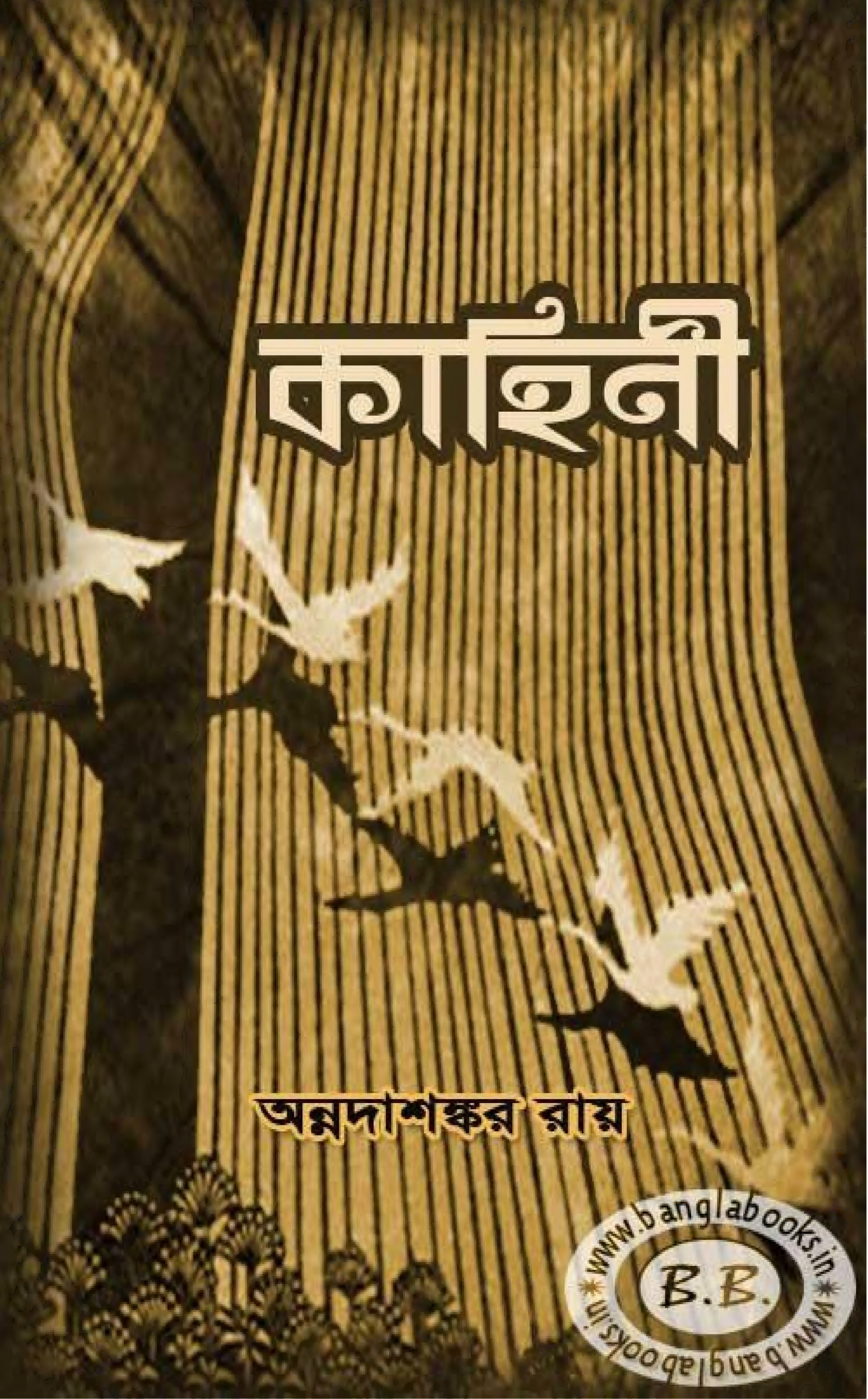
কাহিনী
অন্নদাশঙ্কর রায়
www.banglabooks.in
B.B.
www.banglabooks.in

কাহিনী

অন্নদাশঙ্কর রায়

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.banglabooks.in
Click here

ভূমিকা

আমার প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পগুলি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। খণ্ডগুলির নাম 'প্রকৃতির পরিহাস', 'মন পবন' ও 'যৌবনজ্বালা'। পরে সেই তিনটি খণ্ডকে একত্র করে একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হয়। তার নাম রাখা হয় 'গল্প'।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ছোট গল্পগুলির কতক প্রকাশিত হয় 'কামিনীকাঞ্চন' ও 'রূপের দায়' এই দুই নামে। অন্যান্যগুলি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত থাকে। পরে সব ক'টিকে একত্র করে আর একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হয়। তার নাম রাখা হয় 'কথা'।

এবার তৃতীয় পর্যায়ের ছোট গল্পগুলিকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ না করে আরো একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হচ্ছে। এর নাম রাখা হচ্ছে 'কাহিনী'।

অন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রীমতী গীতা রায়

বড়ো বউমা

াণীয়াসু

সূচী

চণ্ডাশোক ... ১
আঙিনা বিদেশ ... ১৪
যে বাঁচায় ... ২৮
যুবরাজ ... ৪১
স্বস্ত্যয়ন ... ৫২
অসিধার ... ৬৬
জোড়বিজোড় ... ৭৮
উত্তরজীবন ... ৯০
অমৃতের সন্ধানে ... ১০৩
পলায়নবাদী ... ১১৬
দুই জগতের মাঝখানে ১৩২
পথি নারী বিবর্জিতা ... ১৪৫
যমের অরুচি ... ১৫৬
আহারের পূর্বে প্রার্থনা ১৭১
মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে ১৮৬
গুপ্ত কথা ... ২০০
অনিকেত ... ২০৮
পুরানো পাপী ... ২২২
বৃহন্নলা ... ২৩৪
সব শেষের জন ... ২৪৬
বিনা প্রেমসে না মিলে ২৫৮

চণ্ডাশোক

রিভলভার না পিস্তল দিয়ে সেদিন কী মর্মান্তিক ট্র্যাজেডীই না ঘটে গেল বীরভূমে। ওই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল দুই প্রতিবেশীতে।

"চন্দ, আপনি হলে পারতেন ? না, আপনি হলে রিভলভারই ধরতেন না। আপনি যে আবার ঘোর অহিংসাবাদী।" মালাকার বলেন ঠেস দিয়ে।

"অশোকও তো ঘোর অহিংসাবাদী ছিলেন। কিন্তু জীবনের প্রথমদিকে নয়। কলিঙ্গের যুদ্ধের পরে।" চন্দ বলেন রহস্যময় করে।

"সে কী! আপনিও পারতেন! আমার বিশ্বাস হয় না একথা।" মালাকার বলেন।

"আর একটু হলেই ঘটে যেত ওইরকম এক ট্র্যাজেডী। ঘটেনি যে এর জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হয়।" চন্দ তাঁর যৌবনকালে ফিরে যান।

"কবে! কোথায় ? কেমন করে ?" এক নিশ্বাসে বলে যান মালাকার।

"বছর সাঁইত্রিশ আগে। অ্যাণ্ডারসনী আমলে। আমি যখন শ্যামপুরের মহকুমা হাকিম। সেসব কথা শুনতে কি আপনার ভালো লাগবে ?" চন্দ ইতস্তত করেন।

"বুঝেছি। টেররিস্টের পাল্লায় পড়েছিলেন।" মালাকার যেন সবজান্তা।

"আপনার আন্দাজ ঠিক নয়। ব্যাপারটা নারীঘটিত।" চন্দ মজা করে বলেন।

"আরে, তা হলে তো এক্ষুনি শুনতে হয়। এ যে রীতিমতো গোয়েন্দা কাহিনী। হাকিম, রিভলভার, নারী। বলুন, বলুন। না শুনে আমি উঠছিনে।" ভদ্রলোক জাঁকিয়ে বসেন ও সিগারেট ধরান।

বাকিটা চন্দর আত্মকথা।

॥ দুই ॥

রিভলভার বা পিস্তল আমি কতবার কতজনকে দিয়েছি। মানে তার লাইসেন্স দিয়েছি। ইনসপেকশনের সময় কতবার নাড়াচাড়া করেছি। আমার দেহরক্ষীদের রিভলভার রোজ রাত্রে কনফিডেন-শিয়াল আলমায়রার ভিতরে নিজের হাতে বন্ধ করেছি। কিন্তু নিজে কখনো রিভলভার রাখিনি। যখন ইচ্ছা ছিল তখন দরকার ছিল না, আমার দেহরক্ষীদেরই তো রিভলভার ছিল। যখন সন্ত্রাসের যুগ শেষ হলো তখন দেখি ইচ্ছাটাই লোপ পেয়েছে। তার কারণ ইতিমধ্যে ঘটে গেছে একটা কাণ্ড। একটা বিপ্লব।

শ্যামপুরে আমি কেবল মহকুমা হাকিম নই, আমি সরকারী হাসপাতালের প্রেসিডেণ্ট। একদিন হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে স্টাফের সকলের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁদের একজন হলেন সুশীলা সরকার। ট্রেণ্ড মিডওয়াইফ। অবিবাহিতা, হিন্দু তরুণী। সুরূপা নয়, কিন্তু ফরসা আর তন্বী। সদ্য পাস করে কলকাতা থেকে এসেছেন। সরকারী ডাক্তারই ওকে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ভরসা দিয়ে আনিয়েছেন, কিন্তু মিডওয়াইফের কল তো সাধারণত রাত্রে। মেয়েটি একা বেরোতে ভয় পায়। ওঁর সঙ্গে যায়ই বা কে? মা তো অসুস্থ। তাই আমার কাছে ওঁর নিবেদন আমি যেন সরকারকে লিখে একটি আয়ার বন্দোবস্ত করি।

তখনকার দিনে সরকারকে লিখে বছরে তিনশোটি টাকা বরাদ্দ করাও শক্ত ছিল। আমি চেষ্টা করি যদি কোনোখান থেকে প্রাইভেট

ডোনেশন যোগাড় করতে পারি। মহকুমা হাকিমরা এসব বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। খোঁজ নিতে আরম্ভ করলুম কে কে রায়সাহেব হতে চান। কিংবা লোকাল বোর্ড নমিনেশন পেতে চান।

ওদিকে পারিবারিক প্রয়োজনে লেডী ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন ছিল। লেডী ডাক্তার তো নেই, সবে ধন নীলমণি ওই ট্রেণ্ড মিডওয়াইফ। মিসেস চন্দ একদিন ওঁকে কল দিলেন। ইনি টাকা নিতে চান না। বলেন, "আমি নিজের গরজেই এসেছি। আমার একটা নালিশ আছে। সাহেবকে বলতে সাহস হয় না। আপনি যদি দয়া করে শোনেন।"

ওঁর দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে আমার গৃহিণী আমাকে বলেন, "তুমিই এখানকার শাসনকর্তা। লোকটিকে শাসন করা তোমারই কর্তব্য। মেয়েটাকে অন্য কী ভাবে প্রোটেকশন দিতে পারো ভেবে দেখ। কিন্তু জানাজানি যেন না হয়। হলে ওরই বদনাম হবে। সমাজ তো সেই অযোধ্যার সমাজ। যত দোষ মেয়েদেরই।"

জায়গাটা সত্যি খুবই রক্ষণশীল। খ্রীস্টান মিডওয়াইফ আরো বেশী বয়সের পাওয়া যেত, কিন্তু কেউ ঘরে ঢুকতে দেবে না। হিন্দু চাই। কিন্তু তখনকার দিনে হিন্দুর মেয়েরা ট্রেনিং নিতে এগিয়ে আসত না। এলে কলকাতা শহর ছেড়ে যেত না। এই মেয়েটি অগ্রণী। এঁকে প্রোটেকশন দিতে হবে স্থানীয় রোমিওদের হাত থেকে। সম্প্রতি এক রোমিও জুটেছেন, তিনি দুগুণ বয়সের বিবাহিত পুরুষ। মুনসেফ আদালতের কেরানী। অনাহূতভাবে উপকার করতে এসে তার বিনিময় প্রত্যাশা করেন। রোজ রাত্রে মেয়েটির কোয়ার্টার্সে গিয়ে হানা দেন। কাকুতিমিনতি করলেও নড়তে রাজী হন না।

তখনকার দিনে মহিলারা কেউ দোকানে গিয়ে শাড়ি ব্লাউস জুতো জামা ওষুধপথ্য কিনতেন না। লোক পাঠালে দোকানদার এসে বাড়িতে পৌঁছে দিত বা লোকের হাতে দিত। মেয়েটির তো পাঠাবার মতো লোক নেই, তাই তিনি প্রতিবেশীদের সাহায্য

নিতেন। জানতেন না যে এর একটা অলিখিত শর্ত আছে। আসত যারা তারা দিনের বেলা আসত, এক পেয়ালা চা খেত, আর কিছু প্রত্যাশা করত না। কিন্তু এই লোকটি আরো কিছু চায় বলে রাতের বেলা আসে। সিগারেট ধরায়। ওঠবার নাম করে না। মা না থাকলে কী জানি কী চেয়ে বসত। মাও তো শয্যাশায়ী।

এরূপ ক্ষেত্রে হাকিমরা উভয়পক্ষকে খাস কামরায় ডেকে পাঠাতেন। কাছারির খাস কামরায় কিংবা বাংলার খাস কামরায়। আমি ভেবে দেখলুম কোর্টে তলব করার চেয়ে বাংলায় তলব করাই ভালো। বাইরের কেউ টের পাবে না। মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে শহরময় রাষ্ট্র হবে না। নালিশটা যদি প্রমাণ হয় তবে ক্রিমিনাল ট্রেসপাসের দায়ে জেলও হতে পারে, জরিমানাও হতে পারে। চাকরিটাও যেতে পারে আসামীর। ফরিয়াদীরও এমন বদনাম রটবে যে তাকে কেউ কল দেবে না, সে আপনা থেকেই ইস্তফা দিয়ে পালাবে।

তা ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল সেটা আরো নিগূঢ়। একালের হাকিমরা কী ভাবেন জানিনে, সেকালের আমরা দাপটের সঙ্গে শাসন করতে অভ্যস্ত ছিলুম। ইংরেজরা যদিও এদেশে ব্রিটিশ জাস্টিস প্রবর্তন করেছিল তবু তাদের অনেকেরই ধারণা ছিল ব্রিটিশ জাস্টিস এদেশের মাটিতে শিকড় পাবে না। তার বদলে চাই রাফ জাস্টিস। যেটা ওরা ট্রাইবাল এলাকায় চালায়। নতুবা দুষ্টের দমন হবে না, উকিলকে মোটা ফী দিয়ে সব আসামী খালাস হয়ে যাবে। ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যে তো উকিলদের ঢুকতেই দেওয়া হতো না। এক খুনের মামলা বাদে। হাকিমরা আইন ও শৃঙ্খলার প্রয়োজনে বিচার করতেন, আইনের মূলনীতি অনুসারে নয়। আইনে বলে যতক্ষণ না আসামী দোষী বলে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে নির্দোষ বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু ক'টা কেসে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়?

বেণীমাধব কাঞ্জিলাল আমার খাস কামরায় হাজির হলেন

একদিন সকালে। ময়লা রং, মজবুত গড়ন, ষণ্ডামার্কা মনে হওয়া বিচিত্র নয়। মুনসেফের কেরানী বলে মহকুমা হাকিমকে তিনি যথোচিত সম্মান দেখাতে ইচ্ছুক নন। তাঁরও খুঁটির জোর আছে, হাকিম তাঁর করবেনটা কী? এই যেন তাঁর মুখের ভাব।

আমি মোলায়েম সুরেই শুরু করি। বলি, "এই যে বেণীমাধববাবু, আসুন, আসুন। আচ্ছা, এই ভদ্রমহিলাকে আপনি চেনেন।"

"চিনি বইকি। হাসপাতালের মিডওয়াইফ। আমার ওয়াইফের লাইফ সেভ করেছেন।" বেণীমাধব নাটকীয় ভঙ্গীতে বলেন।

"সেইজন্যেই কি আপনি রোজ রাত্রে এঁর ওখানে গিয়ে এঁকে বিব্রত করেন? আপনি যিনি একজন বিবাহিত পুরুষ। আর ইনি যিনি একজন অবিবাহিতা মহিলা। বেণীবাবু, কাজটা কি ভালো হচ্ছে?" আমি তাঁর হিতৈষীর মতোই বলি।

ভেবেছিলুম তিনি গলে গিয়ে বলবেন, "না, সার, কাজটা ভালো নয়। আমি আর অমন কাজ করব না।" তা হলে আমিও তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতুম, "সাবাস।" মেয়েটিকে নিরাপত্তা যোগানোই তো আমার উদ্দেশ্য। লোকটাকে জব্দ করা তো উদ্দেশ্য নয়। বিশেষত একজন সরকারী কেরানীকে। তাতে সরকারেরও অগৌরব। বেণীবাবু আমার কথার উত্তর না দিয়ে ফস করে পকেট থেকে একটা স্লিপ বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে দেন। "এই দেখুন, সার, ফর্দ। এসব জিনিস আমি ওঁর ওখানে পৌঁছে দিয়েছি। একশো তিন টাকা পাঁচ আনা দশ গণ্ডা আমার পাওনা। এক পয়সাও আদায় হয়নি। সেইজন্যেই তো তাগাদা দিতে যাই।"

লোকটার উদ্ধত ভঙ্গী দেখে আমি বিরক্ত বোধ করি। বলি, "তা বলে রোজ রাতের বেলায়? রবিবার সকালে গেলেই পারতেন।"

"রবিবারেও আমি অফিসে বসে কাজ করি। রাতেই আমার সময় হয়।" বেণীবাবুর ধৃষ্টতা আমাকে অবাক করে দেয়। কী বেহদ্দ বেহায়া।

এবার আমি মেয়েটির দিকে ফিরে বলি, "এই হিসাব কি ঠিক ?"

"ওষুধপত্র, হরলিকস, আপেল, ডাব, বিস্কুট, বার্লি আমি আনতে দিয়েছিলুম তবে দাম ঠিক লেখা আছে কি না জানিনে। কোনোদিন বলেননি কত দাম। এই যে ফর্দ এটাও আজ প্রথম দেখছি। ব্লাউস, পেটিকোট, স্নো, পাউডার, আলতা, হেয়ার অয়েল, সাবান আপনা থেকে গছিয়ে দিয়ে যান। বলেন সেফ ডেলিভারির জন্যে বকশিশ। আর লেডিজ শু আমি ফিরিয়ে দিই, আমি পায়ে দিইনি।" মেয়েটি অকপটে বলে যায়।

"যত সব বাজে কথা! আমার ন্যায্য পাওনা অবিলম্বে দিতে হবে। আমি একটি পাই পয়সাও ছাড়ব না।" বেণীবাবু বেপরোয়া।

শুনে আমার পিত্ত জ্বলে যায়। স্বীকৃত দাবী তো চল্লিশ টাকার কিছু বেশী। আমি তার দায়িত্ব নিচ্ছি। সামনে মাসের মাইনে থেকে কাটিয়ে দেব।

না, তা হবে না। দোকানদারের কাছ থেকে ধারে কেনা হয়েছে। দোকানদার আর অপেক্ষা করবে না।

কে সেই দোকানদার ? আমি তাকে সবুর করতে বলব।

না, তা হবে না। দোকানদারের কাছে ইজ্জৎ থাকবে না।

স্ত্রীলোকের ইজ্জতের প্রশ্ন নেই ?

এইসব স্ত্রীলোকের আবার ইজ্জতের প্রশ্ন! টাকার জন্যে কার বাড়ি না যায়। ধোপা নাপিত গয়লা মুদি মুদ্দফরাস।

আমি আর সহ্য করতে পারিনে। দেহরক্ষীর দিকে ফিরে বলি, "খোদাবখশ। রিভলভার নিকালো।"

আমার ছায়ার মতো অনুগত সেই পাঞ্জাবী মুসলমান রিভলভার বার করে বাগিয়ে ধরে। ও তো বাংলা বোঝে না। ও ভাবে লোকটা সাহেবকে মারতে যাচ্ছে। যমদূতের মতো চেহারা। কিন্তু যেমন বিশ্বাসী তেমনি সরল। যা করতে বলব নির্বিচারে তাই করবে। যদি ফায়ার করতে বলি তো ফায়ার।

"তারপর, বেণীবাবু! এই হিসাবে ধরা হয়েছে এক টিন সিগারেট।

এটাও কি আপনাকে আনতে বলা হয়েছিল? মেয়েরা কেউ সিগারেট খায়?" আমি চেপে ধরি।

"না, ওটা আমারই জন্যে। ওটা আমার দস্তুরি।" বেণীবাবু জবাবদিহি করেন। রিভলভার উদ্যত দেখেও অকুতোভয়!

আমি উত্তেজিত হয়ে বলি, "শাইলকের মতো আপনি কি চান এক পাউণ্ড মাংস? নারীমাংস? লজ্জা করে না আপনার। আর যাবেন ও বাড়িতে?"

"আমার দাবী আমি ছাড়ব না। যাব।" বেণীবাবু নাছোড়বান্দা।

"রাতের বেলা যাবেন?" আমি আরো উত্তেজিত হই।

"আর কখন যাব? দিনের বেলা আমার সময় থাকলে তো!" বেণীবাবু অবিচল।

এইবার আমার সম্পূর্ণ ধৈর্যচ্যুতি হয়। আমি চেঁচিয়ে উঠি, "খোদাবখশ—"।

এর পরের শব্দটা হতো, "ফায়ার"। তার পরের শব্দটা রিভলভারের আওয়াজ। মেয়েটির মুখ একেবারে ফ্যাকাসে। বেণী-বাবুর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। নির্দোষ মানুষেরও হাড়ে কাঁপুনি ধরে যায়। দোষী পুরুষের নার্ভ কেমন শক্ত!

খোদবখশকে ইশারায় বলি, "যাও।" সে বেরিয়ে যায়। মেয়েটিকে ইশারায় বলি, "যান।" তিনিও বাইরে যান।

তখনকার দিনে আমার অভ্যাস ছিল ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়ানো। বেড়ানোর পর হাতের কাছে রাখা। ছড়িখানা হঠাৎ নজরে পড়ে যায়। খপ করে তুলে নিই।

সে ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। আমরা দু'জনে। বেণীবাবু আর আমি। লোকটা সম্পূর্ণ নির্বিকার। আর আমি সমান উত্তেজিত।

"বেণীবাবু, এখনো সময় আছে। বলুন আপনি অনুতপ্ত।" আমি ছড়ি আস্ফালন করি।

"কিসের জন্যে অনুতাপ করব, সার?" বেণীবাবু পাষাণের মতো নিশ্চল।

"শাইলকের মতো আপনি চান এক পাউণ্ড মাংস। নারীমাংস। সেইজন্যে রাতের বেলা ও বাড়িতে যান।" আমি যেন আসামীকে চার্জ পড়ে শোনাচ্ছি।

"না, সার। আমি যাই আমার পাওনা আদায় করতে।" আসামীর জবাব।

বিচারক হিসাবে আমার জানা উচিত ছিল যে আত্মরক্ষার জন্যে আসামী যে-কোনো লাইন নিতে পারে। বেণীবাবু তার জন্যে আগে থেকে তৈরি হয়েই এসেছেন।

"কিন্তু আপনার হিসাবে তো মহিলাটির স্বাক্ষর নেই। তিনি স্বীকার যেটুকু করছেন সেইটুকুই আপনার পাওনা। গোটা চাল্লিশ টাকার জন্যে আপনি ওঁকে উত্ত্যক্ত করবেন? বলুন, আর ওখানে যাবেন?" আমি ছড়ি উঁচিয়ে ধরি।

"আমি কতবার ওঁর ফাই ফরমাজ খেটেছি। কই, তখন তো কেউ বলেনি যে আমি ওঁকে উত্ত্যক্ত করেছি। যে লোকটা এত উপকার করেছে সে কি উত্ত্যক্ত করতেই যায়?" বেণীবাবু যেন ইঙ্গিতে বোঝাতে চান যে সম্পর্কটা অন্যরকম।

"তার মানে উপকারের বিনিময়ে উপভোগ করতে?" আমি সপাং করে এক ঘা কষিয়ে দিই ওর বাম উরুতে।

"ও কী করছেন, সার! আমাকে মারছেন কেন?" বেণীবাবু আমার কাছে কৈফিয়ত চান।

"আপনি চান মেয়েটিকে সিডিউস করতে।" এই বলে আরেক ঘা। এবার ডান উরুতে।

"ও কী বলছেন, সার! এ কী অন্যায়?" বেণীবাবু হাত বুলোতে বুলোতে বলেন। তবু স্বীকার করেন না। অনুশোচনারও লক্ষণ নেই।

আমি হাল ছেড়ে দিই। এত বড় মন্দকে বেত মেরে শিক্ষা দেওয়া যায় না। বলি, "আপনি এখন যেতে পারেন, বেণীবাবু। কিন্তু মনে রাখবেন। ব্যাপারটা এইখানেই থামবে না।"

ব্যাপারটা সত্যি সেইখানেই থামল না। এজলাসে বসে কাজ করছি এমন সময় এক চিঠি। লিখছেন মুনসেফ সাহেব। বেণীবাবুর মুখে বিবরণ শুনে তাঁর বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু দুই উরুতে লম্বা লম্বা কাট দেখে তাঁর ভয় করছে যে একটা কিছু ঘটেছে, যাতে মুনসেফী আদালতের কর্মচারীর প্রেসটিজ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কর্মচারীটিকে তিনি সদরে জজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে অনুমতি দিয়েছেন।

এবার ভয় পাবার পালা আমার। জজ সাহেব যদি হাইকোর্টে রিপোর্ট করেন তা আমার রাফ জাস্টিসের জন্যে সাধুবাদ কেউ দেবেন না। সকলেই একবাক্যে তিরস্কার করবেন। গভর্নমেণ্ট আমাকে নিয়ে মুশকিলে পড়বেন। বদলী আছে কপালে।

মুনসেফ সাহেব প্রস্তাব করেছিলেন যে তিনি স্বয়ং আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করে সত্য মিথ্যা যাচাই করতে। আমি তাঁকে এক কথায় জানিয়ে দিই যে আমিই তাঁর বাসভবনে গিয়ে আমার বক্তব্য শোনাব কাছারির পরে।

মুনসেফ সাহেব আমাকে এক গাল হেসে অভ্যর্থনা করেন। তারপরে বলেন, "আপনি কখনো ওরকম কিছু করতে পারেন? কক্ষনো না। তবে কিনা প্রহারের দাগ ছিল।"

"আমি আজ ওকে হাজতে পাঠাতে পারতুম, তাতে কিন্তু আপনাদেরই প্রেস্টিজ হানি হতো, মিস্টার দাস। রোজ রাত্রে এক ভদ্রমহিলার কোয়ার্টার্সে হানা দেওয়া একটা দণ্ডনীয় অপরাধ, কিছুতেই কি বেণীবাবুকে এটা বোঝাতে পারলুম? তবে আমার দু'টি ঘা যে ওই বিশাল বপুতে দাগ কেটে যাবে এতটা আমি ভাবিনি। এর জন্যে আমি লজ্জিত।" আমিই আসামীর মতো সাফাই দিই।

"আরে না, না, ও কী বলছেন, মিস্টার চন্দ! তবে ওই যে শুনছিলুম রিভলবার না কী যেন ওর বুকের দিকে তাক করা হয়েছিল।" মুনসেফ সাহেব কৈফিয়ত চান।

"হ্যাঁ, আর একটু হলে লোকটার প্রাণ যেত। কিন্তু যায়নি তো।

এটা প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কেস নয়। আর আমরাও কাউকে সরাসরি প্রাণদণ্ড দিইনে। আমার সেটুকু হোঁশ ছিল।” আমি সব কথা খুলে বলি।

“বেশ করেছেন, ঠিক করেছেন। তবে আমাকে যদি আগে একবার আপনার কনফিডেন্সে নিতেন তা হলে আমিই জজ সাহেবকে লিখে ওকে বদলী করাতুম। মিস্টার চন্দ, আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়ো। সেই সুবাদে বলছি, যেটা আরো সরলভাবে হতে পারে সেটাকে আরো জটিল করে লাভ কী?” তিনি আমাকে চায়ের আমন্ত্রণ জানান।

জজ সাহেব কী করেন তার জন্যে ভয়ে ভয়ে থাকি। একদিন শুনতে পাই লোকটাকে তিনি এক দুর্গম স্থানে বদলী করেছেন। মুনসেফ সাহেব আমাকে বাড়ি বয়ে শুনিয়ে যান। আমিও তাঁকে চা পানে আপ্যায়িত করি।

কিছুদিন বাদে মেয়েটি এসে কান্নাকাটি করে। সবাই ওকে দোষ দিচ্ছে। ও আর টিকতে পারছে না। ওর জন্যে অন্য কোথাও একটা কাজ যদি যোগাড় করে দিই।

আমার কাকীমা তাঁর সেবা প্রতিষ্ঠানের জন্যে ট্রেণ্ড মিডওয়াইফ খুঁজছিলেন। মেয়েটিকে তাঁর কাছেই পাঠিয়ে দিই। দেওঘরে ওর চাকরি হয়ে যায়। ওর জন্যে বেশ নিশ্চিন্ত ছিলুম, কিন্তু পরে কাকীমা আপসোস করে জানালেন যে মেয়েটি কার সঙ্গে ভাব করে অন্তর্ধান হয়েছে। ও বয়সের মেয়েরা বিয়ের সুযোগ পেলে ছাড়ে না। এর থেকে আমারও শিক্ষা হলো। সমস্তটা দোষ হয়তো বেণীবাবুর নয়। কেন যে বেচারাকে মারতে গেলুম! মাত্র একজনের সাক্ষীতে আরেকজনের সাজা হওয়া কি উচিত? আস্তে আস্তে আমার মধ্যে একটা জুডিসিয়াল টেম্পারমেণ্ট এল। হাকিমী মেজাজ অবশ্য একদিনে গেল না।

ভেবে দেখলুম যে রিভলভার আমার মতো প্রকৃতির জন্যে নয়। কথায় কথায় যে ফায়ার করতে উদ্যত হয় তাকে অমন একটা

প্রলোভনের ধারে কাছেও রাখতে নেই। ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন নরহত্যার মহাপাতক থেকে। আমি যেন তাঁর করুণার যোগ্য হই। আগুন নিয়ে খেলা আর নয়। কোনো অর্থেই নয়।

রিভলভার কেন, স্টেনগান ব্রেনগান নিয়েও নাড়াচাড়া করেছি। কিন্তু নিজের জন্যে কোনো অস্ত্রই চাইনি। এমন কি একটা বন্দুকও না। এসব রাখার চেয়ে না রাখাই নিরাপদ।

॥ তিন ॥

মালাকার এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিলেন। বললেন "তা হলে ট্র্যাজেডীটা ঘটি ঘটি করেও ঘটল না। তবে আর কী হলো! গোয়েন্দা কাহিনী না ছাই!"

চন্দ বললেন, "না। ট্র্যাজেডীটা ঘটল না। যেটা শেষপর্যন্ত ঘটল সেটা কমেডী। কিন্তু সেটা সেইখানে বা সেই বছর নয়। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!"

চন্দ বলতে লাগলেন—

শ্যামপুর থেকে ছুটি নিয়ে হিমালয়ে চলে যাই কিছুদিন পরে। মনটা অশান্ত। শান্তির সন্ধান করি। তারপরে আরো অনেক স্টেশনে বদলী হয়ে অনেক রকম পদে নিযুক্ত হয়ে বছর ছয়েক বাদে বদলী হয়ে আসি শ্যামপুর যেখানকার মহকুমা সেই জেলার সদরে। এবার আমিই সেখানকার জেলা জজ।

জেলা জজ হিসাবে বছর তিনেক কাজ করার পর ছুটি নিয়ে আবার হিমালয় যাত্রা। কিন্তু তার আগেই আমার সেরেস্তাদার আমার কাছে নিবেদন করেন যে বেণীমাধব কাঞ্জিলাল বলে একটি কেরানী প্রায় নয় বছর হলো শিয়ালার মুনসেফী চৌকিতে পড়ে আছে। ওদিকে ওর পরিবার থাকে শ্যামপুরের বাড়িতেই। দু' দুটো এস্টাব্লিশমেন্টের খরচ কি এই যুদ্ধের বাজারে ও বেচারা চালাতে

পারে ? কিন্তু ওর জায়গায় কেউ ওই জংলা জায়গায় যেতে চায় না। তাই বদলীর আবেদন বছরের পর বছর ঝুলে আছে।

বেণীবাবুর কথা আমার মনে পড়ে যায়। এতদিন কেউ আমাকে জানায়নি, আশ্চর্য! জানালে আমি হয়তো প্রতিকার করতে পারতুম। সেরেস্তাদারকে বলি ওকে ডেকে পাঠাতে।

একদিন আমার বাসভবনে বসে কাজ করছি এমন সময় বেণীবাবুর নামের স্লিপ নিয়ে চাপরাশির প্রবেশ।

লোকটি আমার পায়ে পড়ে বলে, ‘‘হুজুর মা বাপ। মা বাপ কি সন্তানকে শাসন করেন না ? শাসন না করলে কি মঙ্গল হয় ? আমি জাহান্নমের পথে চলেছিলুম, হুজুর। হুজুর ভিন্ন আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারত না। আমার বৌ আমার ছেলেমেয়ে না খেয়ে মারা যেত। ছি ছি! আমি কি একটা মানুষ ছিলুম, না বুনো মোষ! হুজুর আমাকে মানুষ করে দিয়েছেন। আমার চরিত্রের সংশোধন হয়েছে। এতই যদি করলেন, হুজুর তো এখান থেকে চলে যাবার আগে অধীনের একটা ব্যবস্থা করে যান। আহা, হুজুরের মতো বিচারক আর হয় না। হুজুর চলে গেলে জেলা কানা হয়ে যাবে। মিথ্যে বলছিনে, ধর্মাবতার। সত্য বলছি। এমন মানবতা না কী বলে ওকে ? এমন মানবতা আর কার ? হুজুরের প্রশংসা চোর-ডাকাতেও করে। করে না শুধু পুলিস।’’

ওকে থামিয়ে দিয়ে একটা অর্ডার লিখে পাঠাই। বেণীমাধব কাঞ্জিলালকে শ্যামপুরে বদলী করা হলো। ওর জায়গায় কে যাবে সেটা পরে বিবেচনা করা হবে। সেরেস্তাদার যেন তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন।

বেণীবাবুর সে কী উল্লাস! তিনি আরো একবার পায়ে পড়তেই আমি তাকে দুই হাতে করে তুলে ধরি। বলি, ‘‘আমার মনে তখন থেকেই একটা খেদ ছিল যে আমি সুবিচার করিনি। বেত্রদণ্ড দিলেও নিজের হাতে প্রয়োগ করা উচিত নয়। তবে আপনার বদলীর জন্যে আমি দায়ী নই, বেণীবাবু। বদলী রদ করে যদি আপনার কিছু

উপকার করে থাকি সে একপ্রকার শোধবোধ। তবে একটা বিষয়ের জন্যে আপনাকে মনে থাকবে। আমারও সংশোধনের দরকার ছিল। আমি ছিলুম চণ্ডাশোক। সেদিন রাগের মাথায় রিভলভার দিয়ে কী যে কাণ্ড করতে যাচ্ছিলুম ভাবলেই মাথা হেঁট হয়ে যায়। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, বেণীবাবু। আর ভুলে যাবেন।"

আগুনা বিদেশ

অসুখের খবর শুনে অধিরথ একদিন দেখতে আসে। বলে, "বৌদি, দাদার নাকি অসুখ। কী হয়েছে। কেমন আছেন।"

"জ্বর। বেশী নয়, কিন্তু থেকে থেকে বলে উঠছেন—কী বলছেন তা তুমি ওঁর ঘরে গেলেই শুনতে পাবে। কিন্তু বেশীক্ষণ থেকো না। বেশী কথা বলতে দিয়ো না। ডাক্তারের বারণ।" বৌদি সংসারের কাজে মন দেন।

অধিরথ দাদার শোবার ঘরে ঢুকে দেখে তিনি চোখ বুজে শুয়ে আছেন। পায়ের শব্দ শুনে চোখ মেলে বলেন, "কে! অধিরথ! ডোণ্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।"

অধিরথ ঠাওরায় ওটা জ্বরের ঘোরে প্রলাপ। কিন্তু দাদার কপালে হাত দিলে বোঝা যায় সামান্য গরম। অত কম টেম্পারেচারে কেউ প্রলাপ বকে?

"কেমন বোধ করছেন, দাদা! আমি তো দেখছি জ্বর খুব কম।" অধিরথ বলে।

"ঘুষঘুষে জ্বর। আসছে আর যাচ্ছে। ছাড়ছে না। সেইজন্যেই তো ভাবনা। কিন্তু ভেবে ফল কী? ডোণ্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।" দাদা অধিরথের হাতে হাত রাখেন।

অধিরথ আশ্বাস দিয়ে বলে, "সেরে যাবে।"

"তা তো যাবেই। সেইজন্যেই তো বলি, ডোণ্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।"

"ওর মানে কী হলো, দাদা!" অধিরথের ধাঁধা লাগে।

"কেন, ও তো সোজা ইংরেজী। ফ্রেট মানে কী তা কে না জানে। আর পমফ্রেট যদি না খেয়ে থাকিস তবে বলি, ওটা একরকম সমুদ্রের মাছ।"

"হ্যাঁ, খেয়েছি। বেশ লাগে। কিন্তু ফ্রেট না করে পমফ্রেট খাব কেন? আরো তো পাঁচ রকম মাছ আছে।" অধিরথ তর্ক করে।

"দূর, বোকা! ওটা যে একটা মন্ত্র।" দাদা চাঙ্গা হয়ে ওঠেন।

"মন্ত্রেরও তো একটা সংলগ্নতা থাকে। না এটাও একটা হিং টিং ছট!" অধিরথ কৌতূহলী হয়।

দাদা এবার বালিশে হেলান দিয়ে বসেন। বলেন, "পমফ্রেট নামে একটা সমুদ্রগামী লঞ্চ ছিল। আমার জীবনে তার নাম চিরস্মরণীয়। যখনি অকূল পাথারে পড়ি, কূলকিনারা দেখতে পাইনে, তখনি মনে পড়ে যায় ওর নাম। সেবারে যেমন অলৌকিকভাবে উদ্ধার পাই এবারেও তেমনি পাব, এই ভেবে মনটাকে শক্ত করি। হতাশ হবার মতো এমন কী হয়েছে? ডোণ্ট ফ্রেট! পমফ্রেট।"

"হতাশ হবার মতো এমন কী হয়েছে?" অধিরথ কাতরভাবে বলে, "বাংলাদেশ যার নাম রাখা হয়েছে সেখানে বাঙালী বলে কেউ থাকছে কি? হয় পালিয়ে আসছে, নয় গুলী খেয়ে মরছে। শুনছি দেড় কোটি লোক না খেয়ে মরবে।"

ভদ্রলোকের এক কথা। "ডোণ্ট ফ্রেট। পমফ্রেট। হতাশারও শেষ আছে।"

"আর এপারেও তো মানুষ বলে কেউ থাকছে না। হয় ক্রিমিনাল নয় কাওয়ার্ড। হতাশ হব না তো কী হব, দাদা?" অধিরথ করুণস্বরে বলে।

"তবু আশা রাখতে হবে। ডোণ্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।" দাদা অভয় দেন।

"বল, মা তারা, দাঁড়াই কোথা?" অধিরথ দুঃখ করে। "দিল্লী গিয়ে দেখি পদে পদে ঘুষ, পদে পদে খোসামোদ। কেউ ফেলছে কড়ি, কেউ মাখাচ্ছে তেল। দিল্লী সেই মোগল রাজত্বের শেষ-ভাগের দিল্লী।"

"ডোণ্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।" বলে দাদা আবার এলিয়ে পড়েন। বোঝা গেল তাঁর আবার মনে লেগেছে। তাপ বেড়ে যাবে না তো!

"থাক, দাদা, ওসব পরে হবে। আগে তো আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। দিন সাতেক বাদে আবার আমি আসছি। তখন পমফ্রেটের গল্পটা শোনাবেন। শুনতে বড়ো কৌতূহল হচ্ছে।" অধিরথ আর ওঁকে বেশী কথা বলতে দিতে চায় না।

"সমস্তটা যদি বলতে যাই অফিসিয়াল সীক্রেট ফাঁস হতে পারে। যদিও দেখছি রুই কাতলারা সরকারের হাঁড়ির খবর ছড়াচ্ছেন. কারো গায়ে আঁচই লাগছে না। আমরা চুনোপুঁটি, তবু ইতিহাসের একটি গুরুত্বসম্পন্ন সন্ধিক্ষণে গুরুভার বহন করতে মনোনীত হয়েছি।" দাদা আবার ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েন।

পরে একদিন দাদা পমফ্রেটের কাহিনী শোনান।

॥ দুই ॥

আমাদের জীবনে ওই তিনটি বছরের তুলনা নেই। উনিশ শো ছেচল্লিশ, সাতচল্লিশ আর আটচল্লিশ। আমি তো ধরে নিয়েছিলুম যে আমি শুধু সাক্ষী বা সাক্ষীগোপাল। রঙ্গমঞ্চে আমার কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু সাতচল্লিশ সালের শেষের দিকে হঠাৎ একদিন টেলিফোন এল, ফতেয়াবাদ জেলার শাসনকর্তা করে আপনাকে পাঠানো হচ্ছে। "না" বলবেন না। আমরা আর লোক খুঁজে পাচ্ছিনে।

ফতেয়াবাদ চিরকাল শান্তিপূর্ণ ছিল, তেমনি তার পার্শ্ববর্তী ননদিয়া, তেমনি তার অপর পারের রানীমহল। ইদানীং ওদের মাঝখানে একটা লাইন টেনে বলা হয়েছে এর নাম আন্তর্জাতিক সীমান্ত। তাই বর্ডার জুড়ে অশান্তি।

তা ছাড়া রাম রহিমের বিবাদ তো আছেই। এতদিন আমরা বলতুম ওটা তৃতীয়পক্ষের কারসাজি, এখন রাম বলে ওটা রহিমের শয়তানী আর রহিম বলে ওটা রামের দুশমনি। যেন নিজের কোনো দোষ নেই। যেন একহাতে তালি বাজে।

তোর বৌদির একেবারেই ইচ্ছে ছিল না কলকাতা ছাড়তে, আঠারো বছর চাকরির পর এই প্রথম আমরা কলকাতায় থাকবার সুযোগ পেয়েছি, এখনো গুছিয়ে বসতে পারিনি, মাত্র চার মাস কাটিয়েছি। আবার বদলী! কিন্তু আমার ইতিহাসবোধ আমাকে মন্ত্রণা দেয় যে, অ্যাকশন যদি দেখতে চাও তো এই তোমার সুযোগ। তুমিও একজন অ্যাকটর। তুমি নিষ্ক্রিয় দর্শক বা সমালোচক নও।

প্রত্যেকটাই আমার পুরোনো জেলা। যেমন ফতেয়াবাদ তেমনি ননদিয়া তেমনি রানীমহল। আমাকে না চেনে কে? আর আমিই বা কাকে না চিনি? মিলনের দূত আমি ছাড়া অ র কে হতে পারে? যাই যখন তখন এই ছিল আমার স্পিরিট। আমি যুদ্ধ করতে যাইনি, সন্ধি করতেই গেছি। রানীমহলের যিনি শাসক তিনি আমারই সিনিয়র ডেপুটি ছিলেন, দু'জনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। আর ননদিয়ার শাসকও একদা আমার সহযোগী ছিলেন। যদিও তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

দেখলুম কেউ আর কাউকে এক দেশের লোক বা আপনার লোক বলে ভাবে না। "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।" এপারের লোকের কাছে ওপারের লোক বিদেশী। ওপারের লোকের কাছে এপারের লোক বিদেশী। সেই একই জেলা, সেই একই মানুষ, তবু অদ্ভুত এক ভানুমতীর খেল একদলকে বানিয়েছে আরেকদলের চোখে বিদেশী।

"সার, আপনি ওপারের লোকের সঙ্গে সাবধানে কথা বলবেন। ওরা বিদেশী। ওরা তো এই জেলাটাকে পাকিস্তানের শামিল করতেই চেয়েছিল, এখানে মুসলমান বেশী কিনা। প্রথমে তো ওদের ভাগেই পড়েছিল। সে সময় ওদের মূর্তি যদি দেখতেন! আর এখানকার মুসলমানদের ফূর্তি! সব পঞ্চম বাহিনী। একজনকেও বিশ্বাস নেই। প্রত্যেকের ধারণা এ জেলা আবার পাকিস্তানের শামিল হবে। তলে তলে চক্রান্ত চলেছে। জানেন

সার, রোজ রাত্রে এ শহরে ওপারের ট্রাক আসে, মালপত্র পাচার করে নিয়ে যায়।" পুলিশ অফিসার বলেন।

ফতেয়াবাদ যেন আমাদের আলসাস লোরেন। একবার জার্মানী নেয় তো একবার ফ্রান্স ফিরে পায়। তাই নিয়ে মন কষাকষির বিরাম নেই। কেউ মন থেকে ছাড়বে না। সুযোগ পেলেই যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে।

দেশভাগের পর যেমন দু'দল বিদেশীর তথা পঞ্চম বাহিনীর আবির্ভাব হয় তেমনি মাল পাচারকারীর। হিন্দু মুসলমান এক দিল হয়ে নতুন একটা ইণ্ডাস্ট্রি পত্তন করে। এমন তাদের কর্মকৌশল যে ওপারের মুসলমান এপারের হিন্দুকে সিগন্যাল দেয় আর এপারের হিন্দু ওপারের মুসলমানকে সিগন্যাল দেয়। দেশ ভুলে, ধর্ম ভুলে দু'পক্ষই দুই রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে সিঁদ কাটে। রাতের বেলাই ওদের কর্মতৎপরতা।

একদিন পদ্মাতীরে রাত কাটিয়ে স্বচক্ষে দেখে এলুম তাদের সিগন্যালের বাতি। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ছেড়ে দেয়। তখন হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। হিন্দী পাকী ভাই ভাই। ধরতে পারে কার সাধ্য! ধরা কারই বা স্বার্থ। সরষের ভিতরেই ভূত। একজন কর্তাব্যক্তি বলেন, "আমরা কাপড় না যোগালে ওরা কাপড় পরবে কী করে? ভুলে যাবেন না ওদের অনেকেই হিন্দু। শাড়ীই তো যাচ্ছে বেশীর ভাগ।"

চালের বেলাও সেই একই যুক্তি। "আমরা চাল না যোগালে ওরা খাবে কী? ভুলে যাবেন না ওদের অনেকেই হিন্দু।" এমনি প্রত্যেকটি বিষয়ে।

এদিকে আবার তারস্বরে চিৎকার। চাল পাওয়া যায় না, চিনি পাওয়া যায় না, কাপড়ের দাম আগুন। যোগাতে যদি না পারি তো ধর্মঘটের হুমকি। কয়েকটা অর্ডিনান্স তখনো বলবৎ ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্যে নয়। আমরা বেগতিক হয়ে এই পরিস্থিতিতেও প্রয়োগ করি। তখন ব্যবসাদারদের কোপদৃষ্টিতে

পড়ি। কেউ কেউ তো খোলাখুলি শুনিয়ে দিয়ে যান যে বলবেন নিদান রায়কে।

একদিকে চক্রান্ত, আরেকদিকে কুচক্র। মাঝখানে আমি। দিনরাত ভূতের মতো খাটি। আর খাটাই। সত্যি আমার সরকারী সহযোগীদের তুলনা হয় না। ভারত পাকিস্তান সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাঁদের অনেকের মতভেদ ছিল। কিন্তু আমার নির্দেশ তাঁরা শিরোধার্য করতেন। কী জানি কেন আমার উপর তাঁদের অগাধ আস্থা ছিল। উপরওয়ালাদের বেলা কিন্তু আমি অতটা নিশ্চিত ছিলুম না।

আসলে হয়েছিল এই যে দিল্লীতে করাচীতে একপ্রকার দাবাখেলা চলেছিল, তার জের কলকাতায় আর ঢাকাতে। তারই জের ফতেয়াবাদে আর রানীমহলে। আমরা নিমিত্তমাত্র। তবু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তো ছিল। সেটা আমি প্রাণপণে গার্ড করেছি। একেবারে বোড়ে বনে যাইনি।

একদিন সীমান্ত পরিদর্শনে যাই। সঙ্গে পুলিশম্যান। দু'জনের চোখে বাইনোকুলার। দেখতে পাই ওপারে রানীমহল শহর। আমার পুরাতন কুঠি। চোখে জল আসে।

"দেখছেন, সার, দেখছেন। কুঠির গেটের দু'ধারে দুটো কামান বসিয়েছে। গোলা ছুঁড়লে এপারেও এসে পড়বে। পদ্মা যদিও খুব চওড়া তবু কামানের পক্ষে কিছু নয়। এর একটা উত্তর দিতে হবে। আমাদেরও কামান থাকা চাই।"

তখন কি ছাই জানতুম যে ও দুটো মোগল আমলের কামান! সাজিয়ে রাখা হয়েছে শখ করে। কিন্তু কথাটা সিরিয়াসভাবে নিই।

. এর পরে শোনা গেল যে ওদের একখানা লঞ্চ আছে। লঞ্চে করে এক বিহারী মুসলমান অফিসার প্রতিদিন নদীবক্ষে পাহারাদারি করে বেড়ান। আমাদের সওদাগরি নৌকা চলাচলে বাধা দেন। একে আটকান, ওকে পাকড়ান, তাকে চালান দেন। তাঁর মতে ওটা পাকিস্তানের সীমানাভুক্ত নদীস্রোত।

নদীর মাঝখান দিয়ে দুই জেলার সীমান্তরেখা ছিল, এখন সেটা হয়েছে দুই রাষ্ট্রের সীমান্তরেখা। মানচিত্র মেনে চললে নদীর যে অংশে লঞ্চ যাতায়াত করে, স্টীমার যাতায়াত করে, যেটা বর্তমান মুখ্যস্রোত বলে গণ্য তার সবটাই আমাদের এলাকা। আমাদের এলাকায় আমাদেরি নৌকা আটক করবে এতো একপ্রকার আক্রমণাত্মক কর্ম!

চিঠি লিখে জবাব পাওয়া গেল যে, ওঁদের মতে দেশ যখন অবিভক্ত ছিল তখনকার আইন এখন খাটে না। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে মুখ্যস্রোত যেখান দিয়েই প্রবাহিত হোক না কেন তার অর্ধেকটা পাকিস্তানের, অর্ধেকটা ভারতের। ঠিক মধ্যিখানে একটা লাইন টানলে দেখা যাবে যে লঞ্চ সে লাইনের বাইরে যায়নি, নিজের এলাকার ভিতরেই থেকেছে। সীতাদেবীই গণ্ডী অতিক্রম করেছেন, রাবণ রাজা তা করেননি। রাবণের এলাকায় পা দিলে রাবণ তো ধরে নিয়ে যাবেই।

আমি তো শুনে থ। মাটির উপর লাইন টানতে পারা যায়, জলের উপর টানা যায় কি? হয়তো বয়া ভাসিয়ে রেখে একটা আন্দাজী সীমানা দেখানো যায়। কিন্তু তাতেও কি এই উৎপাত থামবে?

দু'তরফের যেমন যুদ্ধং দেহি মনোভাব তাতে আমাদের মাঝিমাল্লাদের কোনোরকম প্রোটেকশন দেওয়া যাবে না। জোর যার নদীপথ তার। নৌকার চেয়ে লঞ্চেরই জোর বেশী। তাই লঞ্চের উত্তর হচ্ছে লঞ্চ। গান-বোটের উত্তর হচ্ছে গান-বোট। সমুদ্রপথ হলে বলা যেত, ক্রুজারের উত্তর হচ্ছে ক্রুজার। ব্যাটলশিপের উত্তর হচ্ছে ব্যাটলশিপ।

উপরে লিখলুম যে ঢাকার সঙ্গে তর্ক করে কোনো ফল হবে না, করাচীও তার সঙ্গে সুর মেলাবে। চাই একখানা লঞ্চ। আমাদেরও লঞ্চ আছে দেখলে এ আপদ থামবে। আমরা অবশ্য ওদের নৌ চলাচলে বাদ সাধব না। নদী রয়েছে অবাধ নৌ চলাচলের জন্যে।

CENTRAL LIBRARY 78114

আমরা সেটা মানব। ওরা যদি না মানে তবে আমরাও পেছপাও হব না।

তা ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল, সেটা আরও গুরুতর। সেই যে বলে, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর, তেমনি এপার পদ্মা ওপার পদ্মা মধ্যিখানে চর। কয়েকটা চর মানচিত্র বা খতিয়ান অনুসারে ফতেয়াবাদে পড়ে। এপারের লোক সেসব চরে ধান বোনে, ধান কাটে। অন্যান্য ফসল ফলায়, ফসল আনতে যায়। পাকিস্তানের যুক্তি যদি যথার্থ হয় তা হলে তো চরে যাওয়া আসাও বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ আর নৌকায় করে যেতে পারবে না।

আমার বন্ধু যতদিন রানীমহলের জেলাশাসক ছিলেন ততদিন তাঁর আশ্বাসের মূল্য ছিল। তিনি বলেছিলেন চাষীরা যে যার ফসল কেটে আনতে পারবে। কেউ বাধা দেবে না। স্থিতাবস্থা রক্ষিত হবে। সেই বাঙালী মুসলমান অফিসারটিকে বদলী করা হলো ঢাকায়। তাঁর জায়গায় এলেন এক পাঞ্জাবী মুসলিম অফিসার। তাঁর কাছে আমি দরবার করতে নারাজ ছিলুম। তাই লঞ্চের জন্যে চাপ দিই। চাপ না দিয়ে উপায়ও ছিল না। একদিন একটি চাষী মুখ কালো করে বলে যে ওর কাটা ফসল এপারে আনতে দেওয়া হচ্ছে না। ওটা নাকি পাকিস্তানের। চাষীটি এপারের মুসলমান।

আগেকার দিনে খুলনা ছিল অধিকাংশ লঞ্চের ঘাঁটি। দেশভাগের সময় খুলনা পড়ে আমাদের ভাগে, তাই লঞ্চগুলো সময় থাকতে আমরা সরাইনি। কারো মাথায় আসেইনি ওকথা। পরে খুলনা যায় পাকিস্তানে আর লঞ্চগুলি বেহাত হয়। ওরা আমাদের লঞ্চের ভাগ আমাদের দেয় না।

একখানি মাত্র লঞ্চ ছিল কলকাতায়। সেখানাই আমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা হলো। কিন্তু সে আবার মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে যায়। ভাগীরথীতে জল নেই। ভাগীরথী উজিয়ে আসতে পারলে তো পদ্মায় পড়বে? আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি, এমন সময় একদিন খবর পাই ভাগীরথীতীরে আমার কুঠির ঘাটে একখানা

লঞ্চ এসে ভিড়েছে। ছুটে গিয়ে দেখি সমুদ্রগামী লঞ্চ। নাম তার "পমফ্রেট"। ওটা অসামরিক ব্যবহারের জন্যে নয়, নেভী থেকে আমাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে সাময়িকভাবে। পরিচালনা করে নিয়ে এসেছিলেন যিনি তিনি একজন নেভাল অফিসার। ক্যাপটেন মালিক। আমার হাতে সঁপে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবার আগে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে দেন। আমি লক্ষ করি যে পাটাতন লোহা কিংবা দস্তা কিংবা সেইরকম কোনো এক ধাতু দিয়ে মোড়া। তাই নদীর জলে লঞ্চ চলে কচ্ছপের গতিতে। তা ছাড়া এত রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে ভরা যে পা ছড়াবার ডেক নেই, ক্যাবিন মাত্র একটিই, তাতে আরাম করে থাকা যায় না। তাই লঞ্চ ছেড়ে দিই সারেং টাণ্ডেল সুখানীর হাতে। ওরাই নিয়ে যায় পদ্মায়।

"করেছেন কী, সার। বেড়ালকে দিয়েছেন মাছের ভার। জানেন না ওরা হচ্ছে কেয়াখালীর মুসলমান লস্কর। নিমক খায় এদেশের, কিন্তু প্রাণ পড়ে রয়েছে ওদেশে। দেখবেন লঞ্চ পৌঁছে দিয়েছে রানীমহলে।" ভয় দেখান আমার এক সহযোগী।

"ওরা তো কখনো বেইমানি করেনি। করবেও না।" আমি ভয় পাইনে।

ওয়্যারলেসে বার্তা পাওয়া গেল পমফ্রেট যথাকালে তালগোলা ঘাটে নোঙর করেছে। পুলিশ চার্জ নিয়েছে। বাঁচলুম। কিন্তু নিষেধ করতে ভুলে গেলুম যে কেউ যেন আমার বিনা হুকুমে ও লঞ্চ ব্যবহারে না করে।

পরে একদিন হতবাক হয়ে যাই শুনে, পমফ্রেট বিদেশী লঞ্চের পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে প্রচ্ছন্ন এক চড়ায় আটকা পড়েছে।

কী সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি ছুটে যাই। গিয়ে শুনি মহকুমা হাকিমও তাঁর দলবল নিয়ে নড়াতে পারেননি। ডাঙায় থাকা হাতীর পায়ে শিকল বেঁধে, তা দিয়ে লঞ্চের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে হাতীকে দিয়েও নড়াতে পারেননি। অবশ্য হাতীটা লঞ্চের চেয়ে

কমজোরী। লোহায় মোড়া লঞ্চ কিনা। আসলে লঞ্চের গুরুভারই হয় তার কাল। হালকা লঞ্চ চড়ায় বেধে যেত না। বিদেশী লঞ্চ তো বেধে যাচ্ছে না।

"গুপ্ত চর নয়। গুপ্তচর!" সহযোগী বলেন। "সাবোটাশ। তখনি তো মনে রাখা উচিত ছিল যে ওরা কেয়াখালীর মুসলমান। ওদের কাছে ও ছাড়া আর কী প্রত্যাশা করা যায়? আপনি হিন্দু লস্কর আনিয়ে নিন। দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়।"

আমি লস্করদের কোনো দোষ দেখতে পাইনে। লঞ্চ তো ওরা বার করেনি। যিনি বার করতে বলেন তিনি একজন অফিসার। হিন্দু।

টেলিফোনে উপরে রিপোর্ট করি। সাহায্য চাই। উপর থেকে একদল একসপার্ট আসেন। তাঁরা লঞ্চ পরীক্ষা করতে গিয়ে দিশাহারা হন। ওঁদের নৌকা ভেসে যায় মাঝ নদী ছাড়িয়ে। তখন বিদেশীরা এসে ওঁদের পাকড়াও করে রানীমহলে নিয়ে যায়। আর আমি সে বার্তা পেয়ে সোজা কলকাতা চলে গিয়ে সেক্রেটারিয়েটে হাজির হই। নার্ভাস অবস্থায়।

"হিটলারের ডিভিজনকে ডিভিজন সৈন্য খোওয়া গেল, তাঁর নার্ভ বিগড়ায়নি। আমাদের খোওয়া গেছে একদল একসপার্ট। অত সহজে নার্ভ বিগড়াবে।" হেসে বলেন চীফ সেক্রেটারি।

লেখালেখির ফলে একসপার্টদের ফিরে পাওয়া যায়। কিন্তু লঞ্চ পড়ে থাকে ভীষ্মের মতো শরশয্যায়। পাহারা মোতায়েন থাকে লঞ্চের উপরে ও ঘাটে। যাতে লঞ্চটাও খোওয়া না যায়। তার চেয়ে বিপদের কথা লঞ্চ যদি আপনা থেকে ভেসে যায় পদ্মা থেকে মেঘনায়, মেঘনা থেকে বঙ্গোপসাগরে। তখন শত লেখালেখিতেও ফেরত পাওয়া যাবে না। সমুদ্রের মাছ সমুদ্রেই মিলিয়ে যাবে।

রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখি। পমফ্রেট চালান হয়েছে পাকিস্তানের পাক ঘরে, সেখান থেকে পাকিস্তানের পাকস্থলীতে। না, ওরা তাকে ব্যবহার করছে আমাদেরি বিরুদ্ধে। আমার শিল আমার নোড়া

আমারি ভাঙে দাঁতের গোড়া। না, পমফ্রেট পালিয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে, সেখানেই হারিয়ে গেছে। ফিরবে না পমফ্রেট।

এর সঙ্গে জড়িয়েছিল প্রেসটিজের প্রশ্ন। এর পরে কি আমি রানীমহলের শাসকের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলতে পারব? না, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। পমফ্রেট যেন আমার নিজের সম্মানের প্রতীক। ওকে যেমন করে হোক উদ্ধার করতেই হবে। কিন্তু কী করে?

চরের সমস্যাটা ইতিমধ্যে আর সব সমস্যাকে ছাপিয়ে উঠেছিল। যা ওদের নয় তা ওরা গায়ের জোরে দখল করে ভোগ করবে। আমাদের চাষীদের আমরা প্রোটেকশন দিতে পারিনে। দিতে পারিনে গয়লাদেরও। যারা চরে নিয়ে গিয়ে গোরু ছেড়ে দেয়। প্রচুর ঘাস। আবহমানকাল যারা এসব অধিকার প্রয়োগ করে এসেছে আজ দেশ ভাগ হয়ে গেছে বলে তাদের অধিকারও হাওয়া হয়ে গেছে কী করে মেনে নেব একথা? তারা এখন বিদেশী বলে তাদের প্রবেশ মানা, এটাই বা কেমন কথা?

আমি পার্টিশন কামনা করিনি। তবে এটাও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম যে গৃহযুদ্ধ যদি হিন্দু মুসলমানের ধর্মযুদ্ধের মোড় নেয় তা হলে মুসলিমপ্রধান এলাকায় কোনো হিন্দুই নিরাপদ নয়, সে হিন্দুপ্রধান এলাকায় আশ্রয় নেবেই। তেমনি হিন্দুপ্রধান এলাকায় কোনো মুসলমানই নিরাপদ নয়, সে মুসলিমপ্রধান এলাকায় আশ্রয় নেবেই। এমনি করে এক একটি এলাকায় বাস করবে কেবলমাত্র মুসলমান বা কেবলমাত্র হিন্দু। তা হলে তো হিন্দুস্থান পাকিস্তান আপনা হতেই ঘটে গেল। সমগ্র দেশের উপর কংগ্রেসের বা সমগ্র প্রদেশের উপর মুসলিম লীগের একচ্ছত্র রাজত্ব চলতে পারে না। ইংরেজ বিদায় নিলে তো স্বতঃস্ফূর্ত পার্টিশন অবধারিত। আগে ধর্মযুদ্ধ ঠেকাও। সে সাধ্য কি কারো আছে? দুই পক্ষই যে বদলা চায়। না, হিন্দুরাও এর উর্ধ্বে নয়। কাজেই পার্টিশন সহ্য করতেই হবে।

পার্টিশন সহ্য করতে হলো এইজন্যেই যে লোকবিনিময় কারো পক্ষে হিতকর নয়। ওটা বন্ধ করতে হবে। যে যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে ও নিরাপদে থাকবে। ফতেয়াবাদে মুসলমান বেশী, ফুলনায় হিন্দু বেশী। তা হোক, ওরা সমান নিরাপদ। রাষ্ট্র এখন থেকে আর হিন্দু স্বার্থ মুসলিম স্বার্থ দেখবে না, দেখবে নাগরিকমাত্রেরই স্বার্থ।

॥ তিন ॥

এসেছিলুম আমি শান্তির দূত, মিলনের দূত হয়ে। হয়ে দাঁড়ালুম তার বিপরীত। চর অপারেশনের জন্যে আমি রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হই। তাঁরা বলেন, এ তো আন্তর্জাতিক ব্যাপার। মিলিটারি ভিন্ন কে এর মোকাবিলা করবে? সেইসূত্রে ছোট বড় অনেক মিলিটারি অফিসার চর পরিদর্শনে আসেন। লেফটেনাণ্ট জেনারল, ব্রিগেডিয়ার, লেফটেনাণ্ট কর্নেল, মেজর। এমনি বিবিধ র‍্যাঙ্কের। মিলিটারির সঙ্গে এর আগে কখনো এতবেশী দহরম মহরম করতে হয়নি। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

সেসব কথা আজ নয়। আজ শুধু এইটুকু বলি যে যুদ্ধ জিনিসটা একবার যারা দেখেছেন তাঁরাই সব চেয়ে যুদ্ধবিরোধী। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে আর্মির লোক যখন পেশাদার সৈনিক তখন ওরাই তো সব চেয়ে যুদ্ধপাগল সেটা সম্পূর্ণ ভুল। যুদ্ধপাগল যদি কেউ থাকে তো তারাই, যারা কখনো যুদ্ধক্ষেত্রের ধারে কাছেও যায়নি।

ব্রিগ্রেডিয়ার ছিলেন আমাদের হাউস গেস্ট। তোর বৌদিকে বলেন, "দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধে আমি নানা দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে লড়েছি। তার ফলে আমিই সব চেয়ে অহিংসাভক্ত। আমার কথা শুনুন, আপনার স্বামীকেও বলুন, ননভায়োলেন্স ইজ বেস্ট।"

এর পর লেফটেনাণ্ট জেনারল বলেন আমাকে, "খান তিনেক চর দখল করা ইণ্ডিয়ান আর্মির পক্ষে ছেলেখেলা। কিন্তু সেই

ছেলেখেলায় যদি একজন জওয়ানও নিহত হয় তা হলে গোটা আর্মির মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। অমনি বেধে যাবে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। আপনি কি চান যে আমরা তার ঝুঁকি নিই? আমার পরামর্শ শুনুন, আর্মির আশা ছেড়ে দিন। তার চেয়ে রাজ্য সরকারের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে ও ভার নিতে আহ্বান করুন।”

মহাভারতের যুগে পাঁচখানা গ্রাম নিয়ে কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। এ যুগে কি তিনখানা চর নিয়ে আর-একটা কুরুক্ষেত্র বাধবে? আর আমিই হব তার নিমিত্ত? কখনো না। আমি রাজ্য সরকারকে বলে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আনাই। তাদের সঙ্গে আসে রকমারি অস্ত্র। ওরা যেন আধা মিলিটারি।

তা দেখে আমাদের পুলিশ সাহেব বলেন, “সার, পুলিশ কি মরতে এসেছে? খবরদার! একজনও পুলিশের লোক যদি মরে তবে যেখানে যত পুলিশ আছে ধর্মঘট করবে।”

তাঁকে এমন আবেগের সঙ্গে কথা বলতে আর কখনো দেখিনি। যেখানে সারা দেশের মর্যাদা নিয়ে টানাটানি সেখানে একজন সিপাহীর প্রাণহানিটাই কি বড়ো হলো? কারো প্রাণহানি হোক এটা আমার কাম্য নয়, এমন কি অপর পক্ষের প্রাণহানিও না। কিন্তু যদি হয় তা হলে কি পুলিশের সবাই অসহযোগ করবে?

“আমাকে ভুল বুঝবেন না, সার।” তিনি বলেন, “পুলিশের কাজটা ছিল চোর ডাকাত ধরা। ধরেছি। তারপর হলো ট্রাফিক কন্ট্রোল করা। করেছি। তারপর হলো টেররিস্টদের সঙ্গে লড়া। লড়েছি। তারপর হলো কমিউনিস্টদের রোখা। রুখেছি। এখন শুনছি কিনা ভিন্ন রাষ্ট্রের সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে গুলী বিনিময় করতে হবে। এও কি পুলিশের কাজ? চাকরিতে ভর্তি করার সময় সরকার কি বলেছিলেন একথা?”

ইতিমধ্যে আরো খান ছয় সাত লঞ্চও এসে হাজির। সব নেভী থেকে। তাদের সাধারণ নাম ট্যানাক। অপরূপ গড়ন। কিন্তু পমফ্রেটের মতো ভারী নয়। জল কাটে না অত। গঙ্গা যেখান

থেকে পদ্মা হয়ে গেছে তার পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় তাদের রাখি। হ্যাঁ, লস্কররা সবাই মুসলমান। ওই কেয়াখালী ভাটির্গা অঞ্চলের।

"আপনার গোটা নৌবহরটাই না একদিন ফেরার হয়, সার।" রহস্য করেন এক সহযোগী। "আরেকদিন ফিরে আসবে পাকিস্তানী গান-বোট বহর হয়ে।"

কিন্তু ওছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। এক একটি লঞ্চের সঙ্গে এক এক দল সারেং টাণ্ডেল দীর্ঘকাল ধরে সংশ্লিষ্ট। ওসব লঞ্চ অকেজো হয়ে যায় ওরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়। ওদের চাই বলেই তো আমরা সেকুলার স্টেট বরণ করেছি। এ রাষ্ট্রে ওদেরও সমান অধিকার ও স্বার্থ। প্রত্যেকটি ব্যক্তিই আমাদের জাতীয় সম্পদ। প্রত্যেকেই মূল্যবান।

বর্ডারের চাষীরা অধিকাংশই মুসলমান। চরে গিয়ে চাষ করে তারাই। তাদেরই ফসল বিপন্ন। তাদের স্বার্থেই তো আমার চর অপারেশন। নইলে কী আসে যায় আমার? তা বলে লঞ্চ আমি বেহাত হতে দেব না। প্রায় প্রত্যেকটাতে ওয়্যারলেস ফিট করা ছিল। নিয়মিত বার্তা আসত, সব ঠিক আছে।

পমফ্রেটকে আমি খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলুম। তা সত্ত্বেও আমার ভাবনার বিরাম ছিল না। এটা যদি পাকিস্তানের হাতে পড়ে তো দেমাকে ওদের আর মাটিতে পা পড়বে না। ট্রোফি হিসাবে প্রদর্শন করবে ওরা। আর যদি ইঞ্জিন ফেল করে সমুদ্রে ভেসে যায় তো লড়াই করেও ফিরে পাওয়া যাবে না।

এ সঙ্কটের অবসান ঘটায় উত্তরপ্রদেশের গঙ্গায় অসময়ে বন্যা। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! একদিন রেডিওগ্রাম পাই, "পমফ্রেট উদ্ধার হয়েছে।" ছুটে যাই দেখতে। দেখি তালগোলা ঘাটে নোঙর করেছে। শুনি সারেং টাণ্ডেলরা বন্যার পূর্বাভাস পেয়ে লঞ্চে উঠে বসেছিল। পমফ্রেট ভেসে উঠতেই ইঞ্জিন চালিয়ে দেয়। মানুষকে ধর্মমতের দরুন অবিশ্বাস করতে নেই। যাকে রাখো সেই রাখে।

যে বাঁচায়

বাইরের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছি। হিটলারকে নিয়েই ভাবনা। কোনদিন না যুদ্ধ বাধিয়ে বসেন! হঠাৎ কানে আসে ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ। চেয়ে দেখি ঘোড়া আমার কম্পাউণ্ডে ঢুকে কুঠির রাস্তা ধরে ছুটে আসছে আমারি অভিমুখে।

ভেবেছিলুম বারান্দার সামনেই থামবে। ওমা! আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে উঠে আসে ধাপে ধাপে বারান্দার উপর। ভাগ্যিস বারান্দাটা ছিল যেমন দীঘল তেমনি চওড়া। নয়তো ঘোড়ার আক্রমণে আমাকেই ঘরে ঢুকতে হতো।

ঘোড়সওয়ার লাফ দিয়ে নেমে গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি ঠুকে ডান হাত দিয়ে মিলিটারি স্যালিউট করে দাঁড়ান। বলেন, 'গুড মর্নিং, জজ। মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছিলুম। আপনাকে অমন নিবিষ্ট হয়ে কাগজ পড়তে দেখে মনে হলো কিছু একটা ঘটেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার পরে কী? রাশিয়া?'

হেসে বলি, 'গুড মর্নিং, হাফিজ। সতেরশ অশ্বারোহীর একজন মাত্রকেই দেখছি। বাকী ষোলজনকে কোথায় রেখে এলেন? সেবারে আপনারা বাংলা জয় করেছিলেন। এবার বাংলো জয় করবেন না তো?'

নবনিযুক্ত অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হাফিজ মেহেদী খান্ বুঝতে পারেন না যে আমি সাতশো বছর আগেকার পাঠান আক্রমণের কথা ভেবে বলছি। বুঝিয়ে দিতেই হোহো করে হেসে ওঠেন। তালগাছের মতো মাথায় উঁচু। বহরে ক্ষীণ। সারাক্ষণ খাকী শার্ট আর খাকী প্যাণ্ট পরতে ভালোবাসেন। সরল সাদাসিধে মানুষটি। বিনম্রতার প্রতিমূর্তি। গরিবের মা বাপ। নিজেও থাকেন গরিবী চালে।

'তারপর ?' আমি রসিকতা করে বলি, 'মর্নিং ওয়াক বললেন যে ! ওয়াক করে কে ? মানুষ না ঘোড়া ?'

'ঘোড়ারও কসরৎ চাই, জজ। একই সঙ্গে তুজনেরই কসরৎ হয়ে যায়।' বলে হাফিজ ঘোড়ায় লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। বসতে বললেও বসেন না। 'বে' রঙের বিরাট অশ্ব। লোভ হয় চড়তে। হাফিজ আমাকে আগেও সেধেছেন। আমি রাজী হইনি। অধঃপতনের ভয়ে। হাফিজ কিন্তু অকুতোভয়। ঘোড়াটাই ওঁকে ভয় করে। পাঠান কিনা।

'তা হলে আসুন, ভিতরে গিয়ে বসা যাক। এক পেয়ালা চা কি কফি ? এনি ড্রিঙ্কস ?' আমি অফার করি।

'মাফ করবেন, জজ। ওসব আমি খাইনে। আর এই যে ঘোড়া এরও তর সইবে না। তা হলে লড়াই এখন বাধছে না ?' হাফিজ কাগজটার দিকে ইঙ্গিত করেন।

'না, তেমন কোনো খবর দেখছিনে তো।' আমি উত্তর দিই।

ইতিমধ্যে জজ-গৃহিণীও বাইরে এসেছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে হাফিজ আর একটা মিলিটারি স্যালিউট ঠুকে দেন। 'গুড মর্নিং, মিসেস বিশ্বাস।'

'গুড মর্নিং মিস্টার খান্। বসবেন না ?' তিনি অনুরোধ করেন।

'ঘোড়া বসতে চাইছে না যে। আমাকে মাফ করবেন।' বলে আরেকবার স্যালিউট ঠুকে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন হাফিজ। ঘোড়া এক পা এক পা করে সন্তর্পণে ধাপে ধাপে নেমে যায়। তারপর ছুটে অদৃশ্য হয়।

'অদ্ভুত লোক !' মন্তব্য করেন মিসেস। 'তোমাদের সার্ভিসে এমন আজব চিড়িয়া তো দেখিনি।'

'আলাপ হলে দেখবে মানুষ চমৎকার। কিন্তু চাকরিতে আমার মতো মিসফিট। ওঁর উচিত ছিল আর্মিতে যাওয়া। পথ ভুলে চলে এসেছেন সিভিল সার্ভিসে। তোমাকে বলা হয়নি যে এখানে

আসবার সময় কলকাতায় এক বন্ধুর কাছে শুনি আমাদের সার্ভিসে একজন খাকসার যোগ দিয়েছে।' আমি আতঙ্কের ভান করি।

'খাকসার। তার মানে কী? সীক্রেট সোসাইটি?' তিনি হকচকিয়ে যান।

'না, মিলিটাণ্ট অর্গানাইজেশন। বন্দুক নেই বলে বেলচা হাতে নিয়ে কুচকাওয়াজ করে শুনেছি। ওদের আদর্শ আদিপর্বের ইসলাম। তারই অনুসরণে জীবনযাপন। হিংসা বাদে আর সমস্তই খুদাই খিদমদগারদের অনুরূপ। স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, কায়িক শ্রম, অল্পে সন্তোষ, নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে তুলনীয়।' আমি যতদূর জানি।

এই স্টেশনে আসার পর আমি আরো শুনেছিলুম যে হাফিজের বাসায় গোটাকয়েক চরকা আছে। নিজেও কাটেন, অপরকে দিয়েও কাটান। কেউ ভিক্ষা চাইতে গেলে বলেন, 'এস, একটু চরকা কাটা যাক। কিছু নিতে গেলে কিছু দিতে হয়। শ্রম দাও, মজুরি পাবে। ভিক্ষা নয়, বিনিময়।' যারা রাজী হয় তারা আশার অতিরিক্ত পায়। নারাজ হলে খালি হাতে ফেরে।

হ্যাঁ, অদ্ভুত লোক। কিন্তু খাসা লোক। হাফিজ কেমন করে জানতে পেরেছেন যে আমরাও চরকা কাটি। যদিও আর পাঁচজনকে নিয়ে নয়। যেটা হাফিজ প্রায়ই করেন। সেই থেকে আমার উপর ওঁর একটা অহেতুক পক্ষপাত জন্মেছে। তেমনি আমারও ওঁর উপর পক্ষপাত। হাফিজের পেছনে তাঁকে নিয়ে ক্লাবের সভ্যরা হাসি ঠাট্টা করলে আমিই তাঁর পক্ষ নিয়ে তর্ক করি। যে যার ধর্ম পালন করবে। হাফিজের ধর্মই হলো লোকসেবা। কেউ যদি মদ না খায়, সিগারেট না খায়, তাতে কার কী আসে যায়! কেউ যদি কোরানশরিফ আদ্যোপান্ত মুখস্থ বলতে পারে তাতেই বা কার কী ক্ষতি? হাঁ, মেহেদী একজন হাফিজ। ওটা ওর নাম নয়, উপাধি। কোরান ওঁর কণ্ঠস্থ।

লক্ষ করি মুসলমানরাও ওঁকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন। ছোকরা

যদি সামাজিকতা দুরস্ত না হয় তবে চাকরিটি কোনো মতে রাখবে, কিন্তু উন্নতি করবে না। ডিউটিতে অবশ্য খুঁত নেই। কিন্তু ডিউটিই কি সব? শুধু ডিউটি বাজিয়েই কি প্রমোশন হয়েছে কারো? সঙ্গে চাই একটু পালিশ। মালিশও জুড়ে দিতে পারো তার সঙ্গে।

শরীরকে পটু রাখার জন্যে হাফিজ নিয়মিত টেনিস খেলতে আসেন ক্লাবে। আর কেউ না থাকলে আমরা দু'জনে—হাফিজ আর আমি—সিঙ্গলস খেলি। নয়তো আমরা দু'জনে হই পার্টনার। ডবলস খেলি। এমনি করে আমাদের চেনাশোনা জমে ওঠে। এক একদিন আমরা অপেক্ষমান সভ্যদের খেলার কোর্ট ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে নদীর ধারে বেড়াতে বেরই। গল্প জমে ওঠে। হাফিজ প্রায়ই ধর্মের প্রসঙ্গ তোলেন।

'গীতা যখন পড়েন তখন কি আপনি একটানা পড়ে যান? না একটি শ্লোককে চিবিয়ে চিবিয়ে নিঃসত্ত্ব করে পরিপূর্ণভাবে হজম করে তারপরে আর একটিতে দাঁত বসান?' হাফিজ একদিন আমাকে প্রশ্ন করেন। যেন আমি কতবড়ো একজন ধার্মিক।

'আমি একটানা পড়ে যাই। মানে বুঝতে চেষ্টা করি। তার বেশী নয়। একটি একটি করে হজম করতে গেলে বছর ঘুরে যাবে।' আমি কুণ্ঠার সঙ্গে বলি।

'না, না, ধর্মগ্রন্থ ওভাবে পড়তে নেই। পড়লে জ্ঞান হতে পারে, উপলব্ধি হয় না। আর উপলব্ধিই তো আসল।' হাফিজ শুধু মুখস্থ করে ক্ষান্ত নন।

'আপনি কি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থও পড়েন?' আমি আশ্চর্য হয়ে শুধাই।

'পড়ি বইকি। তার থেকে প্রেরণাও মাঝে মাঝে পাই। তবে আমার কাছে কোরানের মতো আর কিছু নয়। এর জন্যে আমাকে ক্ষমা করতে হবে।' উত্তর দেন তিনি।

'ক্ষমার কী আছে? আপনার পক্ষে সেইটেই তো স্বাভাবিক।' আমি আশ্বাস দিই।

'কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের একটি অভিযোগ আছে, জজ। আপনারা যখন ধ্বনি দেন হিন্দু মুসলমান এক হো তার মানে কি এই নয় যে, হিন্দু মুসলমান এক নয়? হিন্দুত্ব ও ইসলাম এক নয়। গীতা কোরান এক নয়। যা এক নয় তা এক হবে কী করে? এক হতে পারে কখনো? হিন্দু মুসলমান বরাবরই দুই ছিল, বরাবরই দুই থাকবে। তাদের একত্বটা স্বপ্ন। তাদের দ্বিত্বটাই বাস্তব। দ্বিত্ব যেমন করে হোক বজায় রাখতে হবেই, নইলে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আপনাদের কী? আপনারা তো মেজরিটি।' বলতে বলতে হাফিজ গরম হয়ে ওঠেন। যেন ইসলাম বিপন্ন।

আমি ওঁকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, হিন্দু মুসলমান যেমন ধর্মের দিক থেকে দুই তেমনি রাজনীতির দিক থেকে এক। অর্থনীতির দিক থেকে এক। ধ্বনি যখন দেওয়া হয় তখন ধর্মের কথা ভেবে দেওয়া হয় না। রাজনীতি অর্থনীতির কথা ভেবেই দেওয়া হয়।

'আঃ! সেইখানেই তো আপত্তি। যারা ধর্মে ভিন্ন তারা রাজনীতিতে এক হয় কী করে? অর্থনীতিতেই বা এক হয় কী করে? তাদের রাজনীতি অর্থনীতিও দুই হবে। কারণ ইসলাম তো কেবল একটা ধর্মমত নয়, ইসলামের আদিপর্বে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিও তার অঙ্গীভূত ছিল। ইসলাম হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ জীবন। মুসলমানরা তো সুদ খাবে না। তারা হিন্দুদের সঙ্গে এক অর্থনীতির শরিক হবে কী করে? তেমনি, ইসলামী শরিয়ৎ যদি মানে তবে হিন্দুদের সঙ্গে এক রাষ্ট্রের নাগরিক হবে কী করে?' হাফিজ আমাকে চেপে ধরেন।

আমি তো পাঠানের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পাইনে। বলি, 'এটা তো ঠিক যে, আমরা একসঙ্গে সাতশো বছর বাস করেছি। দুপক্ষকেই কিছু কিছু ছাড়তে হয়েছে, কিছু কিছু নিতে হয়েছে। ধর্মে না হোক, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিতে। ভারতবাসী হিসাবে আমাদের একটা জাতীয় সত্তাও তো আছে।'

'সেখানেও আমার আপত্তি। ন্যাশনালিজম একটা নতুন ধর্ম। আপনারা সে ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন, আমরা কি পারি? আমরাও যদি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট হই তা হলে কি আরব ইরানী তুর্ক আফগানরা আমাদের কাছে এলিয়েন হয়ে যায় না? আমাদের প্রোফেটও কি তবে এলিয়েন? আপনাদের যেমন ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস আমাদেরও তেমনি হাফিজ সাদী রুমী। তাঁরাও কি আমাদের কাছে এলিয়েন? না, জজ, হিন্দু ভাইদের জন্যে আমরা আরব ভাইদের ইরানী ভাইদের পর করে দিতে পারব না' হাফিজ ছেলেটি অকপট।

'তা হলে কি আপনারা আপনাদের আরব ভাইদের জন্যে হিন্দু ভাইদের পর করে দেবেন? ধর্ম এক নয় বলে কি দেশ এক হবে না? জাতি এক হবে না? কই, এসব তো আগে কখনো শুনিনি? এ কী কথা শুনি আজ মুসলিমের মুখে! আমরা দুই সম্প্রদায় হলেও একই দেশের সন্তান। আমাদের মাতৃভূমি এক।' আমি স্মরণ করিয়ে দিই।

এই হাফিজই পরে একদিন বলেন, 'আপনি এখনো বিশ্বাস করেন যে, আপনাদের সঙ্গে আমরা এক নেশন গড়ব? না, জজ, তা কখনো হতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমান এক নয়, দুই। এই দ্বিত্বকে গোড়াতেই স্বীকার করে নিতে হবে। দ্বিত্বই যেমন প্রথম কথা দ্বিত্বই তেমনি শেষ কথা। হিন্দুই বলুন আর মুসলমানই বলুন ধর্মই জনগণের জীবন। এত যে তাদের দুঃখ কষ্ট মেহনৎ ও দারিদ্র্য সমস্তটাই সহ্য হচ্ছে ধর্মের জন্যে। ধর্মই তাদের শান্তি দেয়। ধর্মই তাদের মুখে হাসি ফোটায়। অথচ ধর্ম তাদের এক নয়। দুই। ধর্ম দুই বলেই নেশনও দুই। এ যুক্তির আর খণ্ডন নেই, জজ। যদি ন্যাশনালিজম মেনে নিতে হয়।'

মুসলিম মানস কোন খাতে বইছে দূর থেকে তার আভাস পাচ্ছিলুম। কিন্তু অতটা পরিষ্কার আর কখনো হয়নি। আমি শিউরে উঠি। ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষ কি হিন্দু মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্র?

না যুদ্ধ এড়াতে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ভূমি? তখনো জিন্নাসাহেব পার্টিশনের দাবী তোলেননি। কিন্তু ইকবালের মুখে পাকিস্তানের ধ্বনি উঠেছিল।

যাক, তার দেরি আছে। ইংরেজরা তো এখনি বর্জন করছে না। আমি বলি, দুই যেমন সত্য একও তেমনি। আমাদের প্রচ্ছন্ন একত্বই আমাদের দ্বিত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে শেখাবে। আমরা যদি হাতে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করি তাহলে আমাদের মধ্যে একপ্রকার সংগ্রামী একতা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা সংগ্রামকালের একতাকে শান্তিকালের একতায় সম্প্রসারিত করব। আর ইউরোপে যদি মহাযুদ্ধ বাধে আর এদেশের সৈনিকরা তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তাহলেও একপ্রকার কমরেডশিপ গড়ে উঠবে হিন্দু সৈনিকে আর মুসলিম সৈনিকে। নেশন গড়ে ওঠে একসঙ্গে লড়তে লড়তে। অন্যান্য দেশে তাই হয়েছে। এদেশেও তাই হবে।

হাফিজ তাঁর নিজের যুক্তিতেই অটল। 'কথাটা অত সহজ নয়। যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সারা দেশে এমন এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাতে হিন্দুও মুসলমানের অধীন নয়, মুসলমানও হিন্দুর অধীন নয়। কংগ্রেস আর লীগ যদি কোয়ালিশনে রাজী হতো তা হলে একসঙ্গে মন্ত্রিত্ব করতে পারত। ইংরেজ বিদায় নিলে পরে একসঙ্গে রাজত্ব করতে পারত। কিন্তু সে বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হতো কি? অন্যান্য দল তাদের হটাত। তা হলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে আর কী বোঝায়? হিন্দু ভারত, মুসলিম ভারত। দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। হাসছেন যে! কেন নয়?'

আমি বলি, 'বাংলাদেশ যদি মুসলিম ভারতে পড়ে তা হলে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের হিন্দুরা আমার চোখে এলিয়েন হয়। আমিও তাদের চোখে এলিয়েন। রামকে আর কৃষ্ণকে আর বুদ্ধকে আমি এলিয়েন ভাবতে পারি কখনো? গান্ধীকে এলিয়েন ভাবতে পারি?'

'গান্ধী বলছেন কেন? বলুন মহাত্মা গান্ধী।' হাফিজ আমার ভুল শুধরে দেন।

'মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব বরাবরই প্রেরণাময়। জিন্নাসাহেবের নেতৃত্ব তেমন নয়। তিনি যোদ্ধাও নন। তিনি ধর্মেরও ধার ধারেন না। লোকসেবাও তাঁর মিশন নন। আমরা খাকসাররা তাঁকে দুচক্ষে দেখতে পারিনে। কিন্তু মুসলিম জনমত ক্রমে ক্রমে তাঁকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। দেশের এখন দুই কেন্দ্র। মহাত্মা গান্ধী ও কায়দে আজম জিন্না।'

হাফিজের সঙ্গে আমার প্রায়ই তর্ক বাধত হিংসা অহিংসা নিয়ে। হাফিজ কিছুতেই স্বীকার করতেন না যে অহিংসা দিয়ে দেশ স্বাধীন হবে ও তারপরে আত্মরক্ষা করতে পারবে। বেশ, তবে হিংসা দিয়েই হোক। হচ্ছে না কেন? আমার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, 'তার জন্যে অস্ত্র চাই। কিন্তু অস্ত্র কোথায়?'

'অস্ত্র পেলেও কি আমরা ইংরেজদের সঙ্গে পারব? বাহাদুর শা, নানা সাহেব পেয়েছিলেন? ওসব অলীক কল্পনা।' আমি হেসে উড়িয়ে দিই। 'বন্দুকের বদলে বেলচা দিয়েও কিছু হবে না, হাফিজ।'

'বুঝি। কিন্তু ট্রেনিংটা তো একই। আমরা ট্রেন্‌ড হয়ে থাকছি। একদিন বন্দুকও কেমন করে জুটে যাবে। যুদ্ধটা তো একবার বাধুক।' যুদ্ধের উপর বরাত দেন হাফিজ।

অন্য একদিন বেড়াতে বেড়াতে হাফিজ আমাকে বলেন, 'আপনাকে আমরা ভালোবাসি।'

তা শুনে আমি একটু চমক বোধ করি। 'আমরা' বলতে কারা? কিন্তু তা নিয়ে জেরা করিনে। শুনে যাই ওঁর কথা। ওঁর বিশ্বাস আমি গান্ধীপন্থী, আমি অহিংসাবাদী, আমি লোকের সেবা করি। আমি একজন দরবেশ কি ফকির।

'আরে, না। আমি ওসব কিছু নই।' হাফিজকে আশ্বস্ত করি। 'আমি চাই বাঁচতে ও বাঁচাতে। আমার মতে যে বাঁচায় সেই

বাঁচে। যে মারে সেই মরে। জীবনটা কি মারবার ও মরবার জন্যে? না বাঁচবার ও বাঁচাবার জন্যে?'

মহাত্মাও তো বলছেন যীশুখ্রীষ্টের ভাষায়, তলোয়ার যে ধরে তলোয়ারেই সে মরে। কিন্তু আমার বংশের ধারাই যে অন্যরূপ। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন রোহিলা। রোহিলখণ্ড জয় করে নেন। জয় করতে গিয়ে যা করেন তার চিহ্ন এখনো দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামে গেলে দেখবেন হাড়ের পাহাড়। কত মানুষ যে মেরেছেন তার সুমারি হয় না। প্রাণ দেওয়া নেওয়া আমাদের কাছে একটা খেলা। আমরা যেমন মারতে ভালবাসি তেমনি মরতে। মরণকে আমরা নিই খেলোয়াড়ের মতো। লড়াই যেন পোলো খেলা। তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। নইলে জীবনে মরচে ধরে যায়। যুদ্ধহীন জীবন কি একটা জীবন? কবে লড়াই বাধছে, বলুন।' হাফিজ মনে করেন আমি সবজান্তা।

একদিন সত্যি সত্যি বেধে যায় যুদ্ধ। হিটলার বাধিয়ে দেন। তখন হাফিজ ছুটে আসেন আমার কাছে। বলেন 'এবার মহাত্মা কী করবেন?'

'যুদ্ধে সহযোগিতা গান্ধীনীতি নয়। কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন।' আমি উত্তর দিই।

হাফিজের ওটা বিশ্বাস হয়নি। শেষে যেদিন সত্যি সত্যি কংগ্রেস পদত্যাগ করে সেদিন তিনি সকৌতুকে বলেন, 'আপনারা অমন করে পালিয়ে গেলেন কেন? জিন্নার সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুসলিম লীগকে বখরা দিয়ে হিটলারের সঙ্গে লড়তে পারতেন।'

'তাহলে স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজের সঙ্গে লড়ত কে?' আমি জানতে চাই।

'কেন, বোসবাবু? আবার কে?' হাফিজের হীরো হলেন সুভাষচন্দ্র।

॥ চার ॥

এরপরে একদিন হাফিজ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেন। যেতে হবে কোথায় যেন সেটলমেন্ট ক্যাম্পে। সেখান থেকে যথারীতি মহকুমা হাকিমের পদে। আর হয়তো দেখা হবে না। মানে, এই স্টেশনে। আমরা শুভকামনা জানাই।

সেদিন তিনি তাঁর জীবনকাহিনীর খানিকটে শোনান। কেমব্রিজে যখন তিনি শিক্ষানবীশ তখন একদিন পনেরো মিনিটের নোটিসে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় অপারেশন টেবিলে। অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের জন্যে অপারেশন। অতি বিপজ্জনক কেস।

অপারেশন টেবিলে শুয়ে জ্ঞান হারাবার আগে তিনি আল্লাতালার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। নিজের জন্যে একটুও হাতে রাখেন না। তাঁর আর কোনো প্রার্থনা নেই, একমাত্র প্রার্থনা এই যে আল্লার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। পরের দিন জেগে দেখেন বেঁচে আছেন। ডাক্তার তাঁকে অভিনন্দন করে শুধান, বাঁচলেন কী করে? এ কেস তো বাঁচবার কেস নয়। তিনি বলেন, খোদার ফজলে।

'আমার প্রার্থনায় কোনো ফাঁকি ছিল না, জজ। থাকলে সেই টেবিলেই আমার মৃত্যু হতো। সেই যে বেঁচে গেলুম সেটা মরে যাওয়ার পর নতুন করে বাঁচা। তখন থেকেই আমি আপনাকে উৎসর্গ করে দিয়েছি মানুষের সেবায়। মানুষের সেবাই তো আল্লার সেবা। আমার আয়ুষ্কাল তো শেষ হয়েই গেছল। এটা একটা বাড়তি আয়ুষ্কাল। এটা আত্মসুখের জন্যে নয়। হ্যাঁ, সেই ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন, এমন রিল্যাকস্‌ড দেহ তিনি দেখেন নি। বিশ্বাস! বিশ্বাস! বিশ্বাসে কী না হয়!'

গান্ধীজীর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের প্রসঙ্গ ওঠে। হাফিজ বলেন, 'হ্যাঁ, উনিও একজন ম্যান অফ ফেথ। লোকে ভাবে পলিটি-

সিয়ান! কত না ক্যালকুলেট করে চাল দেন। তা নয়। অন্তরের বাণী শুনে চালিত হন।'

হাফিজের সঙ্গে এই হয়তো শেষ দেখা। কিছুদিন থেকে আমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবছিলুম। ছেড়ে দিলে আর কখনো এক স্টেশনে পরস্পরকে পাওয়া যাবে না। তাই ভারাক্রান্ত মনে বিদায় দিই। বলি, 'খোদা হাফেজ।' তিনিও একটু হেসে তাই বলেন।

বছর চারেক বাদে কলকাতার পথে হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে হঠাৎ একদিন পুনর্দর্শন। সেই খাকী শার্ট ও খাকী প্যান্ট পরা মানুষটি। সঙ্গে সেইরকম পোশাকে আরেকজন। নেমে এলেন ওঁরা ট্রাম থেকে বোধ হয় আমাকে লক্ষ করে।

'হ্যালো, জজ! কেমন আছেন আপনি? আর মিসেস বিশ্বাস? আর ছেলেমেয়েরা?' একনিশ্বাসে প্রশ্ন করে যান হাফিজ।

'ভালো। ভালো। সবাই ভালো। আর আপনি? শুনেছি বিয়ে করেছেন। মিসেস কেমন আছেন?' আমি তাঁর হাতে হাত রেখে শুধাই।

'ভালো। আপনাকে একটা খবর দিই। এইমাত্র ইস্তফা দিয়ে এলুম। এখন আমি মুক্ত।' হাফিজের মনে বিষাদ, মুখে হাসি।

'ও কী? ব্যাপার কী? কেন আপনি অমন কাজ করতে গেলেন?' আমি তো বিস্ময়ে বিমূঢ়। ওঁদেরি তো রাজত্ব। মানে, মন্ত্রীর গদি।

'ডেকে পাঠিয়েছিলেন চীফ সেক্রেটারী। গেলুম সেক্রেটারিয়েটে। হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। দিলুম লিখে ইস্তফাপত্র। ব্যাস, আমি এখন খালাস। আচ্ছা, আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? আপনাকে আটকে রাখলুম।' হাফিজ বলেন।

'আমিও যাচ্ছিলুম ট্রাম ধরতে। পার্ক সার্কাসে আমার বন্ধুর ওখানে। আপনারাও আসুন না। যদি হাতে অন্য কোনো কাজ না থাকে।' আমি প্রস্তাব করি।

তিনজনে মিলে ট্রামে উঠে বসি। বিকেলবেলা। কিন্তু ছুটির সময় হয়নি। ফাঁকা ট্রাম। পাশাপাশি বসে আলাপ করি।

'হুজুরদের কাছে আমি এক পয়সাও চাইনি। ওঁদের কোনো কমিটমেন্টই নেই। সবটাই দায়িত্ব আমার। আমিই আমার মহকুমার লোকদের অন্ন যুগিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি এতদিন। আমার নিজস্ব একটা পরিকল্পনা আছে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হলে প্রদেশময় দুর্ভিক্ষ হতো না। এই যে চারদিকে হাহাকার পড়ে গেছে, এ হাহাকার আমার মহকুমায় নেই। কিন্তু এর জন্যে কেউ কি আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে? খাদ্যমন্ত্রী আমার উপর খাপ্পা। কেন আমি দুর্ভিক্ষ ঘটতে দিইনি? কেন তাঁর পেটোয়া কালো-বাজারী ও মজুতদারদের রাতারাতি ফেঁপে উঠতে দিইনি? কেন ধানচালের রপ্তানি বন্ধ করেছি? অবাধ বাণিজ্য, অবাধ গতিবিধি, এসব নির্দেশ কেন অমান্য করেছি? আরে, করেছি কি আমি নিজের স্বার্থে? না জনগণের স্বার্থে?' হাফিজ জবাবদিহি চান আমার কাছে। যেন আমিই সরকার বাহাদুর।

আমি এর কী জবাব দিতে পারি! দুঃখিত হয়ে বলি, 'তা আপনি ছুটির দরখাস্ত করলেন না কেন? দুর্ভিক্ষ তো বেশীদিন থাকবে না, উজীরদের ওজারতের মেয়াদও ফুরিয়ে যাবে। তাঁরা কেউ পারমানেণ্ট নন, আপনিই পারমানেণ্ট।'

'ছুটি নেওয়া মানে তো পালিয়ে যাওয়া। আমি কি এস-কেপিস্ট? যেখানে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিপন্ন সেখানে আমার কাজ কি চাচা, আপনা বাঁচা? না ওদের বাঁচানো?' হাফিজ আবার আমার কাছে জবাব চান। আমাকে নিরুত্তর দেখে ক্ষেপে যান। বলেন, 'এই শয়তানী সরকার মানুষকে বাঁচাবে না, যদি কেউ বাঁচাতে যায় তাকে শাসাবে। এর সঙ্গে সংশিষ্ট থাকাটাই একটা পাপ। জজ, আপনিও দায়ী। এই ব্যাপক নরহত্যার জন্যে।'

আমি চমকে উঠি। সাফাই দিই, 'এ ব্যাপারে আমার কী দায়িত্ব! আমি একজন জজ। আমি কি কখনো অন্যায় বিচার করেছি?'

'না, না, আপনিও দায়ী। এই সরকারের প্রত্যেকটি কর্মচারীই দায়ী। কারো বিবেক নির্মল নয়। সকলেরই ইস্তফা দেওয়া উচিত।' হাফিজ তর্জনী উঁচিয়ে বলেন, 'অমন করে আপনার বিবেককে ভোলাতে পারবেন না। আল্লার দরবারে আপনার বিরুদ্ধেও ফরিয়াদ আনবে ওরা, ওই যারা কাতারে কাতারে মরছে আবাল বৃদ্ধ বনিতা।'

ব্যথিত হই। বলি, 'চাকরিটা ছেড়ে দিলে আপনার সংসার চলবে কী করে? বাঁচবেন কী করে?'

'আল্লার উপরে বিশ্বাস থাকলে ও তাঁর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে তিনিই আবার বাঁচাবেন, সেবার কেমব্রিজের অপারেশন টেবিলে যেমন বাঁচিয়েছিলেন। আমার এই জীবনটাই তো উদ্বৃত্ত জীবন। এর জন্যে এত ভাবনা!' হাফিজ হেসে উড়িয়ে দেন।

সেদিন আমার বন্ধুর ওখানে দু'জনাকে দু' পেয়ালা চা দেওয়া হয়। আর কিছু ওঁরা নেবেন না। বিদায় বেলায় দেখি দুটি পেয়ালার দুটি পিরিচে দুটি আনী। তাজ্জব বনে যাই। বলি 'এটা তো চায়ের দোকান নয়, হাফিজ।'

'কিছু মনে করবেন না, জজ। আমরা খাকসার। বিনিময় না দিয়ে গ্রহণ করিনে।. নিলে আমাদের সঙ্ঘের নিয়মভঙ্গ হয়। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ। আচ্ছা, তাহলে আসি। আপনার স্ত্রীকে আমার সেলাম জানাবেন। আপনাকেও সেলাম।' এই বলে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে মিলিটারি স্যালিউট দেন হাফিজ। আমি ডান হাত বাড়িয়ে দিলে ডান হাত দিয়ে ঝাঁকানি দেন। গুড বাই।

জীবনে আর দেখা হয়নি। তবে ওপার বাংলা থেকে একদিন একটি ছাত্র তাঁর আদরের নিদর্শন এক থান খদ্দরের চাদর দিয়ে যায়। তাঁর নিজের হাতের কাজ। সেই অমূল্য সম্পদের বিনিময় দিই কী করে? এখনো দিতে পারিনি।

(১৯৭১)

যুবরাজ

কবে একবার 'মুকুট' নাটকে ও যুবরাজ সেজেছিল। তার আগে ও পরে কত কী পার্ট নেয়। কোনোবার রঘুবীর, কোনোবার প্রবীর, কোনোবার আলেকজাণ্ডার না দস্যু, কোনোবার মার্ক অ্যানটনি না ব্রুটাস। কিন্তু সেই যে যুবরাজ সাজা তারপর থেকেই ওর নাম দাঁড়িয়ে যায় 'যুবরাজ'! আমরাই ওটা তামাশা করে চাউর করে দিই।

কেবল যে ইস্কুলে বা খেলার মাঠে তাই নয়, দোকানবাজারেও সেই নাম রটে যায়। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় দু'ধারের দোকান থেকে ডাক আসে, "সেলাম, যুবরাজ সাহেব। আইয়ে। দেখিয়ে।" ওকে খোসামদ করে ওরা দামী দামী চিজ গছিয়ে দেয়। ও হাসিমুখে নেয়, কিন্তু বাড়ি গিয়ে এমন বকুনি খায় যে আমরা হেসে কুটিকুটি। তবু ওর মতো সদ্‌মেজাজী ছেলে আমি কম দেখেছি।

পরিহাস হিসাবে যেটার আরম্ভ সেটা পরে সীরিয়াস হয়ে ওঠে। যুবরাজের ছদ্মবেশ ধারণ করতে গিয়ে ওর ধারণা দাঁড়িয়ে যায় ও ছদ্মবেশী যুবরাজ।

অদ্ভুত! না? তখনো আমি মনস্তত্ত্বের বই পড়িনি। ফিকসেশন কাকে বলে তা জানতুম না। জানলে বলতুম ওটা একটা ফিকসেশন। ছেলেটা কিছুতেই ওটা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। ছদ্মবেশী যুবরাজ দিন দিন অসহ্য হয়ে ওঠে। ওর ব্যবহারই বদলে যায়। আমাদের কাউকেই ওর চোখে লাগে না। আমরাও ওর ধারে কাছে যাইনে।

এমন সময় ওর বাবা কাঠের কারবার গুটিয়ে নিয়ে হাজারিবাগ না কোডার্মা চলে যান সেখানে মাইকার কারবার করেন। ওর সঙ্গে আমাদের ছেদ পড়ে যায়। কোনো পক্ষ কোনো পক্ষের

খোঁজখবর নেয় না। তবে আমার বাবার সঙ্গে ওর বাবার হৃদ্যতা ছিল বলে বিজয়ার চিঠি ফী বছর আসত ও যেত। সেই ভাবে যোগাযোগ বজায় থাকত।

স্কুলের পড়া শেষ হলে ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ও কেমন করে একদিন সন্ত্রাসবাদী চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে। বোমার মামলার আসামী হয়ে হাজতে যায়। ওর গুরুজন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ওকে খালাস করে আনেন। কিন্তু চোখে চোখে রাখা কি সম্ভব? তাই কোনো মতে একটা পাসপোর্ট যোগাড় করে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেন। কপালে যদি থাকে তো ব্যারিস্টার হয়ে ঘরে ফিরবে। বিলেতে কিন্তু ওর মন বসে না। 'দাদা'দের গোপনীয় নির্দেশে ও জার্মানীতে গিয়ে জোটে। উদ্দেশ্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ।

পরবর্তীকালে জার্মানীতে ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি, তবে শুনতে পাই ও একজন মান্যবর ব্যক্তি। হামবুর্গে ওর আস্তানা। ওখানে আমি যাইনি। ও নাকি ছদ্মবেশী এক রাজকুমার। রাজনৈতিক কারণে ইনকগনিটো চলাফেরা করে। তবু ওর মাথায় পাগড়ি দেখে লোকে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। দেখতেও সুপুরুষ।

ও জনত না যে ক্ষমতা আসবে হিটলারের হাতে। কমিউনিস্টদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিল বলে হিটলারের পুলিশ ওর হাতে হাতকড়া পরায়। পরে রাজবংশীয় শুনে মাফ চেয়ে ছেড়ে দেন। ও কিন্তু আর একটা দিনও জার্মানীতে থাকে না। হামবুর্গ থেকে কেটে পড়ে স্টকহলমে। সেখান থেকে লেনিনগ্রাডে। ওখানকার কমিউনিস্ট মহলে একজন কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠতে ওর বাধে না। প্রোলিটারিয়াটের জন্যে সর্বত্যাগী যে জন সে তো সর্বত্র স্বাগত।

ভালোই চলছিল রাশিয়ায়। পরে একসময় স্টালিনের নির্দেশে শত শত পার্টি কর্মীকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে চালান দেওয়া হয়। সেখান থেকে অনেকেই প্রেরিত হন সাইবেরিয়ায়। যাদের বরাত আরো মন্দ তারা পরপারে। উদ্যত খড়্গ একদিন যুবরাজের স্কন্ধেও

পড়বে। এই ভয়ে বেচারা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেয় আবার সেই বিলেতে। ওরা ঢুকতে দেয়, কিন্তু টিকতে দেয় না। ইতিমধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের যুগ বিগত হয়েছে, যুবরাজের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ প্রত্যাহার করতে একটিবার ক্ষমাপ্রার্থনাই যথেষ্ট হলো। যুবরাজ এবার স্বদেশের মাটি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে, আর রাজনীতি নয়।

ওর বাবার কারবার তখন জমজমাট। ছেলেকে পার্টনার করে নেন। ছেলে যে এতকাল ভেরেণ্ডা ভেজেছে তা নয়। তিন চারটে ভাষায় অনর্গল কথা বলতে শিখেছে। এনজিনীয়ার হয়েছে। কিসের এনজিনীয়ার তা আমি জানিনে। বিলেতে কিছুদূর আইনও পড়েছিল। ওর বিদ্যাবুদ্ধি এবার কাজে লেগে গেল। অর্থপ্রসূ হলো।

যুদ্ধের সময় কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস। মাইকা ব্যবসায়ীদের পৌষমাস। যে টাকাটা ওরা লোটে তা দিয়ে কলকাতায় একখানা ম্যানসন বানায়। সেটাও ভাড়া লোটে। যুবরাজকে প্রায় দেখা যায় গাড়ি হাঁকিয়ে কলকাতা হাজারিবাগ করতে। ওদিকে ওর বাবা যক্ষের মতো ধন আগলে পড়ে থাকেন হাজারিবাগে না কোডার্মায়।

রায় বাহাদুর খেতাব ঘোষিত হবার কয়েকদিন পরেই আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় তাঁর দেহান্ত হয়। দারুণ শক পায় যুবরাজ। ও তো স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল যে হাজার পঞ্চাশ টাকা সদাব্রত করে যিনি রায় বাহাদুর হলেন লাখ দুয়েক টাকা খয়রাৎ করলে তিনি অমনি রাজা উপাধি পাবেন। তখন আর ছদ্মবেশী কেন, প্রকাশ্য রাজকুমার হতে ওর বাধা কোথায়?

শক পেলে কারো কারো মাথা খারাপ হয়ে যায়। যুবরাজের বেলা হলো অন্যরূপ। বাল্যকাল থেকেই ওর ভিতরে একটা ধর্মভাব ছিল। সেই সুপ্ত ধর্মভাবের পুনর্জাগরণ ঘটে। পিতা চলে গেছেন কিন্তু পরমপিতা তো রয়েছেন। তাঁর রাজ্য সারা জগৎজুড়ে। স্পেস জুড়ে। টাইম জুড়ে। তাঁর রাজ্যই কি তারও যৌবরাজ্য নয়? পিতার দেহান্ত হয়েছে বলে তারও যৌবরাজ্যের অন্ত হয়েছে তা নয়।

সে যেমন যুবরাজ ছিল তেমনি যুবরাজ থেকে গেল। যদিও আর কেউ সেকথা জানতে পেল না।

তার চরিত্রেও এই উপলব্ধির প্রতিফলন পড়ে। সে যথারীতি তার অতিথি বা ইয়ারদের পানীয় অকার করে কিন্তু নিজে পান করে না। ইউরোপে গিয়ে যে পানদোষ অভ্যাস করেছিল সেটা এক কথায় ছেড়ে দেয়। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'আমার লিভার খারাপ। এখন থেকে সাবধান না হলে নির্ঘাত মরণ।'

আসলে তা নয়। ছেলেবেলা থেকেই সাধুসন্তের সংস্পর্শে এসে ওর প্রত্যয় হয়েছিল যে ইংরেজীতে তিনটি কথা আছে, তিনটিই ডবলিউ দিয়ে আরম্ভ। তার একটি তো ওয়াইন, আরেকটি উওম্যান, আরেকটি ওয়েল্থ। কিন্তু উত্তর জীবনের উদ্দামতায় এ প্রত্যয় অবিচল থাকে না। বাড়ির আওতার বাইরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই শিথিল হয়। আর দশজন যুবকের মতো তারও ধারণা জন্মায় যে পুরুষের জীবনে এই তো পুরুষার্থ। এসব যার জীবনে হয়নি তার জীবনের অভিজ্ঞতা কতটুকু!

হঠাৎ একদিন কলকাতায় ওর সঙ্গে আমার মুখোমুখি ঘটে যায়। একটা পার্টিতে। 'নন্দন না? চিনতে পারছিস আমাকে?' ও আমার কাছে এসে দুই হাতে ঝাঁকানি দেয়।

'আরে, এ যে মুকুল! আমাদের যুবরাজ। তুই না হাজারিবাগে থাকিস?' আমি ওর দু'হাত ছেড়ে দিইনে।

'কলকাতায়ও আমাদের আপিস আছে। এখানে ওখানে দুই জায়গায় ঘুরপাক খাই। একদিন চল না আমার সঙ্গে আমার গাড়িতে। ঘুরিয়ে এনে দিয়ে যাব তিনদিন পরে। তোর সঙ্গে রাজ্যের কথা আছে। ওঃ কতকাল পরে দেখা! নন্দন রে, তুই ছাড়া কে আছে এ পোড়া দেশে যার চোখে আমি যুবরাজ।' সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে।

'কেন, নরেন, যেদো, ভূতো এরাও তো আছে। হ্যাঁ বেঁচে আছে সব ক'টা পুরোনো পাপী। দেখা হলেই বলে, যুবরাজের সমাচার

কী? কোনোদিন তো ভুলেও চিঠিপত্র লিখিস না!' আমি অনুযোগ করি।

'সবাইকে আমার ভালোবাসা জানিয়ে দিস।' ও গাঢ়স্বরে বলে।

বয় ড্রিঙ্কস নিয়ে আসে। আমাকে লেমন স্কোয়াশ তুলে নিতে দেখে সেও তাই করে। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বলি, 'শুনেছিলুম তুই জলস্পর্শ করিসনে। সুরাই তোর একমাত্র পানীয়।'

'লোকে যতটা রটায় ততটা নয়। ও অভ্যাস এক কথায় ছেড়ে দিয়েছি। কেউ কারণ জানতে চাইলে বলি, লিভার খারাপ। আসলে তা নয়। তুই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোর কাছেই খুলে বলতে পারি।' ও আমাকে এক কোণে নিয়ে যায়। অপরের কানএড়িয়ে।

'তা হলে এই ব্যাপার! তিনটে ডবলিউর একটা এতদিনে ঘুচল!' আমি ওর কথা শুনে বিস্মিত হই।

তখন কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি যে যুবরাজ তার চেয়ে আরো এক-পা এগোবে। ও তো সাধুসন্ত নয়। যদিও সাধুসন্তর সঙ্গে মিশতে ভালোবাসে। ওদের বাড়িতে তো একটা আস্ত অতিথিশালাই ছিল সন্ন্যাসী বৈরাগীদের জন্যে।

বছর পাঁচেক অদর্শনের পর আবার একদিন দেখা। এবার আসানসোলে। সেখানে আমার একটা সরকারী কাজ ছিল। যুবরাজ ওই পথ দিয়ে পাস করছিল। আমাকে ধরে নিয়ে গেল রেল স্টেশনে রিফ্রেশমেন্ট রুমে।

'চল না তোকে হাজারিবাগ নিয়ে যাই। আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব।' প্রস্তাব করে যুবরাজ।

'দূর! তা কি হয়। আমি যে সরকারী কর্মচারী। নিজের এলাকার বাইরে গেলে তার আগে অনুমতি নিতে হয়।' আমি ওর প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিই।

এই স্থির হয় যে পুজোর ছুটিটা আমি হাজারিবাগে কাটাব। ওর অতিথি হব। সস্ত্রীক। বিদায়ের সময় ও আবেগের সঙ্গে

বলে, 'তুই ছাড়া আর কেউ আমাকে চিনবে না রে ও পোড়া শহরে। কেউ বলবে না যে আমি যুবরাজ।'

সেবার পুজোর বন্ধে আমাদের অন্য কোথাও যাবার পরিকল্পনা ছিল না। গেলুম হাজারিবাগ। সেখানে বিরাট চার মহলা বাড়ি ওদের। যুবরাজের মহলে এক সুটঘর আমাদের জন্যে বরাদ্দ। স্বাধীনভাবেই থাকি।

আমার স্ত্রীর সময় কাটে ওর স্ত্রীর সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলে। ভদ্রমহিলা যৌবনেই জরতী। কিন্তু কেন তা ভেঙে বলেন না। চিরকাল ঐশ্বর্যের কোলেই লালিত হয়েছেন। এখানে তো ঐশ্বর্যের সায়রে ভাসছেন। পদ্মাসনা লক্ষ্মীর মতো। দুঃখের মধ্যে এই যে বছরখানেক আগে পুত্রশোক পেয়েছেন। তাঁকে সমবেদনা জানান আমার গৃহিণী। তিনিও তো ভুক্তভোগী।

যুবরাজ আমাকে মোটরে করে শহরের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যায়। একটু নিভৃত জায়গা পেলে আমরা মোটর থামিয়ে পায়চারি করি বা পাথরের উপর বসি।

'দ্যাখ, নন্দন, তুই ছাড়া আর আমার আছেই বা কে যার কাছে দুটো প্রাণের কথা বলে প্রাণটা জুড়োবে! চিঠিপত্রে এসব বলা যায় না। আর জানিস তো, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। সাহিত্য অতি সামান্যই পড়েছি। ভাব প্রকাশ করতে আমি অক্ষম।' যুবরাজ গৌরচন্দ্রিকা করে।

'তোর যা মনে আসে তা নির্ভয়ে বলে যা। আমি ভাবগ্রাহী।' ওকে উৎসাহ দিই।

'আমার জীবনে যেন শোকের মিছিল চলেছে, ভাই। পিতৃ-শোকের চার বছর যেতে না যেতে পুত্রশোক। যুবরাজের যুবরাজ চলে গেল রে! আর কেন বেঁচে থাকা! কার জন্যেই বা বেঁচে থাকা!' যুবরাজ ভেঙে পড়ে।

আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা জানাই। বলি, 'মৃত্যুর উপরে কি কারো হাত আছে? জন্মের উপরেও নেই।'

ও দপ করে জ্বলে ওঠে। 'কে বলে জন্মের উপরে নেই ?'

আমি হকচকিয়ে যাই। ও ঢোক গিলে বলে, 'আছে, আছে, জন্মের উপরে হাত আছে। আমি ব্রহ্মচর্যের শপথ নিয়েছি আজীবন।'

আমি চমকে উঠি। 'সে কী রে। তোর এমন দুর্মতি হলো কেন! তোর তো ছেলে বলতে ওই একটিই ছিল। আর একটি হবে কী করে? না ওই মেয়েই তোর একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে?'

রুমাল দিয়ে চোখ মোছে যুবরাজ। ধরা গলায় বলে. 'আর আমি কাউকে এ পৃথিবীতে আনতে চাইনে, নন্দন। এখানে মৃত্যুযন্ত্রণা আছে। আহা, কী যন্ত্রণা পেয়ে গেল খোকন আমার!'

সমবেদনা জানাই। আমিও তো ভুক্তভোগী। বলি, 'অমৃতের সন্তানকে মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে যেতে হয়, মুকুল। আসতে হয় জন্মের দুয়ার দিয়ে।'

'আমি কিন্তু আর ও-খেলায় পার্ট নিতে পারব না, নন্দন। নো মোর। নো মোর। আমার স্ত্রীকে বলেছি আমাকে ক্ষমা করতে।' যুবরাজ কাতর কণ্ঠে বলে।

দাম্পত্য ব্যাপারে আমার কি কোনোরকম কৌতূহল প্রকাশ করা উচিত? আমি চুপ করে শুনে যাই। ও বলে যায়, 'ওর সম্মতি আছে কিনা জানতে চাই। ও বলে, হ্যাঁ।'

এত দুঃখেও আমার হাসি পায়। 'মেয়েদের রীতি জানিসনে দেখছি। ওরা যখন বলে, না, তখন তার মানে—হ্যাঁ। ওরা যখন বলে, হ্যাঁ, তখন তার মানে—না।'

যুবরাজ স্বীকার করে যে কথাটা বোধহয় সত্য। ওর মা এখনো বেঁচে। তিনি একদিন ওকে বলেন, 'ছি, বাবা! অমন শপথ কি নিতে আছে! বৌটাকে অমন করে দগ্ধানো কি ভালো! ওর কত কষ্ট হচ্ছে!'

'তুই এর উত্তরে কী বললি?' আমি আগ্রহী হই।

'বললুম, মা, আমি কী করব! প্রবৃত্তিমার্গ পেছনে ফেলে এসেছি। এখন আমার সামনে নিবৃত্তিমার্গ। চল্লিশ পার হয়েছি। আর ওসব ভালো লাগে না।' যুবরাজ বলে যায়।

'কিন্তু তোর স্ত্রীকে দেখে তো মনে হয় না যে ত্রিশ পেরিয়েছেন। এত কম বয়সে কি নিবৃত্তি আসে? জোর করে আনতে গেলে চুলে পাক ধরবে না!' আমি অভিযোগ করি।

'যাঃ! ওটা শোক থেকে।' যুবরাজ এক কথায় ডিসমিস করে।

এর পরে ও আমাকে বোঝায় যে ধর্মজীবন আর কামজীবন দুই একসঙ্গে চলতে পারে না। একটার খাতিরে অপরটাকে পথ ছেড়ে দিতে হবেই। নয়তো যেটা হবে সেটা ভণ্ডামি।

'কেন, প্রাচীনকালের মুনিঋষিরা কি ভণ্ড ছিলেন? সকলেরই তো স্ত্রীপুত্র ছিল।' আমি উদাহরণ দিই।

'ওঁদের কথা আলাদা। আমি তো মুনিঋষি নই। আমি দেখলুম আমি দু'দিক রাখতে পারব না। সেইজন্যে এই সিদ্ধান্ত নিলুম। তাছাড়া তোকে তো আমি আগেই জানিয়েছি যে, একটা ডবলিউ আমি ছেড়েছি। এটা হলো আরেকটা ডবলিউ।' যুবরাজ পুরোনো কথা মনে করিয়ে দেয়।

হ্যাঁ, মনে পড়ে তার সেই তিন ডবলিউ—ওয়াইন, উওম্যান, ওয়েল্থ।

'এর পরে কি আরো এক ডবলিউ ত্যাগ করবি? না, না, ওসব করতে যাসনে। চিরকাল সম্পদের কোলে মানুষ।' আমি শশব্যস্ত হয়ে বলি।

'আপাতত ওকথা ভাবছিনে, ভাই। তবে ধীরে ধীরে আপনাকে গুটিয়ে নিচ্ছি। কার জন্যে এমন ভূতের মতো খাটা! আমার যুবরাজ তো চলে গেল!' ও হাহুতাশ করে।

তবে ওর দৃষ্টি একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে। ও বুঝতে পারছে যীশু কেন বলেছিলেন, আমার রাজ্য এ জগতের নয়।

'তেমনি আমার যৌবরাজ্য এ জগতের নয়। অন্য কোনো জগতের। সেই যে জগৎ তার সন্ধান কে আমাকে দেবে! গুরু ছাড়া আর কে দিতে পারে।' ও জানতে চায়। আমি তো গুরুবাদে বিশ্বাস করিনে। তাই ওকে উৎসাহ দিইনে। বাধাও দিইনে। ও যদি ওতেই শান্তি পায় আমি বাধা দেবার কে?

॥ দুই ॥

এরপরে বারো তেরো বছর কেটে যায়। কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ থাকে না। মাঝে মাঝে ওর কথা মনে পড়ে। কিন্তু চিঠি লিখতে সময় পাইনে। অকালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতনে বসে সরস্বতীর ধ্যান করি।

হঠাৎ একদিন মস্ত এক গাড়ি এসে গেটের সামনে দাঁড়ায়। বাইরে এসে দেখি—যুবরাজ। সপত্নীক। সকন্যক।

'রঞ্জনাকে তোদের বিদ্যাভবনে ভর্তি করে দিতে এসেছি। শ্রীসদনে থাকবে। যদি আপত্তি না থাকে তোর স্ত্রী হবেন ওর লোকাল গার্জেন।' এই বলে যুবরাজ তাঁর কাছে আবেদন জানায়। তিনি রাজী হয়ে যান সানন্দে।

'কিন্তু উঠেছিস তোরা কোথায়? গেস্ট হাউসে? কেন, আমাদের এখানে কেন নয়? একটা টেলিগ্রাম করে দিলেই চলত। আমরা নিরাশ হলুম।' আমি দুঃখিত হয়ে বলি।

'তোর ঠিকানা জানা ছিল না যে।' এই হলো ওর কৈফিয়ত। 'এখানে এসেই শুনি যে তুই থাকিস রতনপল্লীতে।'

এরপরে ওর কন্যার জন্যে যথা কর্তব্য করা গেল। ওরা সেইদিনই ফিরে যাবে, নইলে গেস্ট হাউস থেকে আমাদের ওখানে স্থানান্তরিত হতো। যাই হোক, আহারাদি করা গেল একসঙ্গে। আহারের পর বিশ্রাম। আমরা দু'জনে এক ঘরে, মহিলারা অন্য ঘরে। বেশীক্ষণের জন্যে নয়।

'তারপর, যুবরাজ! তোর ব্যক্তিগত জীবনের কী সমাচার?' নাটকীয়ভাবে শুধাই। 'তোর ধর্মজীবন নির্বিঘ্ন তো? না তপস্বীদের মতো প্রলোভনে ভরা!'

'মাধুরী এতদিনে মানিয়ে নিয়েছে। লক্ষ করলে দেখবি ওর মুখে চোখে একপ্রকার আভা। দেবী! দেবী! মানবী বা অপ্সরা নয়। ইচ্ছে হয় প্রণাম করতে। কিন্তু সম্পর্কে বাধে।' যুবরাজ ওর সহধর্মিণীর প্রশংসায় শতমুখ হয়।

আমি এটাও লক্ষ করি যে আভা কেবল একজনের মুখে চোখে নয়, আরেক জনেরও। সত্যি, অবাক হই। মহত্তর উপলব্ধি না হলে শুধুমাত্র তপশ্চর্যায় ওরকম আভা ফোটে না।

'হ্যাঁ, তোকে একটা খবর দিই। আমি আরো একটা ডবলিউ বর্জন করেছি। ওয়াইন উওম্যানের পর ওয়েল্‌থ।' যুবরাজ বলে।

'ঐশ্বর্যও বিসর্জন দিলি! তাহলে তোর এখন চলছে কী করে?' আমি চমৎকৃত হই।

'বিনোবাজীর কথামতো মালিকানা ছেড়েছি। কারবার এখন আমার ভাইদের। আমার নয়। আমি এখন বিভিন্ন কোম্পানীর কনসাল্টিং এন্‌জিনীয়ার। ওরা যথারীতি ফী দেয়। তাতেই আমার চলে যায়। মেয়ের বিয়ের পরে সেটাও ছাড়ব কিনা ভাবছি। ইচ্ছে আছে হিমালয়ে গিয়ে কোনো এক আশ্রমে শেষ জীবনটা কাটাতে। ওরা আজকাল বেশ মডার্ন হয়েছে। গুহাতে যাঁরা থাকেন তাঁরাও ইলেকট্রিসিটি পান। খবর নিচ্ছি সহধর্মিণীকেও থাকতে দেওয়া হয় কিনা। আমি তো কামিনী ত্যাগ করিনি, কামিনীও আমাকে ত্যাগ করেনি। ত্যাগ যা করেছি তার নাম কামনা।' যুবরাজ খাটো গলায় বলে যাতে ওঘর থেকে কেউ শুনতে না পান।

ও শুনিয়ে যায় ওর জীবনদর্শন। আমি শুনে যাই।

'দেখ, নন্দন, আমি তোর মতো বিদ্বান নই। বুঝিয়ে বলতে পারব না। বুঝিই বা কতটুকু! যেটা অনুভব করেছি সেইটেই

গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করছি। যীশু বলে গেছেন ভগবানের রাজ্য খুঁজতে। কিন্তু মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ যে জন, সে জন ভগবানের রাজ্য খুঁজে পাবে কী করে! তাহলে প্রথমেই তাকে মায়ার বন্ধন কাটাতে হবে। মায়ার রাজ্যের সীমান্ত পার হতে হবে। সীমান্ত কি একটা? একটার পর একটা। যেমন বৃত্তের পর বৃত্ত। বহু কষ্টে তিন তিনটে সীমান্ত অতিক্রম করেছি। এর পরেও দেখছি আরো আছে। কিন্তু এখনো তেমন স্পষ্ট হয়নি, ভাই। তাই তোকে আজ বলব না। পরে আবার যখন দেখা হবে তখন বলব।' প্রতিশ্রুতি দেয় যুবরাজ।

কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে না। একদিন ধাঁ করে এসে ধাঁ করে চলে যায়। বলে, 'মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছি। ওর বিয়ে। আজ বসতে পারব না। মাফ করিস।'

ওর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়েছিলুম। যাইনি। হাজারিবাগ তো কাছে নয়। শুভেচ্ছা জানিয়েছিলুম।

আশা করেছিলুম আবার ওর সঙ্গে দেখা হবে। বাকীটা শুনতে পাব। কিন্তু হয়ে উঠল কই! একদিন শ্রাদ্ধের চিঠি এল। যুবরাজ আমাদের মায়া কাটিয়ে লোকান্তরে গেছে।

হায় হায় করে ওঠে মনটা। তবু জানি ও যেখানেই যাক না কেন সেখানেও তার আপন যৌবরাজ্য। যৌবরাজ্যের কি ইতি আছে! পরম পিতার রাজ্যের মতো এপারে ওপারে দু'পারেই তার বিস্তার।

মনে পড়ছে না সেবার কার কী হয়েছিল, শুধু মনে আছে ডাক্তার এলেন বেশ একটু রাত করে। এসেই মাফ চাইলেন।

বললেন, "হোপলেস কেস, সার। তবু শেষ না দেখে উঠে আসতে পারিনে। বিবেকে বাধে। পাছে পেসেণ্টের মনে কষ্ট হয়। যে লোকটি চলে যাচ্ছে তাকে একটু সঙ্গ দেওয়াও তো আমার কর্তব্য। যতক্ষণ তার জ্ঞান থাকে।"

আমার বাড়ির কাজ সেরে অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও তিনি বিদায় নিতে পারতেন, কিন্তু নিলেন না। বাইরের বারান্দায় আমার পাশে চেয়ার পেতে বসে সিগারেট ধরালেন। বললেন, "কথাটা ঠিক বোঝাতে পারলুম না, সোম সাহেব। ডাক্তারের সঙ্গে পেসেণ্টের যে সম্পর্ক সেটা মৃত্যুর বেলা ঠিক খাটে না। মনে হয় একটি মানুষের সঙ্গে আর একটি মানুষের যে সম্পর্ক সেটা তার চেয়ে গভীর। প্রত্যেকেই আমরা প্রত্যেকের অঙ্গ। সেইজন্যে আমি শেষ মুহূর্তটি অবধি থাকি। তা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। অপরকে বলিনে, আপনাকে বলছি। আপনি ম্যাজিস্ট্রেট বলে নয়, দার্শনিক বলে।"

তাঁকে সেদিন বেশ বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। অন্যান্য দিনের মতো প্রফুল্ল নয়। বললুম, "দার্শনিক না আর-কিছু।"

"দার্শনিকদের মতো আমারও একপ্রকার শেষ জিজ্ঞাসা আছে। আমি জানতে চাই জীবনের প্রান্তবিন্দুতে এসে কে কী বলে যায়। অন্তিম উক্তিটা শুনতে চাই। মহাপুরুষদের অন্তিম উক্তি লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। কিন্তু যারা অতি সাধারণ মানুষ তারা যা বলে যায়, তাও কি কম অপূর্ব! মৃত্যু সব সময়ই রহস্যময়, কিন্তু তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে মানুষ যে বার্তা রেখে যায় তার

থেকে যথেষ্ট আলোক পাওয়া যায়। শুনবেন কয়েকটি বার্তা?” ডাক্তার আমার দিকে উৎসাহভরে তাকান।

আমিও উৎসুক বোধ করি। ‘শুনব বইকি। যদি শোনাতে চান।’

সেদিন তিনি আমাকে কাহিনীর পর কাহিনী শুনিয়ে যান। আমিও তাঁর জন্যে কফির অর্ডার দিই। এ সব কথা তিনি বিশেষ কাউকে বলেন না। সমস্ত আমার মনে নেই। থাকবে কী করে! কবেকার কথা! কেটে গেছে আন্দাজ ত্রিশ বছর।

“শুনবেন, আজকের পেসেণ্টটি কী বলে গেল? এটা ওটা পাঁচ রকম কথা বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় বলল, আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, এবার তবে আসি। নমস্কার। একটু বাদে সব শেষ। পরক্ষণটাই যেন পরকাল। দুটি ক্ষণের মধ্যে একটুও ফাঁক যেন নেই। জীবন আর মরণ আর মরণোত্তর কাল যেন একটাই কনটিনুয়াস প্রোসেস। এই যেমন আপনার এখান থেকে একটু বাদে আমি উঠব, গাড়িতে বসব, বাড়ি যাব।” ডাক্তার বলতে থাকেন, “বাড়ি যাওয়ার কথায় মনে পড়ে আর একজনের অন্তিম উক্তি তিনি বলেন, আমি হোমসিক। বাড়ির জন্যে আমার মন কেমন করছে। আর এখানে খেলা করতে ভালো লাগছে না, ডাক্তার। ওই যে, আমার মা আমাকে ডাকছেন। শুনতে পাচ্ছ না? খোকা, আয়, ঘরে আয়। যাই মা। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।”

তিনিও অভিভূত। আমিও অভিভূত বলি, “সত্যি ভাববার মতো কথা।”

তিনি উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় আমার মাথায় একটা চিন্তা খেলে যায়। আমি তাঁকে আরও কিছুক্ষণ বসতে অনুরোধ জানাই। “আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে, ডাক্তার মিত্র। এক বছর ধরে চিন্তা করছি। এতদিন বাদে পেয়েছি উপযুক্ত জন আর উপযুক্ত ক্ষণ। আচ্ছা, একজনের অন্তিম উক্তি আপনার স্মরণ আছে! বলতে পারেন, যাবার সময় মিসেস সরখেল কি কিছু বলে যান? শুনেছি, আপনি সে সময় তাঁকে দেখতে এসেছিলেন।”

"কে! মিসেস সরখেল!" ডাক্তার এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। চমকে ওঠেন। "হ্যাঁ, আমি তাঁকে দেখতে এসেছিলুম। তখনো তিনি জীবিত। মনে হলো জ্ঞান আছে। সমবেদনা প্রকাশ করে বলি, আহা, এমন কাজ কে করল, ম্যাডাম! প্রত্যাশা করি একটি কি দুটি শব্দের উত্তর। আমি। কিংবা স্বামী।"

"কোনটি শুনলেন?" আমি অধীরভাবে শুধাই।

"কোনোটিই না। ভদ্রমহিলা নিরুত্তর। হয়তো অসমর্থ নয়তো অনিচ্ছুক। কিন্তু শান্ত, সমাহিত। কষ্ট হচ্ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ব্যক্ত হচ্ছিল না ওঁর কথায় বা কাজে। আমি আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিনি। পরে সিভিল সার্জন এলেন। এলেন ডক্তার চক্রবর্তী। ততক্ষণে শেষ দশা। আমরা তিনজনে পরীক্ষা করে দেখি ওই একটাই জখম। রিভলভার ওই ঘরেই পড়েছিল। গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্তস্রাব ও মৃত্যু।" ডাক্তার কাতর স্বরে বললেন।

"ওকথা আপনাদের সার্টিফিকেটেই আছে। কিন্তু যেটা নেই, সেইটেই আমার জিজ্ঞাস্য। গুলিটা কার গুলি? রিভলভারটা যাঁর?" আমি সুকৌশলে বলি।

"গুলিটা বুকের তলার দিক থেকে উপরের দিকে তির্যকভাবে বিঁধেছিল। তার থেকে মনে হতে পারত জখমটা স্বকৃত। রিভলভারটা কার সেটা তো পরীক্ষা করে দেখিনি। আলামতে হাত দেওয়া বারণ। ওটা পুলিশের কাজ।" তিনি সুকৌশলে এড়ান।

জখমটা অন্যকৃত হওয়া কি অসম্ভব মনে হতে পারত?" আমি জেরা করি।

"কেসটা কি রিওপেন করতে যাচ্ছেন, স্যার! কিন্তু করে কোনও ফল হবে কি? অন্যকৃত হওয়া অসম্ভব না হলেও জখমের অবস্থান থেকে সে রকম অনুমান করা শক্ত। আপনি যদি চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে থাকেন, এগিয়ে যান। আমি কিন্তু আমার সার্টিফিকেটের বাইরে একটি কথাও বলব না। স্বকৃত না অন্যকৃত এটা আমার অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এটা আসলে ডাক্তারের বিজনেস নয়।" তিনি

বিরক্ত হয়ে বলেন। "তবে কেউ যদি মৃত্যুকালীন উক্তি করে সেটা আমার ধর্তব্য।"

আমি মাফ চেয়ে বলি, "ডাক্তার মিত্র, আপনি কেবল ডাক্তার নন, আপনি মিত্র। সেই সুবাদে আপনাকে ও রকম প্রশ্ন করেছি। না, এ কেস রিওপেন করা হবে না। আমার এখানে বদলী হয়ে আসার আগেই সরখেল সাহেব ছুটি নিয়ে চলে গেছেন, পুলিশ সাহেব যবনিকা টেনে দিয়েছেন। কমিশনার সাহেবও অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিয়েছেন যে ওটা আত্মহত্যার থিওরির সঙ্গে মেলে। আমি অবশ্য দু' রকম থিওরিই শুনেছি। সেইজন্যে অশান্ত বোধ করেছি। সত্যটা কী সেটা কেমন করে জানব? কে জানাবে? অথচ জানা আমার চাই। ঘটনাটা যে এই বাড়িতেই ঘটে। যে বাড়িতে আমি আছি। ওই ঘরটা আমরা বন্ধ রেখে দিয়েছি। কিন্তু সব ক'টা ঘর তো বন্ধ রাখা চলে না। একটা ঘর ছিল ভদ্রমহিলার ছবি আঁকার স্টুডিও। নিজেই খরচপত্তর করে জানালায় শার্সি লাগিয়েছিলেন। সেটা হয়েছে আমার স্টাডি। সেখানে পড়তে বসে রোজ মনে পড়ে সেই অপরিচিতা পরলোক-বাসিনীকে। যাঁর বয়স বোধ হয় আমারই বয়স বা তার কাছাকাছি কারণ তাঁর স্বামী আমার বছর চারেকের সিনিয়র। না, আলাপ ছিল না, তবে আলাপ করার ইচ্ছা ছিল। রূপগুণের খ্যাতি শুনে-ছিলুম। ভেবেছিলুম একদিন রবিবার দেখে আমার পুরোনো স্টেশন থেকে মোটরে করে আসব সস্ত্রীক। সেটার আগেই কাগজে দেখি এখানে ঘটে গেছে এক ট্র্যাজেডি। তখন তো ভাবতেই পারিনি যে, আমাকেই মাস দুই বাদে এই জেলায় ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে সরখেলের জায়গায়। কেমন যোগাযোগ দেখছেন? এই ঘটনাপরম্পরা কি নিছক আকস্মিক না এর আর কোনো গূঢ় তাৎপর্য আছে? আমি এর মর্ম ভেদ করতে চাই বলেই জিজ্ঞাসু।"

ডাক্তার মিত্র কী ভেবে বলেন, "তা সরখেলসাহেব তো একদফা

স্বস্ত্যয়ন করিয়েই গেছেন। আপনিও করাতে পারেন আরেক দফা। যদি সোয়াস্তি চান।”

স্বস্ত্যয়নে আমার বিশ্বাস ছিল না। অশরীরী কোনো অস্তিত্ব অনুভবও করিনি। বলি, “আপনি যা ভেবেছেন তা নয়, ডাক্তার মিত্র। সেরকম স্বস্ত্যয়ন আমি চাইনে। সত্যটা কী সেটা নিশ্চিতভাবে জানাও তো একপ্রকার স্বস্ত্যয়ন। কিন্তু কিছুতেই জানতে পারছিনে কী ভাবে ঘটনাটা ঘটে, কার হাত দিয়ে ঘটে, কেন ঘটে।”

ডাক্তার বিষণ্ণভাবে বলেন, “হোপলেস কেস, সার। আপনি এর কূলকিনারা করতে পারবেন না। ঘটনার পেছনেও ঘটনা থাকে।” পিছনের ঘটনাগুলো কবে কোথায় ঘটেছিল কে বলতে পারে! তা হলে কেন'র উত্তর পাবেন কী করে? বাকি থাকে কীভাবে ও কার হাত দিয়ে? কী ভাবে'র উত্তর আমি দিয়েছি। কার হাত দিয়ে'র উত্তরটা যে দুজন দিতে পারতেন তাঁদের একজন লোকান্তরে, অপর জন স্থানান্তরে। একজন নিরুত্তর, অপরজন সেদিন আমাদের যা বলেছিলেন তার সার কথা তিনি নির্দোষ। তিনিও বাড়ির চাকরবাকরদের মতো বাইরে থেকে গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন ও দেখেন, তাঁর স্ত্রী মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে আছেন।”

॥ দুই ॥

ঘটনাটা ঘটে সন্ধ্যাবেলা। সেদিন ওদের ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল বাইরে। তাই দু'জনে তার জন্যে তৈরি হতে চললেন যার যার ড্রেসিং রুমে। ঘর দুটো পাশাপাশি নয়, মাঝখানে ডাইনিং হল।

ড্রাইভার গাড়ি বারান্দায় গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। চাপরাশিরাও ছিল সেইখানে বা তার কাছাকাছি জায়গায়। কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ক আপিস কামরায় বসে টাইপ করছিলেন। সাহেব খানা খেতে গেলে তিনিও ছুটি পাবেন। সাহেবের একমাত্র সন্তান

একটি দশ বছরের কন্যা। সে ছিল পড়ার ঘরে। সঙ্গে ছিলেন তার গভর্নেস।

হঠাৎ ও রকম একটা দুর্ঘটনা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। তার অব্যবহিত কোনো কারণও ছিল না। দাম্পত্য কলহ কেউ লক্ষ করেনি। মনোমালিন্য যদি হয়ে থাকে তো সেটা প্রকাশ্যে নয়। সকলের ধারণা ওঁরা একটি সুখী দম্পতি। আমরাও দূর থেকে তাই শুনেছিলুম।

আমার এই স্টেশনে বদলী হয়ে আসার পর আমার সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসতেন তাঁদের মধ্যে দু'একজন পুরোনো আলাপীও ছিলেন। আগেও একবার আমি এখানে নিযুক্ত হয়েছিলুম, নিম্নতর পদে। দেখা করতে এসে তাঁরা আমাকে শহরের লোকের মতামত জানাতেন। শহর নাকি ব্রাউনিংএর রোমের মতো দুই ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক শহর বলে, আত্মহত্যা। বাকি অর্ধেক বলে, তা নয়। তবে এঁরা কেউ নালিশ করতে বা সাক্ষী দিতে এগিয়ে আসেন না। বেনামী চিঠি লিখতেও এঁদের সাহস হয় না। আমি কী করতে পারি!

আমার আলাপীরা যদিও দ্বিমত, তবু একটা জায়গায় তাদের মিল ছিল। তাঁরা একজনের উল্লেখ বার বার করেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট চৌধুরী সাহেব। ওঁকে নাকি প্রায়ই দেখা যেত সরখেলদের লনে টেনিস খেলতে, মিসেস সরখেল যেসব চ্যারিটি শো করতেন তাতে সাহায্য করতে। তাসের পার্টনার হতেও নাকি তাঁকে ডাক পড়ত। বড়সাহেব ছোট সাহেবকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। আর মেমসাহেব তো ছিলেন তাঁর বৌদির মতন। বলা বাহুল্য চৌধুরী অল্পদিন আগে বিলেত থেকে ফিরেছেন, এখন কাজ শেখা আর বিভাগীয় পরীক্ষা পাস করা নিয়ে ব্যাপৃত। বিয়ে হয়নি, তার দেরি আছে। তাঁর বাংলোয় তিনি একাই থাকতেন। চাকরবাকর সমেত।

আমার আলাপীদের ধারণা চৌধুরীই এর মূলে। ঘটনার পরে

বড়সাহেব নাকি স্বয়ং ছোটসাহেবের বাড়ি গিয়ে বলেন. "তোমার কাছে ওঁর চিঠিপত্র আছে শুনেছি। থাকে তো আমাকে দাও।" চৌধুরী বিনা বাক্যে একরাশ চিঠি বার করে তাঁর হাতে দেন। চিঠিতে কী ছিল কেউ জানে না। হয়তো বা আত্মহত্যার পূর্বাভাস ও কারণ।

এমন কথাও শোনা গেল যে, ঘটনার কিছুদিন আগে থেকে এ বাড়িতে চৌধুরীকে আর দেখা যেত না। তিনি টেনিস খেলতে যেতেন কলেজের সাহেবদের সঙ্গে। সম্ভবত সরখেল কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিংবা এমনও হতে পারে যে দুর্মুখরা তাঁর কান ভারী করেছিল। মাতৃমঙ্গলের জন্যে মিসেস সরখেল আয়োজিত "মুক্তধারা'র অভিজিত সাজবার জন্যে কি আর পাত্র পাওয়া গেল না? কৃষ্ণ চৌধুরী না হয় বিলেতে একবার ওই ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বলে শোনা যায়, কিন্তু দেশে কি ওঁর চেয়ে উপযুক্ত অভিনেতার অভাব? কলকাতা থেকে আনিয়ে নিলেই হতো। কতই বা খরচ পড়ত! তেমনি টিকিট বিক্রি হতো কত বেশী!

ওই দুর্ঘটনার পর থেকে চৌধুরী ওর ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা আসন্ন বলে কোথাও বেরন না। শুধু অফিসে একবার হাজিরা দিয়ে যান। আমার সঙ্গে দেখা হলে পাশ কাটান। তবে বাড়িতে একবার কল করতে এসেছিলেন। সে সময় আমি লক্ষ করি যে যুবকটি সত্যি অসামান্য। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমাকেও ভাবিয়ে তোলেন। ফৌজদারি আইন, রাজস্ব আইনের কূট প্রশ্ন। আমি ওঁকে অভয় দিয়ে বলি যে প্রশ্নগুলো অত কঠিন হবে না। আরো সোজা প্রশ্ন আসবে। এটা তো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নয়।

রং যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যাম। তা নইলে চৌধুরীর চেহারা ও গঠন অনিন্দনীয়। তাঁর কথাবার্তা চালচলন পোশাকপরিচ্ছদ মার্জিত রুচির পরিচায়ক। ওঁর ভিতরে একটা গভীর আত্মবিশ্বাস ছিল, লোকে সেটাকে অহঙ্কার বলে ভ্রম করতে পারে। চাকরি ছাড়া আরো অনেক বিষয় আছে, যাতে ওঁর প্রচুর আগ্রহ। খেলাধুলা,

অভিনয়, ছবির সমঝদারিও তার মধ্যে পড়ে। সুজাতা সরখেলের ছবির সমঝদার এই মফস্বল শহরে ওঁর মতো আর কেউ নয়। চারু সরখেল তো চিনির বলদ। স্ত্রীর রূপ দেখেই তিনি বিয়ে করেন, কলাবিদ্যার কদর বোঝেন না।

সুজাতা কলকাতার ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মেয়ে, চারু সে সমাজের নন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র, কঠোর পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। কবিতা লেখা, ছবি আঁকা প্রভৃতি তাঁর চোখে একপ্রকার বিলাসিতা। দেশের বা দশের কী লাভ হচ্ছে তাতে। তবে মাতৃমঙ্গল জিনিসটা ভালো। এতে তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে। লোকে তো এমনিতেই চাঁদা দেবে না, নাটক অভিনয় করে যদি টাকা ওঠে সেটাও এমন কিছু মন্দ নয়। টিকিট বিক্রির জন্যে তিনিও তাঁর মোসাহেবদের লাগিয়ে দেন। 'মুক্তধারা' সেদিক থেকে বেশ সফল হয় বলতে হবে। মাতৃমঙ্গল দাঁড়িয়ে যায়।

তবে অভিনয়ে বিস্তর খুঁত ছিল। স্থানীয় অ্যামেচারদের না নিলে তারা বয়কট করত। সরখেল এই নিয়ে আনপপুলার হতে নারাজ। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন দমন করতে গিয়ে যথেষ্ট অপ্রিয় হয়েছিলেন। এ জেলায় নয়, অন্যত্র। তবু সেই অখ্যাতি তাঁর পিছু নিয়েছিল। যেখানেই বদলী হতেন, সেখানেই লোকে বলাবলি করত, "এই সেই মেদিনীপুরের হাকিম না?" তিনি তাঁর স্ত্রীকে পরামর্শ দেন স্থানীয় অভিনয় যশঃপ্রার্থীদের একটা সুযোগ দিতে। আমি হলে তার সঙ্গে আরো একটা পরামর্শ জুড়ে দিতুম। 'মুক্তধারা' অভিনয় করা চারটিখানি কথা নয়। ওর চেয়ে সোজা বই অভিনয় করলে সাফল্যের সম্ভাবনা অধিকতর। মফস্বলের এরা গিরিশ ঘোষ, ডি এল রায়, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের নাটকেই অভ্যস্ত। ইদানীং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়ে মেতেছে। নেহাত যদি রবীন্দ্রনাথের বই মঞ্চস্থ করতে হয় তো 'বিসর্জন' কী দোষ করল!

'মুক্তধারা' যে বাছাই করা হয় সেটা চৌধুরীর মুখ চেয়ে।

শ্রীমান আর কোনো ভূমিকায় নামবেন না, কারণ রিহার্সালের জন্যে অত সময় নেই। অভিজিতটা ওঁর মুখস্থ। মিসেস সরখেল স্থানীয় অ্যামেচারদের ডেকে পাঠান। তারা তো তাঁর আহ্বান পেয়েই কৃতার্থ। নাটক নির্বাচনের ভার তাঁর উপরেই ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো নাটক তেমন উচ্চাঙ্গের নয়। উচ্চতম আদর্শের দিক থেকে আবার 'রক্তকরবী' বা 'মুক্তধারার' জুড়ি নেই। দুটির মধ্যে 'মুক্তধারা'ই তাঁর বেশী পছন্দ, কারণ ওতে মেয়েদের ভূমিকা কম। মফস্বলে নন্দিনীর পার্ট নেবে কে? ছেলেদের দিয়ে মেয়েদের পার্ট মানায় না। তা ছাড়া অভিজিত সাজবার জন্যে তৈরি লোক পাওয়া যাচ্ছে যখন তখন রঞ্জন সাজবার জন্যে পাত্র খুঁজতে হবে কেন?

নেপথ্যে যে আর একটি নাটক অভিনীত হচ্ছিল, যার পাত্রপাত্রী সুজাতা ও চারু ও কৃষ্ণ বাইরের দর্শকরা কেউ তার দিকে তাকায়নি। খেয়াল হয় যখন সেটি বিয়োগান্ত হয়। ও রকম একটা পরিণতি কেউ কল্পনা করেনি। বিশেষত ম্যাজিস্ট্রেট পত্নীর বিয়োগ। মাতৃমঙ্গলের মতো একটি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানের যিনি জননী ও ধাত্রী, যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে সেটি সম্ভব হয়েছে ও বহুজনের হিতসাধন করেছে, তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ যদি স্বাভাবিকও হতো তবু সারা শহরের উপর শোকের ছায়া নেমে আসত। এ যে মর্মান্তিকভাবে অস্বাভাবিক।

চৌধুরীর মুখভাব অধ্যয়ন করি। মার্লোর নাটকের একটি পঙ্‌ক্তি আমার মনে আসে, সেটা হেলেনের উদ্দেশে বলা।

"Is this the face that launche a thousand ships···!"

এই কি সেই মুখ? এই কি সেই মুখ যার জন্যে এত বড়ো একটা ট্র্যাজেডী ঘটে গেল? ওঁর অন্তরে হয়তো নিবিড় বেদনা ছিল, কিন্তু নিপুণ অভিনেতার মতো সে বেদনা উনি মুখোশ দিয়ে ঢেকেছিলেন। কোথাও কোনো শোকের আমেজ না পেয়ে আমি

তো অবাক। ব্যাপারটা কি তবে নিছক স্বামীস্ত্রীর ব্যাপার? কিংবা স্ত্রীর একার? তৃতীয় ব্যক্তি কি এর মধ্যে জড়িত নন? তবে চিঠির তাড়া পাওয়া গেল কী করে ওঁর বাংলোয়। চিঠিগুলো কি নিতান্ত একতরফা?

ওঁদের দু'জনের প্রণয়সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সম্ভবত একরকম সাহচর্য। ইউরোপে অমন কত হয়। চৌধুরী বহুদিন ইউরোপে থেকে সম্প্রতি ফিরেছেন। হয়তো জানেন না এদেশের জনমত কী ভাবে নেয়। তা বলে ওঁর সারা জীবন মেঘাচ্ছন্ন হবে? এ ঘটনা চিরকাল ওর পশ্চাদ্ধাবন করবে? এমন কী পাপ করেছেন বেচারা! ভালোবাসা কি পাপ? ভালোবাসা পাওয়া কি পাপ?

আমি প্রথমটা ওঁর উপর বিরূপ ছিলুম। যেন ও ছেলেটিই সেই ট্র্যাজেডীর জন্যে দায়ী। ক্রমে ক্রমে বিরূপভাবটা কেটে যায়। কিন্তু সরখেলের উপর সন্দেহ অত সহজে মেটে না। রিভলভারটা যদি তিনি স্বয়ং ব্যবহার না করে থাকেন, তা হলেও জবাবদিহির দায় খণ্ডাবেন কী করে? কেন তালাবন্ধ করে রাখলেন না? কেন স্ত্রীর হাতে পড়তে দিলেন? সন্ধ্যার অনেক আগেই পড়েছিল নিশ্চয়। সম্ভবত কয়েকদিন থেকেই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। ইতিমধ্যে সরখেল কি চোখের মাথা খেয়েছিলেন? দেখতে পাননি যে রিভলভারটা অদৃশ্য? সময়মতো আবিষ্কার ও উদ্ধার করলে কি অমনটি ঘটত?

ভদ্রলোকের পক্ষেও কতক লোক ছিলেন। তাঁরা বলেন, দশ বছরের মেয়েটার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যেই তাঁকে রাতারাতি আবার বিবাহ করতে হলো। প্রতিপক্ষের মতে তা নয়, বিয়ে যাকে করলেন তার উপর আগে থেকেই নজর ছিল। স্ত্রীও নাকি সেটা জানতেন। পথের কাঁটা সরে যাওয়াটা সন্দেহজনক নয় কি?

॥ তিন ॥

বুঝতে পারিনে আমার নিয়তি কেন আমাকে এঁদের নিয়তির সঙ্গে জড়ায়। কেনই বা আমি এই বিষয়ে এত ভাবি? ভেবে কূলকিনারা পাইনে। অস্বস্তি বোধ করি।

সুজাতা হয়তো সত্যি সত্যি সুখী ছিলেন না। স্বচ্ছন্দে ছিলেন। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ, মোটরে করে ঘুরে বেড়ান, মেয়ের জন্য গভর্নেস রাখেন। এই তো সুখ। আর কী চাই! কে জানে হয়তো ওটা ছিল সোনার খাঁচায় পোষা পাখির সুখ। ছবি এঁকে আপনাকে ভুলিয়ে রাখতেন। মাতৃমঙ্গল নিয়ে ব্যস্ত থাকাও তাই। কারো কারো পক্ষে এগুলিও এক একটি নেশা।

কিংবা এই হয়তো সত্যিকার কাজ। সুখ যা কিছু এর মধ্যেই নিহিত ছিল। উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাড়ম্বর জীবনযাত্রায় নয়। উচ্চপদস্থের আবার উচ্চতরপদস্থদের পদধারণও করতে হয়। তাঁদের স্ত্রীরা যদি তেজস্বিনী হয়ে থাকেন, তবে সহ্য করবেন কেন? সাংসারিক উন্নতির জন্যে তাঁরাও কি তাঁদের আত্মাকে বিকিয়ে দিয়েছেন?

আমি যেন কান পেতে শুনতে পাই একজন বলছেন আরেক-জনকে, "তোমার এই কর্মজীবনটা মিথ্যা জীবন। এত হাঁকডাক, এত প্রতাপ। সব মিথ্যা। সব মায়া। তৃপ্তি এর মধ্যে এক আনাও নেই। ষোল আনাই অতৃপ্তি। খাওয়াপরার অভাব নেই বটে, কিন্তু মানুষ কি কেবল অন্ন দিয়েই বাঁচে? অমৃত কোথায়!"

"তোমার সন্তোষের জন্যে আমি কী না করেছি, বল? কষ্ট করে পড়াশুনা করেছি, পরীক্ষা পাস করেছি, চাকরি পেয়ে চাকরিতে উন্নতি করেছি, একদিন দেখবে কমিশনার হব। আর কী করতে পারি বল? কলকাতার পোস্টিং তো আমার হাতে নয়। চেষ্টা করে দেখতে পারি। তাতে যদি তুমি সুখী হও।" উত্তরে বলছেন আরেকজন।

"দূর! কলকাতা পোস্টিং কে চায়? সেখানেও সেই মিথ্যা জীবন। দিনমান মিথ্যা কাজ। মাঝরাত অবধি মিথ্যা পার্টি। মিথ্যা ফ্যাশনের পেছনে মিথ্যে ছোটা। তবু তো এখানে প্রকৃতির পরশ পাই। আর পাই জনজীবনের। তোমার সঙ্গে টুরে যাই যখন, তখন আমি বাঁচি। সেও যে আজকাল আর ভালো লাগে না। তুমি যত উঁচুতে উঠছ তত বিচ্ছিন্ন হচ্ছ সাধারণের কাছ থেকে। এর চেয়ে মহকুমায় ছিলুম ভালো। তোমাকে ফের মহকুমা হাকিম করে না?" প্রথম জনের উক্তি।

"পাগল নাকি! একবার প্রমোশন পাবার পর আবার ডিমোশন! ছুটি নিয়ে পালিয়ে যাব না? ছুটি না পেলে পদত্যাগ করব না? আর মহকুমার জীবনটাও কি মিথ্যা জীবন ছিল না? অত খুঁত খুঁত করলে কি বেঁচে থাকা চলে? বাঁচতে চাইলে অনেক কিছু পরিপাক করতে হয়। অনেক কিছু দেখেও না দেখতে হয়, শুনেও না শুনতে হয়। শুধু কি ঘরের বাইরে?" দ্বিতীয় জন ইঙ্গিতে বোঝাতে চান ঘরের ভিতরেও।

"কী বললে! কিসের ইঙ্গিত করলে তুমি!" প্রথম জন চেপে ধরেন।

"সবাই যা বলে। যার ইঙ্গিত করে।" দ্বিতীয় জন গম্ভীরভাবে বলেন।

কেন'র উত্তর অন্বেষণ করতে গিয়ে আমি কার হাত দিয়ে'র একটা মনগড়া সমাধানে উপনীত হই। এর পিছনে ছিল আমার নিজস্ব এক আবিষ্কার। মাতৃমঙ্গল পরিদর্শন করে পরিদর্শন পুস্তকে মন্তব্য লিখতে গিয়ে একদিন নজরে পড়ে যায় মিসেস সরখেলের মন্তব্য। মনে হলো হাতের লেখাটা একটু যেন নার্ভাস। আর বলবার কথাটা কেমন যেন সকরুণ, স্পর্শকাতর, আবেগভরা, আরনেস্ট।

শুনলুম মাতৃমঙ্গল চালানো সুমসৃণ ছিল না। মহিলা সমিতিতে তাঁর একটি প্রতিপক্ষও ছিল। তারা কাজ করতে নয়, কাজ পণ্ড করতে ওস্তাদ। তা ছাড়া যেমন হয়েই থাকে, যে ভদ্রলোকের

উপর বিশ্বাস করে টাকাপয়সার ভার অর্পণ করা হয়েছিল তিনি শত তাগাদা সত্ত্বেও হিসেব দিচ্ছিলেন না। আদায় হয়েছিল যত বরবাদ তার চেয়ে কম নয়। তাই চাঁদেরও কলঙ্ক ছিল। স্বামী তার ভাগী হতে নারাজ। বলেন, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। আমার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করলে কি ও রকম হতো! সব শালাকেই আমি চিনি। যে যত বড়ো ভালোমানুষ সে তত বড়ো শয়তান।

এর পরে আমি একটু একটু করে মেনে নিই যে ঘটনাটা নিজের হাত দিয়েই ঘটে। যাতে শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারি। আমার সোয়াস্তির জন্যে ওটা একপ্রকার স্বস্ত্যয়ন।

আমার স্ত্রী কিন্তু এর শরিক ছিলেন না। ওখানকার আর দশজন মহিলার মতো তাঁরও মত ছিল সরখেলবিরোধী। বছর তিনেক বাদে যখন ওখান থেকে বদলী হই, তখন ওই নিয়ে আবার কথা উঠলে তিনি বলেন, "এ বাড়িতে একজনের মৃত্যু ঘটে, এই পর্যন্ত সত্য। কিন্তু কার গুলিতে ঘটে এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। যার যেমন মনে হয় সে তেমন বিশ্বাস করতে পারে। মিসেস সরখেলের কত প্রশংসা শুনেছি। কত রূপ! কত গুণ! কত লোকের কত উপকার করেছেন! কই, মিস্টার সরখেলের প্রশংসা তো শুনিনি। মেজাজটা রুক্ষ! বাড়িতেও হাকিমী ফলাবেন। মরতে বাধ্য করাও কি মেরে ফেলা নয়?"

বদলী হয়ে যে স্টেশনে যাই সেখানেও এই প্রসঙ্গ ওঠে। যাঁর জায়গায় যাই তিনি জানতে চান ব্যাপারটা আসলে কী? আত্ম-হত্যা না আর কিছু?

"আর কিছু বলে তো মনে হলো না, ঘোষ।" আমি উত্তর দিই।

তা শুনে ঘোষ যা বলেন তা লিখে রাখবার মতো। "সরখেলকে তো আমি চিনি। আমারই সমসাময়িক। লোকটা কাপুরুষ। গুলি করবার মতো পৌরুষ কি ওর আছে? তবে খুনী করতে ও পারে।"

খুনের মামলায় সাক্ষী দিতে এসে কেউ যদি অমন কথা বলে

তবে ওটা সাফাইয়ের কাজ করে। প্রকাশ্যে যেটা অপমানকর প্রচ্ছন্নভাবে সেটা রক্ষার উপায়।

নেতি নেতি করেও সত্যকে জানা যায়। এমনি করে আমার স্বস্ত্যয়ন সাঙ্গ হয়। কী ভাবে হয়েছিল, কার হাত দিয়ে হয়েছিল এসব বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। কিন্তু কেন হয়েছিল তা আজও অজ্ঞাত। হয়তো জানতে পেতুম যদি সরখেলকে হাতের কাছে পেয়ে সাহস করে শুধাতুম। হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যে সাক্ষাৎ ঘটেছিল একদিন কলকাতায়। মূল ঘটনার আট নয় বছর বাদে। সেবারেও আমি তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হই, কিন্তু তাঁর নিয়তির সঙ্গে আমার নিয়তি সংযুক্ত হয় না।

বেচারার তখন ভগ্ন দশা। যদিও বয়স এমন কিছু হয়নি। তখনো চল্লিশের কোঠায়। সাংসারিক সাফল্যেরও ব্যত্যয় ঘটেনি। তবু সেই ট্র্যাজেডী তাঁর চেহারায় ছাপ রেখে গেছে। দেখে দয়া হয়। এক নারীর বদলে আরেক নারী পাওয়া যায়, কিন্তু সুজাতার মতো নারীর সঙ্গ পাওয়া যায় না। সরখেলের বোধ হয় এতদিনে চৈতন্য হয়েছে তিনি কী হারিয়েছেন। থাক, আর কেন পুরোনো স্মৃতি জাগিয়ে তোলা? কোন অধিকারে? কোন সুবাদে?

তার পরে আরো অনেক বছর অতীত হয়েছে। সরখেল আর নেই। তাঁর স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে পড়ে। আরো উপরে উঠবেন কী করে?

তাঁর চেয়ে, আমার চেয়ে, ঊর্ধ্বে উঠেছেন সেদিনকার সেই কৃষ্ণ চৌধুরী। কে না জানে তাঁর নাম? মাঝে মাঝে কাগজে তাঁর ফোটো দেখি। আর মার্লোর নাটকের পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করি। "এই কি সেই মুখ—"

মনে মনে পূরণ করতে ইচ্ছে হয়, "যার জন্যে প্রাণ দিলেন রমণী উত্তমা?" দূর! বিশ্বাস হয় না। রহস্যই ছিল, রহস্যই রয়ে গেল। সেই ভালো।

অসিধার

আমরা বাঙ্গালোর হয়ে মাদ্রাজ যাব শুনে আমাদের বন্ধের বন্ধু সুধাময় চন্দ বলেন, "বাঙ্গালোর ক্যান্টনমেন্টে প্রাক্তন বিপ্লবী বরকত আলী গুপ্তর সঙ্গে আলাপ করতে ভুলবেন না।"

বরকত আলী গুপ্ত! এ কেমনধারা নাম! মুসলমান হলে গুপ্ত কেন? হিন্দু হলে বরকত আলী কেন? আমার ধাঁধা লাগে। সেটা অনুমান করে চন্দ বলেন, "রুশ দেশের বিপ্লবীদের নাম লেনিন কেন? ট্রটস্কি কেন? স্টালিন কেন? বিপ্লবের পথে নামলে পদে পদে নাম বদল করতে হয়। আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় পালানোর সময় যদি বলতেন ওঁর নাম বিমলানন্দ গুপ্ত তাহলে ইংরেজরা তো টের পেতোই, মহাজরীনরাও ওঁকে অবিশ্বাস করে ওঁদের সঙ্গে নিত না। কিন্তু এখন আর উনি বরকত আলী গুপ্ত বলে পরিচয় দেন না। ওখানকার লোক জানে ওঁর নাম বি গুপ্ত। ফিনল্যাণ্ড ফেরত আর্কিটেক্ট।"

চন্দ ছিলেন গুপ্তর সহপাঠী। তাঁর কাছেই শোনা গেল গুপ্তর আদি নাম ছিল বিমলাপ্রসাদ গুপ্তভায়া। ম্যাট্রিকুলেশনের সময় সেটা পালটে যায়। কলেজে তিনি হন বিমলানন্দ গুপ্ত। জীবনযাত্রা বিবেকানন্দের অনুসরণ। উদ্দেশ্য আমেরিকা গিয়ে ধর্মপ্রচার। তার আড়ালে সশস্ত্র পন্থায় দেশোদ্ধার। কাউকে জানতে দিতেন না যে বিপ্লবীদের দলে তিনি নাম লিখিয়েছেন। হঠাৎ একদিন ধরা পড়েন এবং অন্তরীণ হন। পরে এক সময় ছাড়া পেয়েই নিরুদ্দেশ হয়ে যান। শেষে জানা গেল তিনি মস্কোতে গা ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর নাম বরকত আলী গুপ্ত। দেশ যদি স্বাধীন হয় তা হলেই তিনি ফিরবেন, নয়তো নয়।

পরে কিন্তু কমিনটার্নের সঙ্গেই তাঁর খিটিমিটি বেধে যায়। ওদের মতে ভারতের স্বাধীনতা বুর্জোয়াদের কর্ম নয়। না জাগিলে সব শ্রমজীবী সেনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না। বুর্জোয়াদের হাতে হাতিয়ার ধরিয়ে দিলে কী হবে? সব তো ইংরেজরাই কেড়ে নেবে। বরকত আলীর উপর ফরমাস হলো, যাও, শ্রমিকদের জাগাও, কৃষকদের জাগাও। ওরাই যাতে ইংরেজের উত্তরাধিকারী হয়। গুপ্ত ভেবেছিলেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহাজরীনদের কমাণ্ডার হয়ে খাইবার পাশ দিয়ে ঢুকলেই অমনি চারদিকে সাড়া পড়ে যাবে, যেখানে যত ভারতীয় সৈন্য আছে তারা হিন্দু মুসলমান শিখ নির্বিশেষে আবার এক মিউটিনি বাধাবে। বাস! লাল কেল্লা ফতে। ভারত স্বাধীন। এই তো কেমন সোজা থীসিস। এর জন্যে তাঁকে কমিউনিস্ট হতে হবে কেন? মার্কসবাদের দীক্ষা নিতে হবে কেন? তিনি যেমন কলমা না পড়েও মহাজরীনদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়েছেন তেমনি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো না পড়েও কমিউনিস্টদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হতে পারবেন না কেন?

আসলে তিনি 'আনন্দমঠ' পড়ে ন্যাশনালিস্ট। হিন্দু জাতীয়তাবাদী। দায়ে ঠেকে মহাজরীনদের সঙ্গে মিলেছেন। দায়ে ঠেকে কমিউনিস্টদের সঙ্গেও মিশতে রাজী। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি সমাজবিপ্লব রূপে কল্পনা করতে অনিচ্ছুক। কমিউনিজমের বাহক হয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ করবেন না। মস্কোতে তাঁর পক্ষেও কতক রুশ বন্ধু ছিলেন। তবে তাঁদের প্রভাব বেশী নয়। বছর পাঁচেক অপেক্ষা করে তাঁর জ্ঞানোদয় হলো যে সোভিয়েত নেতাদের দৃষ্টি এশিয়ার উপরে নয়, ইউরোপের উপরে। আগে ইউরোপে তাঁদের শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা না করে তাঁরা পারস্যের দিকে বা ভারতের দিকে বা চীনের দিকে পা বাড়বেন না। ইতিমধ্যে যদি কেউ তাঁদের সাহায্য চায় তাঁরা ফরমাস করবেন, যাও, মজুরদের জাগাও। কিষাণদের জাগাও। আরে, ওটা কি ক্ষত্রিয়ের কাজ! ওতে বারুদের গন্ধ কোথায়! গোলার আওয়াজ কোথায়!

বিষম বিষাদগ্রস্ত হয়ে বরকত আলী গুপ্ত ফিনল্যাণ্ডে আশ্রয় নেন। রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে আর্কিটেক্‌চার শিক্ষা করেন। তারপর শিক্ষানবীশী সূত্রে ইউরোপের নানা দেশে ঘোরেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল দেশকে স্বাধীন না করে তিনি পাণিগ্রহণ করবেন না। তার দেরি আছে দেখে তিনি ব্রতভঙ্গ করেন। এক আইরিশ কন্যার সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয়। উনিও এককালে আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামে সংযুক্ত ছিলেন। ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল। দুজনে মিলে মনস্থির করেন যে ভারতে এসে স্বাধীন ব্যবসা করবেন। কিছুদিন বম্বেতে কাটিয়ে দু'চার জায়গায় চেষ্টাচরিত্র করে অবশেষে বাঙ্গালোরে মনের মতো কাজ ও বাস করবার মতো অবস্থান পান। সেখানে বারো মাস না শীত না গ্রীষ্ম।

চন্দ বলেন, "আপনাকে আমি একটা পরিচয়পত্র দিচ্ছি। ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্য যদি গুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহ থাকে।"

আমি বলি, "তাঁর যদি আমার সম্বন্ধে আগ্রহ না থাকে?"

"থাকবে, থাকবে। বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর অসীম আগ্রহ। আপনি বাংলাদেশে কাজ করেন, ছুটি নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন শুনলেই তিনি লুফে নেবেন। আশ্চর্য হব না, যদি হোটেল থেকে তাঁর বাড়িতেই ধরে নিয়ে যান।" চন্দ বলেন প্রত্যয়ভরে।

চিঠিখানা চন্দ কি মনে করে অগ্রিম পাঠিয়ে দেন ডাকযোগে। আমি 'হ্যাঁ' কি 'না' বলিনে। কে জানে হয়তো গুপ্তর পেছনে গুপ্তচর ঘুরছে। আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে পারে। সরকারী চাকুরে আমি। প্রাক্তন বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করি কোন্ সুবাদে? তবে কি আমিও তলে তলে বিপ্লবপন্থী? অথচ কৌতূহল আমার ষোলআনা। অমন একটি চরিত্র আমি পাই কোথায়!

ভোরবেলা বাঙ্গালোর স্টেশনে নেমে দেখি হোটেল থেকে লোক এসেছে আমাদের নিতে। জিনিসপত্র নামাচ্ছি এমন সময় পেছন থেকে কানে আসে, "মাফ করবেন, আপনিই কি মিস্টার সান্যাল?"

চেয়ে দেখি অপরিচিত এক ভদ্রলোক। বাঙালীর মতো সাজ-পোশাক। আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়ো। তার মানে পঁয়তাল্লিশ। রংটা ফর্সা না হলেও মলিন নয়। আকারটা না লম্বা না বেঁটে। গড়নটা বেশ মজবুত। চেহারাটা অনেক পোড় খাওয়া। যাকে বলে সীজন্ড। মুখে দাড়ি নেই, গোঁফ নেই, তবু কেমন যেন মনে হলো ইনিই বরকত আলী গুপ্ত।

"মিস্টার গুপ্টা, আই প্রিজিউম।" আমি ইংরেজীতে উত্তর দিই।

তিনি আমার দুই হাত ধরে ঝাঁকানি দেন। তারপর মিসেস সান্যালকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বলেন, "আমার গৃহিণীও আসতে চেয়েছিলেন আপনাদের স্বাগত জানাতে। নানা কারণে পারলেন না।"

তখনো আমি বুঝতে পারিনি যে গুপ্তর ইচ্ছা আমরা তাঁর ওখানে উঠি। হোটেলের লোকটিকে তিনি আড়ালে ডেকে নিয়ে উর্দুতে বলেন, "আগাসাহবকে গুপ্তসাহেবের সেলাম জানাবে। এঁরা আমার মেহ্‌মান।" এই বলে তার হাতে কিছু গুঁজে দেন।

তারপর আমাদের দিকে ফিরে বলেন, "এবার চলুন দয়া করে অধমের গরীবখানায়। চন্দ আমাদের পরিচয় না দিলেও আপনারা আমার অচেনা নন। বাংলা মাসিকপত্র আমি ওদেশেও পড়তুম। এদেশেও পড়ি।"

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সে যা খাতির করেন গুপ্ত দম্পতি তা আমাদের আশার অতীত। ভেবেছিলাম একবেলা ওঁদের সঙ্গে কাটিয়ে তারপর হোটেলে উঠে যাব। দেখলাম ঘর সাজানো গোছানো হয়েছে বাস করবার জন্যে। সঙ্গে তিন ছেলেমেয়ে ও দুই চাকর। এতবড় একটা গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া কি উচিত? কিন্তু ও বাড়িতে দুটি ছেলেমেয়ে ছিল। ওদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল আমাদের ছেলেমেয়েদের। হোটেলে ওরা সাথী পাবে কোথায়! তা ছাড়া বাড়িটাও বড়ো। যথেষ্ট জায়গা। খেলাধুলার পক্ষে অপরিসর নয়। সাতপাঁচ ভেবে থেকেই যাই।

দেশ দেখা তো শুধু দৃশ্য দেখা নয়। মানুষ চেনা ও পরকে আপন করা। গুপ্তরা একবেলার মধ্যেই আপনার জন হয়ে ওঠেন। শুনলাম মাস কয়েক আগে গৃহকর্তার মাতৃবিয়োগ হয়েছে। মাথার চুল এখনো সাক্ষ্য দেয়। হৃদয়ের শূন্যতা পূরণের জন্যেও বোধহয় আমাদের মতো অতিথির প্রয়োজন ছিল।

নিজের কাজকর্মের ক্ষতি না করে আমাকে সঙ্গ দেওয়া গুপ্তর পক্ষে কঠিন, তবু তিনি যখনি একটু ফাঁক পেতেন বাড়ি ছুটে আসতেন ও আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে যেতেন পায়ে হেঁটে বেড়াতে। কিংবা সবাইকে মোটরে করে।

আমার অশেষ কৌতূহল ছিল তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি শুনতে। লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না। ট্রট্স্কি লোকটা কেমন। স্টালিন কী করে ক্ষমতা হাত করেন। ভিতরকার রহস্যটা কী। গুপ্ত যতটুকু জানতেন ততটুকু বলতেন, তাতে আমার কৌতূহল মিটত না।

"দেখুন, মিস্টার সান্যাল," গুপ্ত বলেন, "আমার পোজিশনটা একবার কল্পনা করুন। কমিউনিস্ট নই, আমি ন্যাশনালিস্ট। ভাষাও ভালো বুঝিনে। আমাকে ওরা বিশ্বাস করে ওদের মনের কথা বলতে যাবে কেন? পরস্পরকে ওরা বিশ্বাস করে না। কে যে গুপ্তচর, কে যে নয়, তাই ওরা জানে না। আমি বাইরে বাইরে ভেসে বেড়াই। আমাদের মধ্যে যারা কমিউনিস্ট দীক্ষা নেয় তারা হয়তো আপনাকে ভিতরের খবর বলতে পারত। কিন্তু তাদের পেটের খবর পেট থেকে বেরোবার আগেই কারো কারো সন্দেহজনকভাবে মৃত্যু ঘটে। কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। বিপ্লব একটা ছেলেখেলা নয়। প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। যদি সফল হয় সবাই ধন্য ধন্য করে। বিফল হলে কিন্তু সান্ত্বনা নেই।"

অন্তরঙ্গতার সুরে এর পরে তিনি আমাকে যা বলেন তা আমাকে দুঃখ দেয়। "বিপ্লবে আরো একটা দিক আছে, সান্যাল। না দেখলে

বিশ্বাস হতো না। রাস্তায় ঘাটে পার্কে ময়দানে জোড়ে জোড়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। এতটুকুও আব্রু নেই। শরম নেই। আমি তো দারুণ শক পাই। হাজার হাজার মানুষ মারা গেলেও আমি এত শক পেতুম না। মারতে ও মরতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু এ কী! আমি দৌড় দিই।"

আমি ওদের পক্ষ নিয়ে বলি, "যুদ্ধের শেষে বিপ্লবের শেষে ওরকম একটু-আধটু হয়েই থাকে, মিস্টার গুপ্ত। মহাযুদ্ধ যেদিন শেষ হয় সেদিন লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন দুজন বিশিষ্ট ভারতীয় সম্পাদক। তাঁরাও সেই একই দৃশ্য অবলোকন করে স্তম্ভিত হন। যত্রতত্র যার তার সঙ্গে রাস্তার কোণে বা পার্কের ভিতরে সেদিন যা ঘটে তা চার বছরের উপবাসের ক্ষুধার পর মচ্ছব।"

মচ্ছব! তিনি উষ্মার সঙ্গে বলেন, "ভারতের মাটিতে চাইনে অমন মচ্ছব। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে রক্তগঙ্গা বইতে পারে। কিন্তু মচ্ছব! মচ্ছব কদাপি নয়। এর মূলে কী রয়েছে, জানেন? মেটিরিয়ালিজম। ধর্মে অবিশ্বাস। রাশিয়ার কমিউনিস্টরা গড মানে না। পশ্চিমের ক্যাপিটালিস্টরাও কি মানে? তাদের উপাস্য ম্যামন।"

॥ দুই ॥

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ধর্মে মতি। রাজনীতি তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও আকাশের দিকে চেয়ে তিনি ধ্রুবতারা অন্বেষণ করেছেন। তাই বলে তিনি গোঁড়া হিন্দু নন। তাই যদি হতেন তবে একজন আইরিশ ক্যাথলিক মহিলাকে সহধর্মিণী করতেন কী করে? ধর্মের মর্ম একই পরম সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ, তাঁরই সঙ্গে সাযুজ্য। কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে ঈশ্বর, কেউ বলে গড। নামে কী আসে যায়?

এই পর্যন্ত বোঝা যায়, কিন্তু এর পরে তিনি যা বলেন তা মেনে

নেওয়া শক্ত। ব্রহ্মচর্য বিনা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান যদি না-ও হয় তবু ব্রহ্মচর্য পালন করা চাই। বংশরক্ষার জন্যে, মানবজাতির অস্তিত্বের জন্যে বিবাহ করতে পারো, কিন্তু একটি কি দুটি সন্তানের পর আর না। ধর্মের জন্যে কাম পরিত্যাগ করতে হবে। তিনিও তাই করেছেন।

পারিবারিক ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা আমার স্বভাব নয়। আমি তো এড়িয়ে যেতেই চাই। কিন্তু তিনি চান আমার নৈতিক সমর্থন।

'আরো কয়েক মাস আগে এলে আমার মাকে দেখতে পেতেন। এইখানেই তাঁর দেহান্ত হয়। যাবার আগে একটা কথা আমাকে বলে যান। বাবা, বৌটার দিকে তাকানো যায় না। মুখে হাসি নেই, যৌবনে যোগিনী, অকালে বুড়িয়ে যাচ্ছে। কেন, বাবা, তুমি তো সাধুসন্ত নও, বিবাহিত পুরুষ। তুমি বিবাহিতা স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না কেন?' গুপ্ত আমাকে শোনান।

'তার পর?' আমি উত্তরের অপেক্ষা করি।

'আমি বলি, মা, পরমহংসদেবও তো ছিলেন বিবাহিত পুরুষ। তিনি কেন বিবাহিতা স্ত্রীকে স্পর্শ করতেন না? ধর্মের অনুশাসন কামিনী স্পর্শ না করা। মা তখন বলেন, বাছা, তুমি যাঁর নাম করলে তিনি কাঞ্চনও স্পর্শ করতেন না। পয়সা ছুঁলে তাঁর গা জ্বালা করত। তোমাকে তো দেখি দুই হাতে মোহর কুড়োতে। কামিনীতে যার এত অনাসক্তি কাঞ্চনে তার এত আসক্তি কেন?' আমি শুনতে থাকি।

গুপ্ত বলতে থাকেন, 'বড় কঠিন প্রশ্ন। বিয়ে করেছি। ছেলে-মেয়ে হয়েছে। আমি যদি চোখ বুজি ওরা খাবে কী? দাঁড়াবে কোথায়? স্ত্রীরও তো একটা সংস্থান চাই। পরমহংসদেবের তো সে ভাবনা ছিল না। শিষ্যরাই সে ভার নিয়েছিলেন। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে। যে যার নিজের বৌ ছেলে নিয়ে পৃথক হয়ে গেছে। আমি কি সাধ করে মোহর কুড়োই? যারা আমার সার্ভিস নিচ্ছে তারা ধনী লোক, আমার ন্যায্য পারিশ্রমিক

আমাকে না দেবেই বা কেন? তার মোটা একটা ভাগ তো আশ্রমেই যাচ্ছে। আমার মহাগুরুর শ্রীচরণে। তিনিও কাঞ্চন স্পর্শ করেন না। কামিনী তো নয়ই। চিরকুমার। কিন্তু আশ্রমের প্রয়োজনে আমাদের প্রণামী গ্রহণ করেন।'

এর পরে ওঠে শ্রীগুরু প্রসঙ্গ। গুরুজী বাল্যকালে গৃহত্যাগ করে কোথায় চলে যান কেউ জানে না। চল্লিশ বছর ধরে একটি নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় একাকী ধ্যান করেন। তাঁকে একবেলা খাবার যুগিয়ে আসত একটি কাঠুরিয়া নারী। সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে। কী এক নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম প্রেরণায় চল্লিশ বছর ধরে। কেউ যখন তাঁকে চিনত না সেই অশিক্ষিতা হরিজন নারী তাঁকে আবিষ্কার করে, কিন্তু গোপন রাখে।

পাহাড় থেকে নেমে এসে গুরুজী একটি গাছতলায় বাস করেন। তারই চারদিকে গড়ে ওঠে তাঁর আশ্রম। একদিন নয়, দিনে দিনে। দুবেলা শত শত ব্যক্তি দর্শনপ্রার্থী হন। গুরুজী দুটি একটি কথা বলেন। বলতে বলতে ধ্যানস্থ হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালে অনুভব করতে পারা যায় তিনি সকলের দ্বারা পরিবৃত হয়েও পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত। এ জগতে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁকেই এ জগতের প্রয়োজন। দেশ বিদেশ থেকে যাঁরাই আসেন তাঁরাই কিছু না কিছু পেয়ে ফিরে যান। প্রাপ্তিটা বিশুদ্ধ আত্মিক। তিনি মন্ত্রও দেন না, রোগও সারান না, মনস্কামনাও পূর্ণ করেন না। তাঁর অলৌকিক কোনো বিভূতিও নেই।

'যাবেন নাকি আমার সঙ্গে তাঁকে দর্শন করতে?' জিজ্ঞাসা করেন গুপ্ত।

'এ যাত্রা নয়। পরে যদি সময় পাই আবার আসব।' উত্তর দিই আমি।

'বয়স হয়েছে। বেশীদিন তাঁকে এ শরীরে ধরে রাখতে পারা যাবে না। আমি তো সেইজন্যে আশ্রমের কাছে একটা কুঁড়েঘর করেছি। ছুটি পেলেই ওখানে গিয়ে হাজির হই। আমাকে

দেখে কী মনে হয় আপনার ? কিছু কি পেয়েছি ?' গুপ্ত শুধান।

সত্যি, তার মুখে প্রগাঢ় প্রশান্তি, চোখে অপূর্ব আভা। কর্মের চক্রে ঘুরছেন অনবরত, তবু তিনি ইংরেজীতে যাকে বলে সিরীন। আমার অবাক লাগে তাঁকে দেখে। কিন্তু ওই যে অসিধার ব্রত ওটা আমি সমর্থন করিনে। গুপ্তজায়ার দিকে তাকানো যায় না। ভালোবাসার অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছেন। স্পর্শ না করে কি ভালোবাসা যায় ? নারীকে কামিনী বলাটাই অপরাধ। কাঞ্চনের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করাটা তো ঘোরতর অন্যায়। এসব মধ্যযুগীয় সংস্কার থাকতে স্বাধীনতাও হবে না, বিপ্লবও হবে না। আধ্যাত্মিক উন্নতিও কি হবে ? সহধর্মিণীকে সঙ্গে না নিয়ে অধ্যাত্মমার্গে অগ্রসর হওয়া যায় কি ?

যাক, গুপ্তকে এসব কথা শোনাইনে। শুধু বলি, "হ্যাঁ, আপনি কিছু পেয়েছেন। পাবার মতো জিনিস বটে। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে শেয়ার করা উচিত।'

'সেইখানেই তো ব্যথা !' তিনি ব্যাকুলভাবে বলেন। একসঙ্গে এতদূর এসে এখন পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটতে পারছিনে। তিনি এ বিষয়ে আশ্চর্য রকম নীরব। মহাগুরুর আশ্রমে নিয়ে যেতে চাই। কিছুতেই যাবেন না। গেলে হয়তো মনে শান্তি পেতেন। আমি যেমন পেয়েছি। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে গৃহকর্ম করে যাচ্ছেন। ছেলেমেয়েদের মানুষ করছেন। সামাজিকতারও ত্রুটি নেই। আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না। যদিও অনেকবার বলেছি আয়ারল্যাণ্ড ঘুরে আসতে। পতিগত প্রাণ। এমন সাধ্বীকে কষ্ট দিতে কে চায় ! কিন্তু উপায় কী ! আমি যে অসহায়।'

এইবার আমাকে বলতে হয়, 'তা বলে স্ত্রীর উপর তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওটা চাপিয়ে দেওয়া যায় কি ?'

'তা যদি বলেন তবে নিজের উপরেই বা ওর বিপরীতটা চাপিয়ে দিই কী করে ? আমারও তো ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন থাকতে পারে।' গুপ্ত কাটান দেন।

বেশ বুঝতে পারি যে ওদের দুজনের মধ্যে একটা আড়াআড়ি চলেছে। একটা সংকটের ভিতর দিয়ে ওঁরা যাচ্ছেন। আমরা সেই ক্রাইসিসের আঁচ পাচ্ছি। কিন্তু কীই বা করতে পারি আমরা! আমরাও অসহায়।

বিয়েটা হয়তো ভেঙে যাবে না। ছেলেমেয়ে রয়েছে। তাদের স্বার্থে একসঙ্গে থাকতে হবে। তা ছাড়া মিসেস গুপ্ত তেমন স্ত্রী নন যিনি স্বামীকে ছেড়ে থাকতে পারবেন। গুপ্তও কি তেমন স্বামী নাকি? পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার জন্যে দিন-রাত খাটছেন। ইচ্ছা থাকলেও তিনি আশ্রমিক হবেন না।

'সব মানুষকে একদিন না একদিন রিটায়ার করতে হয়। আমাকেও করতে হবে, ভাই। তখন আমি আশ্রমে গিয়ে আমার শেষ জীবনটা কাটাব ভেবেছি। কিন্তু মহাগুরু কি ততদিন থাকবেন? ওখানকার একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগে না। ভোজনের সময় ব্রাহ্মণদের এক পঙ্‌ক্তি। অব্রাহ্মণদের আরেক। মহাগুরু যদিও ব্রাহ্মণ তবু অব্রাহ্মণদের পঙ্‌ক্তিতেই বসেন। বলেন, চল্লিশ বছর আমি হরিজনের হাতে খেয়েছি, আমার পৈতেও নেই। তবে কেউ যদি আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে আমি তাকে কিছু বলতে যাইনে। তোমরাও নীরব থেকো।' গুপ্তর মুখে শুনি।

শুনে যাই, ধর্মের নামে এই যে অধর্ম চলেছে একদিন এর পরিণাম ভোগ করতে হবে দক্ষিণের ওই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুদের। পরলোকে সদগতি হবে কি না জানিনে, কিন্তু ইহলোকে এর সাজা আছে। ইতিহাসের চাকা ঘুরতে ঘুরতে একদিন এমন এক জায়গায় আসবে যেদিন স্পৃশ্যরাই পড়বে চাকার তলায়। অস্পৃশ্যরা উঠবে উপরে। যে যত নীচু সে তত উঁচু। যে যত উঁচু সে তত নীচু।

হঠাৎ আমার মাথার একটা কৌতুক প্রশ্নের উদয় হয়। 'আচ্ছা. আমি যদি আপনার মহাগুরু সন্দর্শনে যাই আমাকেও কি উনি অসিধারের উপদেশ দেবেন?'

গুপ্ত তা শুনে উল্লসিত হন। 'সত্যি, যাবেন আপনি ওকে

দর্শন করতে? চলুন না একদিন। না, আপনাকে উনি অমন উপদেশ দেবেন না। কাউকেই দেন না। আমাকেও দেন নি। উপদেশ দেওয়াটাই ওঁর রীতি নয়। উনি কেবল ওঁর আত্মোপলব্ধির কথাই শোনান। এই বহির্জগতের অন্তরালে এক অন্তর্জগৎ রয়েছে। ডুবুরির মতো উনি তাতে ডুব দেন। তুলে নিয়ে আসেন মণিমুক্তা। আমাদের হাতে বিলিয়ে দেন। আপনিও কিছু পাবেন।'

আমি একটু চাপাচাপি করতেই তিনি হোহো করে হেসে ওঠেন। 'অর্জুন যে অর্জুন তাঁকেও শ্রীভগবান অসিধারণ করতেই উপদেশ দিয়েছিলেন। অসিধার অবলম্বন করতে বলেন নি। বললেও কানে যেত না। আমাদের মহাগুরুকেও আমরা ভগবান বলে ডাকি। তিনিও জানেন যে আমরাও এক একটি পার্থপ্রতিম। তাই অসিধার প্রসঙ্গে নীরব থাকেন। নিয়ম করে দিলে আশ্রয় খালি হয়ে যাবে। দুটি একটি ভক্তকে নিয়েই তো আর ভগবান হওয়া চলে না।'

আমিও সে হাসিতে যোগ দিই। অসিধারণ তত শক্ত নয় অসিধার যত শক্ত। তাই গীতায় ভগবানও সে বিষয়ে নীরব। কেবল বলেন, হে অর্জুন, যুদ্ধ করো।

ওদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধি বাধি করছে। তা নিয়ে দেশের সবাই দোলায়িত। যুদ্ধে হিটলারকে জিততে দিলে বৃটিশ নেভী পড়বে ওর হাতে। একদিন ভারতে এসে হানা দেবে। তখন ওকে রুখবে কে? রুখতে হলে ইউরোপেই রুখতে হয়। রুখবে যে তাকে সাহায্য করতে হয়। অপর পক্ষে ইংরেজদের জিতিয়ে দিয়ে আমাদের লাভটা কী হবে? ওরা কি আমাদের ঘাড় থেকে নামবে?

গুপ্তকে আমি একান্তে শুধাই। 'যুদ্ধ বাধলে আপনার মতো বিপ্লবীর কর্তব্য কী? সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অসিধারণ, না ফাসিবাদের বিরুদ্ধে অসিধারণ?'

তিনি অন্তরঙ্গ সুরে উত্তর দেন, 'না, ভাই। এ বয়সে আর অসিধারণ নয়। এখন অসিধার।' এই বলে গম্ভীর হয়ে যান।

বাঙ্গালোর থেকে বিদায়ের পর আর দেখা হয় না। চিঠি লেখালেখিও ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। লোকমুখে শুনতে পাই মহাগুরুর তিরোভাবের পর গুপ্তদের জীবনে পুত্রশোক আসে। কন্যার উচ্চ-শিক্ষার অনুরোধে তাকে নিয়ে তার জননী সাগরপারে যান ও তার সঙ্গে থাকেন।

বরকত আলী গুপ্ত একদিন বিমোহিত হয়ে দেখেন, অসির ধার দিয়ে তাঁর জন্মভূমিকে দু'খানা করা হয়েছে। বরকত আলীকে নিয়ে এক নেশন, গুপ্তকে নিয়ে আরেক নেশন। এরই নাম নাকি দেশের স্বাধীনতা! যার জন্যে তিনি একদিন মহাজরীনদের সঙ্গে দুর্গম গিরি কান্তার মরু লঙ্ঘন করেছিলেন।

জোড়-বিজোড়

রাজধানীতে গেলে আমার সন্ধ্যাবেলাটা কাটে পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন মালিকদম্পতি। স্বামী পাঞ্জাবী, স্ত্রী বাঙালী। মিসেস মালিক জানতে চাইলেন কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কার কার সঙ্গে দেখা করতে চাই ?

কয়েকজনের নাম করি। শেষে বলি, 'শুনছি শোভাকররা এখন এখানে। তাঁদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি।'

'না, না, ওঁদের সঙ্গে দেখা না করাই ভালো।' মিসেস মালিক বিষণ্ণভাবে বলেন। 'ওঁরা এখন একটা সঙ্কটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন। বিব্রত হবেন।'

'সঙ্কট !' আমি শঙ্কিত হয়ে বলি, 'তাহলে তো একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। গুরুতর অসুখ বুঝি ! কার অসুখ ?'

মিসেস মালিকের পাশে বসেছিলেন তাঁর বান্ধবী মিসেস রাও। স্বামী মহারাষ্ট্রীয়, স্ত্রী বাঙালী। দুজনের দিকে চেয়ে চোখের ভাষায় শুধান, কী বলা যায় ?

'আচ্ছা, পরিতোষবাবু,' বাঁশরী মালিক বলেন, 'আপনি তো ওঁদের পুরনো বন্ধু। আপনাকে জানাতে দোষ কী ? আর কাউকে জানাবেন না কিন্তু। জানেন তো দিল্লীর সমাজ কী ভীষণ !'

আমরা সবাই পরস্পরের কাছাকাছি সরে আসি। মিসেস মালিক যা বলেন তার মর্ম শোভাকরদের কন্যা উর্মি তার স্বামী যোশীকে ছেড়ে এক ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে পালিয়ে যায়। যোশীর মতো সজ্জন এ সংসারে ক'জন ! সে ক্ষমা করে ও ধৈর্য ধরে। উর্মির কিন্তু লেশমাত্র আগ্রহ ছিল না ফিরে আসতে। সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে বিবাহভঙ্গের যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। সুতরাং যোশী যেন তাকে ডিভোর্স করে। ডিভোর্সের মামলার রুদ্ধকক্ষে শুনানী হয়। প্রতিবাদীরা হাজির হন না। ডিভোর্স মঞ্জুর হয়।

উভয়পক্ষই এখন নিষ্কণ্টক। উর্মি বিয়ে করেছে অ্যালেনকে। আর যোশীও নাকি এক জার্মান মেয়েকে বিয়ে করবে বলে স্থির করেছে। এখন সমস্যা হয়েছে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে। মা যদি তাদের ভাব পায় তবে ইংরেজ সৎবাপ তাদের আদর করবে না। বাপ যদি তাদের ভার পায় তবে জার্মান সৎমা তাদের আদর করবে না। মিসেস শোভাকর ওদের ভার নিতে রাজী, মিসেস যোশী অর্থাৎ যোশীর মা যদি আপত্তি না করেন। লজ্জায় অপমানে ভাবনা চিন্তায় ডক্‌টর ও মিসেস শোভাকর এখন জর্জর। কেউ দেখা করতে গেলেই তো প্রশ্ন করবেন, উর্মি কেমন আছে? কী উত্তর দেবেন?

মালিক বলেন, 'উর্মির বিয়েটা বোধহয় আজকালের মধ্যেই হচ্ছে।'

রাও বললেন, 'যোশীর বিয়ের কিন্তু দেরি আছে। বাচ্চা দুটির সুব্যবস্থা না করে ও বিয়ে করতে পারছে না।'

শোভাকরদের কথা ভেবে আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। কী বলে সান্ত্বনা দিই তাঁদের! কত আশা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। যোশীও উচ্চপদস্থ অফিসার। ইংরেজটি তাঁরই সহকর্মী ছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় অবসর নিয়ে এক বিলিতী কোম্পানীর ম্যানেজার হয়েছে। বছরে দুবার করে বিলেত যায়। উর্মি হয় তার সহযাত্রিণী। যোশী তো ওকে একবারও বিলেত নিয়ে যেতে পারেনি।

গালে হাত দিয়ে বাঁশরী মালিক বলেন, 'সত্যি, পরিতোষবাবু, কেন এরকম হয়?'

একই প্রশ্ন মিসেস রাওয়ের মুখে। তাঁর চোখ ছলছল করে। 'কেন এরকম হয়?'

আরো দু'জন মহিলাও সেখানে ছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি আমারই দিকে। করুণ দৃষ্টি। তাঁরাও বোধহয় জানতে চান কেন এরকম হয়।

'ওসব হলো মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। আমি ওর কী জানি?' আমি দুঃখ প্রকাশ করি।

'না, না, আপনি ঠিক জানেন। আপনি নামকরা সাহিত্যিক।

আপনার মতো লোকের কাছেই তো আমরা এর ব্যাখ্যা আশা করি।' মিসেস মালিক চাপ দেন।

সাহিত্যিকরা কবে থেকে সবজান্তা হলেন? সত্যি, আমরা এর ব্যাখ্যা জানিনে। প্রেম যখন আসে তখন বন্যার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কেউ বাঁচে। কেউ মরে। একজনের বেলা কমেডী। আরেকজনের বেলা ট্র্যাজেডী। সমাজের নিন্দা প্রশংসাটা সমাজের সুবিধা অসুবিধার কথা ভেবে। প্রেম কি তার পরোয়া করে? করলে কি ইলিয়াড লেখা হতো? না শকুন্তলা? তবু তো ভালো যে আজকাল ডিভোর্স সম্ভব হয়েছে। নইলে আরো কেলেঙ্কারি হতো। যোশীরও কি আবার বিয়ে করবার উপায় থাকত?' আমি সান্ত্বনাবাণী শোনাই।

আমার পাশে বসেছিলেন আমার বন্ধু তালুকদার। তিনি রসিকতা করেন। লোকে যা বলে সেটাকে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বলেন, 'যার যাতে মজে প্রাণ। কী ইংরেজ কী জার্মান!'

সকলের মুখে হাসি ফোটে। এরপরে আমরা খাবার ঘরে যাই ও টেবিলের চারপাশে আসন নিই। সবশুদ্ধ আটজন।

আমার পার্শ্ববর্তিনী ছিলেন ডানদিকে কুমারী ছায়া দত্ত। আর বামদিকে তাঁর মাসী শ্রীমতী সুরুচি রাও। কথাবার্তা যা হলো তা শ্রীমতীর সঙ্গেই। কুমারীর মুখখানি আঁধার। ছায়া যেন কেবল নামে নয়, মুখে। রংটাও মলিন। মাসী কিন্তু ধবধবে ফরসা, তেমনি রূপবতী। কিন্তু বয়স হয়েছে সেটা ঢাকতে চান।

আলাপ করে জানতে পারি যে ছায়ার বাবা কলকাতার ডাকসাইটে ব্যারিস্টার জি এইচ ডাট। একদা আমাকে তাঁর বাড়ির গার্ডেন পার্টিতে আমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে বা মেয়েকে সেখানে দেখিনি। অত বড়ো ব্যারিস্টারের কন্যা কেন যে দিল্লীতে মাসীর কাছে থাকে ও সামান্য চাকরি করে তার মর্মভেদ করতে পারিনে। ফেরবার পথে আমার বন্ধু তালুকদারকে জিজ্ঞাসা করি।

'জানো না বুঝি?' তালুকদার উত্তর দেন, 'ছায়ার মা বাবার

ডিভোর্স হয়ে গেছে। তাই ওর মুখ অমন ছায়াচ্ছন্ন। ও প্রতিজ্ঞা করেছে যে বাপের সঙ্গে সংস্রব রাখবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াবে। এতদিন মার কাছেই ছিল লণ্ডনে। এখন মাসীর কাছে এসেছে। মাসীর ইস্কুলে পড়ায়। আরো ভালো চাকরির সন্ধানে আছে।'

'বলো কী হে, আরো এক ডিভোর্স! প্রেমের বন্যায় ভেসে গেল কে? স্বামী না স্ত্রী?' আমি আশ্চর্য হই।

'তা তো জানিনে। বাপের সাহায্য নিচ্ছে না, এর থেকে অনুমান হয় বাপেরই দোষ। প্রেম কেন বলছ? প্রেমের একটা বয়স আছে। পঞ্চাশোর্ধ্বে লোকে বানপ্রস্থ যায়। প্রেমের বানে ভেসে যায় না।' বন্ধু রসিকতা করেন।

এরপর ওঠে মাসীর প্রসঙ্গ। আমি ওঁর আর ওঁর স্বামীর প্রশংসা করি। বিদ্যা আর সুন্দর মিলে যেমন বিদ্যাসুন্দর তেমনি সুন্দরী আর বিদ্বান মিলে কী? সুন্দরী বিদ্বান?

'তোমাকে আরো একটা চমক দিতে হচ্ছে।' তালুকদার বলেন, 'রাও ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী।'

'ওঃ! বিধবা হয়েছিলেন বুঝি!' আমি সুবোধ বালকের মতো শুধাই।

'বিধবার বিবাহ আজকাল আর চমকপ্রদ নয়। সধবাবিবাহই চমকপ্রদ। তার মানে আরো এক ডিভোর্স। কার দোষে, জানিনে। আর দোষটাও তো আজকাল গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চমকটাও বেশীদিন থাকবে না।' বন্ধু ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

'বলো কী হে? আরো একটা ডিভোর্স! এক সন্ধ্যায় তিন তিনটে বিবাহভঙ্গ? এর পরে হয়তো শুনব যে মালিকরাও সেই তালে আছেন।' আমি আঁধারে ঢিল ছুঁড়ি।

'না, না। তার কোনো সম্ভাবনা নেই।' তালুকদার আমাকে আশ্বাস দেন। 'তবে বলা যায় না। মালিককে মাঝে মাঝে পরকীয়ার সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। সেটাই তো এখনকার ফ্যাশন।'

কুলদীপ সিং মালিক সুপুরুষ। বিয়ে ভেঙে গেলে তাঁর আবার বিয়ে হবে। ভাবনা তাঁর জন্যে নয়। তাঁর রুগ্না স্ত্রীর জন্যে। যদিও অশেষ গুণবতী।

॥ দুই ॥

এর বছরখানেক বাদে দার্জিলিং যাই সপরিবারে বেড়াতে। হঠাৎ দেখা হয়ে যায় ম্যালে কলকাতার ব্যারিস্টার জি এইচ ডাটের সঙ্গে। তিনি একটু এগিয়ে এসে হাতে হাত মেলাতেই আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তখন তিনিও আমাদের নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। তারপর তাঁরা লোকের ভিড়ে হারিয়ে যান। আমরাও। দার্জিলিং-এ আর তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় না।

কী রূপ! কী রূপ! ধাঁধিয়ে দেয়। এত বয়স হয়েছে, তবু কী চার্মিং! এর মতো নারীর জন্যে মুনিদেরও মতিভ্রম হয়, ব্যারিস্টার কোন ছার! গৌরবর্ণা সুতনুকা দীর্ঘাঙ্গী সেই ললনার বয়স বোধ-হয় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। এতদিন কি তিনি অনূঢ়া ছিলেন? কে জানে! দার্জিলিং-এর বন্ধুরা কেউ এঁদের চিনতেন না। এঁরা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছিলেন গ্রীষ্মের মরসুমে।

আরো বছরখানেক বাদে একদিন আকস্মিকভাবে রহস্যভেদ হয়। কলকাতায় নয়, যেখানে আমি থাকি সেখানে। শান্তিনিকেতনে। ঘরে বসে।

কলকাতা থেকে সুষমা সর্বাধিকারী মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসেন। উৎসব দেখতে। আমাদের সঙ্গে দেখা করে যান। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর অনেকদিনের বন্ধুতা। একদিন চা খেতে খেতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। তিনজনে আমরা আকাশের তলে বসে গল্প করি।

কথাটা ওঠে তাঁর পরলোকগত স্বামীর প্রসঙ্গে। ভদ্রলোক এত গুণবান হয়েও সাফল্যের মুখ দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর

সঙ্গে তুলনা হয় না এমন ব্যারিস্টার এখন প্রোফেসনের শিখরে। ভাগ্য! ভাগ্য!

আমি তামাশা করে বলি, 'হয়তো বৌ-ভাগ্য থেকে সৌভাগ্য।'

তিনি সেটা গায়ে পেতে নেন। 'সত্যিই তো! আমার মতো চেহারা কি জজ ব্যারিস্টারের ঘরে মানায়! কেমন করে এনটারটেন করতে হয় তাও কি জানতুম!'

'আমাকে মাফ করবেন, মিসেস সর্বাধিকারী। আপনার কথা মনে করে বলিনি।'

আমি দুই হাত জোড় করি।

তিনি প্রসন্ন হয়ে অভয় দেন। 'কথাটা কিন্তু ফেলনা নয়, মিস্টার দেব। বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার বাঁদরকেও জীবনের খেলায় জিতিয়ে দেয়। এবার তো সে মুক্তোর হার ছিঁড়ে ফেলে হীরের হার পরেছে। উঠবে। উঠবে। আরো উচুতে উঠবে।'

সর্বাধিকারী, ঘোষাল ও দত্ত তিন বন্ধুতে মিলে বিলেত যান ব্যারিস্টার হতে। সর্বাধিকারী সবচেয়ে জ্ঞানী, ঘোষাল সবচেয়ে ধনী, দত্ত সবচেয়ে চতুর। প্রথম দুজন বিবাহিত।

ঘোষালের বিয়ে হয়েছিল শ্যামবাজারের একটি বনেদী পরিবারে। ও বাড়ির ধনভাণ্ডার শূন্যের কোঠায়, কিন্তু রূপসম্ভার অফুরন্ত। ওদের এক একটি মেয়ে এক একটি ডানাকাটা পরী। তেমনি সামাজিকতায় সিদ্ধহস্ত। দত্তর উচ্চাভিলাষ ওই বাড়ির একজনকে বধূরূপে পাওয়া। কী করে সেটা সম্ভব। ওঁরা ব্রাহ্মণ, এঁরা কায়স্থ। ওঁরা বনেদী, এঁরা ভুঁইফোঁড়। দত্তর রংটাও ফরসা নয়। তবে ওঁর চেহারায় একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিল। কথাবার্তায় মুগ্ধ করে রাখতেন। ইংরেজীতে যখন সওয়াল করতেন ইংরেজ জজসাহেবরাও চমৎকৃত হতেন। বছর পাঁচকের মধ্যেই তিনি তাঁর সমবয়সীদের মাথা ছাড়িয়ে ওঠেন।

ঘোষালের স্ত্রীর নাম সুকৃতি। প্রস্তাবটা দত্ত তাঁর কানেই

তোলেন। তাঁর মেজ বোন সুনীতিকে নাকি দত্ত অনেকদিন থেকে ভালোবাসেন। কিন্তু কথাটা পাড়তে সাহস পান না। প্রত্যাখ্যাত হলে তাঁর মানসম্মান থাকবে না। বন্ধুমহলে হাস্যাস্পদ হবেন। একটি মেয়ে তাঁকে জিল্ট করেছে শুনলে আর কোনো মেয়ে তাঁকে বরমাল্য দেবে না।

সুকৃতির দৌত্য সফল হয়। সুনীতিও রাজী, তাঁর গুরুজনও নিমরাজী। ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিবাহ তো শাস্ত্রীয় মতে সম্পন্ন হতে পারে না। বিয়েটা হলো অবশেষে ব্রাহ্মমতে। হাইকোর্টের জজ থেকে আরম্ভ করে বড়ো বড়ো কৌঁসুলীরা অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। তাঁদের হোমরা-চোমরা মক্কেলরাও। গোঁড়ারা কেউ এলেন না। কিংবা এলেন, অথচ খেলেন না। কনের বাবা মেয়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন। মেয়ের মাও জামাইকে আশীর্বাদ করলেন। দত্তর উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হলো।

সুন্দরী হলেও সুকৃতির মতো সুন্দরী কেউ নয়। না সুনীতি, না সুরুচি। বিধাতা যেন নিখুঁত করে তাঁকে গড়েছেন। কিন্তু যে সমাজে তাঁকে মিশতে হয় সে সমাজে ঘোষালের তেমন প্রতিপত্তি নেই। ব্যারিস্টার হিসাবে তিনি নিচুর সারিতে। তাঁর বাবা রেখে গেছেন অগাধ সম্পত্তি। তিনি তাই ভোগ করছেন। ভোগ বলতে যা যা বোঝায় তার কোনোটিতেই তিনি উদাসীন নন। যদিও ঘরে অমন অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী নারী।

বিবাহের প্রথম দশ বছর সুনীতি ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে তাঁর স্বামীর হৃদয় অন্যত্র ন্যস্ত। সেখানে রানীত্ব করছেন সুকৃতি। ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন যে দত্ত তাঁকে তাঁর জন্যে চাননি, চেয়েছিলেন তার দিদির জন্যে। যাতে দিদির সঙ্গে মেলামেশার পথ সুগম হয়। দিদিও সেটা আঁচতে পারেন নি। দত্তকে তিনি স্বামীর বন্ধু হিসাবেই নিয়েছিলেন, কল্পনাও করতে পারেননি যে আর কোনো সম্পর্ক সম্ভব। প্রথম পরিচয়ের বছর পনেরো বাদে টের পান যে তিনিই তাঁর স্বামীর বন্ধুর হৃদয়ের রানী। তখন থেকে তাঁর প্রজাকে এড়িয়ে থাকতে

চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বামীর মতিগতি দেখে তাঁরও ধারণা জন্মায় যে বিয়েটা ব্যর্থ হয়েছে।

তিন বোনের মধ্যে সুরুচি ছিলেন সব চেয়ে শিক্ষিতা, সবচেয়ে স্মার্ট, সবচেয়ে অ্যাকমপ্লিশড। এ বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না যে ওঁর খুব ভালো বিয়ে হবে। ওঁর কিন্তু পছন্দ রুদ্র বলে এক বয়স্ক ডাক্তার, তিনি আবার খ্রীস্টান। এক বোনের যখন অসবর্ণ বিয়ে হয়েছে তখন আরেক বোনের অসধর্ম বিয়ে হবে না কেন ? মা বাবার মত ছিল না, কিন্তু দাদারা আধুনিক। তাঁদের একজন মেম বিয়ে করেছেন, তার মানে খ্রীস্টান। সেই নজীরে বোনেরও বিয়ে হয়ে যায় খ্রীস্টানের সঙ্গে। স্ত্রীর প্রবর্তনায় স্বামী যান বিলেতে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে। স্ত্রীও সাথী হন। ওখানে গিয়ে সুরুচি তিন চার রকম ট্রেনিং নেন। এমন সময় যুদ্ধ বেধে যায়। রুদ্র দম্পতি দেশে ফিরতে পারেন না। আটকা পড়েন। সেইখানেই তাঁদের একটি মেয়ে হয়।

যুদ্ধের শেষে যখন দেশের জন্যে সুরুচি হোমসিক তাঁর স্বামী বলেন তিনি বিলেতেই বাড়ি কিনে বসবাস করবেন, প্যানেল কিনে প্র্যাকটিস করবেন। দেশের চেয়ে বিলেতেই আরো সুবিধে। আরো বেশী আয়। সুরুচি তাতে সায় দেন না। মেয়েকে যদি ভারতীয় ধরনে মানুষ করতে না পারেন তবে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই নিয়ে যে মতভেদ দেখা দেয় তার নীট ফল হয় ছাড়াছাড়ি। ডাক্তার তাঁর প্র্যাকটিস ছেড়ে তাঁর পেসেন্টদের ফেলে ভারতে আসতে পারেন না। সুরুচি তাঁর প্রতিষ্ঠিত কিণ্ডারগার্টেন ছেড়ে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ফেলে বিলেতে যেতে পারেন না। মিলনের কোনো আশা নেই বুঝতে পেরে দু'জনেই স্থির করেন যে বিবাহ-বিচ্ছেদই শ্রেয়। সুরুচি তার একটা কারণও দেন। যশোবন্ত রাও বলে একজন মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর বিলেতেই আলাপ হয়েছিল। কলকাতায় সেটা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। রাও যখন দিল্লীতে চাকরি পান সুরুচিও তাঁর সঙ্গে যান ও স্বামীকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে. তাঁরা একই হোটেলে বাস করছেন।

ডিভোর্সের পর সুরুচি আইনত মিসেস রাও হন। কিণ্ডার-গার্টেনটা দিল্লীতে উঠিয়ে নেন। রাজধানীতে তার প্রচণ্ড চাহিদা। গীত বাদ্য নৃত্য চিত্রকলা সব কিছুরই সেখানে হাতেখড়ি হয়। নিজের মেয়ের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা ক্লাস জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের জুনিয়ার কেমব্রিজের জন্যে তৈরি করে দিতে পারা যাবে।

এরপরে মেজদি বলেন তিনি ডিভোর্স করবেন তাঁর স্বামীকে। মেয়েকে নিয়ে বিলেত চলে যাবেন ও সেইখানেই বসবাস করবেন। দত্ত তাঁকে যথেষ্ট কারণ দিয়েছিলেন। পরের বৌকে নিয়ে প্রায়ই তো মোটরে করে ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে যাওয়া হত। কান্তি ঘোষাল জানতেন, মোহিত সর্বাধিকারী জানতেন, অন্যান্য ব্যারিস্টার জানতেন। জজসাহেবরাও জানতেন। একদিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে ডিভোর্সের মামলার শুনানী হয়। সুনীতি মুক্তি পান। গৌরহরিও। মনের আনন্দে দত্ত তাঁর ভূতপূর্ব পত্নীকে মুক্তহস্তে নিষ্ক্রয় দিয়ে বিলেত রওনা করে দেন। কন্যাকে দেন মোটা মাসোহারা। আর এদিকে চেষ্টা করেন তাঁর বন্ধু কান্তি ঘোষালকে যথেষ্ট কারণ যোগাতে। যাতে তিনিও আর একটি ডিভোর্সের আবেদন করেন। সুকৃতির বিরুদ্ধে।

সেটা কিন্তু কঠিন ব্যাপার। সুকৃতির বিয়ে তো ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান আইন মতে হয়নি, হয়েছে হিন্দুশাস্ত্র মতে। হিন্দু আইনের সংশোধনের প্রস্তাব শিকায় ঝুলছে। তাতেও এমন কোনো কথা নেই যে স্ত্রী বা স্বামী অন্যের সঙ্গে গেলে বিবাহবিচ্ছেদের কারণ ঘটাবে। শেষপর্যন্ত দত্ত করলেন কী, সুকৃতিকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন পাকিস্তানে। সেই ইসলামী রাষ্ট্রে সুকৃতি ইসলামে দীক্ষা নেন ও স্বামীকে আহ্বান করেন ইসলামের আশ্রয় নিতে। স্বামী সে আহ্বান গ্রাহ্য না করায় তিনি সেই বিধর্মীর সঙ্গে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করেন। ইতিমধ্যে গৌরহরিও কলমা পড়ে তাঁর স্বধর্মী হয়েছিলেন। তাই সহজেই তাঁদের নিকা হয়ে যায়। তার পরে তাঁরা ঢাকা

থেকে কলকাতা ফিরে আসেন। আর্যসমাজীরা তাঁদের বৈদিক মতে শুদ্ধি করেন। নিকাটা যে কেমন করে সিদ্ধ হলো সেটা একটা রহস্য।

ওসব আইনের কথা ছেড়ে দিয়ে মানবিক দিক থেকে দেখলে তাঁরা সত্যি স্বামী স্ত্রী। কলকাতার কসমোপলিটান সমাজ সেটা মেনে নিয়েছে। তাঁদের দেওয়া পার্টিতে সবাই যান। সকলের দেওয়া পার্টিতে তাঁদেরও দেখতে পাওয়া যায়। ক্যালকাটা ক্লাবের তাঁরাই তো প্রাণ। ঘোষাল যে বিশেষ কাতর তাও তো মনে হয় না। বাড়িতে বৌ থাকতে যেটুকু চক্ষুলজ্জা ছিল সেটুকুও এখন নেই। তিনি কিন্তু ইচ্ছা করলেও আরেকটা বিয়ে করতে পারবেন না, কারণ হিন্দু মতে তাঁর বিবাহভঙ্গ হয়নি। লোকচক্ষে সুকৃতি এখনো তাঁর স্ত্রী। এক স্ত্রী থাকতে আরেক স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে। করতে হলে এখনি করতে হয়। বিয়ে না করেও কি সুখী হওয়া যায় না? যদি বান্ধবীর অভাব না থাকে। বৌভাগ্য না থাক, বান্ধবীভাগ্য তো আছে।

দত্ত আবার বিয়ে করেছেন শুনে তাঁর ভূতপূর্ব পত্নী সম্পূর্ণরূপে দ্বিধামুক্ত হন। তাঁর ডাক্তার ভগ্নীপতিও ভূতপূর্ব। দুজনেই নিঃসঙ্গ। প্রায়ই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গসুখ চাইতেন। একদিন তাঁরাও রেজিস্ট্রি করে পুনর্বিবাহিত হলেন। তখন ছায়া বেচারীর মুখে আরো এক পোঁচ কালো ছায়া পড়ল। ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো দিল্লীতে ওর মাসীর কাছে। ও এখন মাসীর ইস্কুলে মাস্টারি করে। ওর দেশী ডিগ্রী আছে, একটু চেষ্টা করলে ভারত সরকারের কোনো একটা বিভাগে কাজ পেয়ে যাবে।

॥ তিন ॥

সুষমা সর্বাধিকারী যখন তাঁর কাহিনী শেষ করেন তখন কৃষ্ণ-পক্ষের চাঁদ উঠেছে। তার ম্লান আলোয় লক্ষ করি ভদ্রমহিলার চোখে জল।

'কেন, আপনার চোখে জল কেন ? কার জন্যে বেদনা বোধ করছেন ? ছায়াও সুখী হবে একদিন। দিল্লী মানেই হিল্লি। মানে হিল্লে। পাঞ্জাবীরাই লুফে নেবে। কলকাতা নয় যে চড়া বরপণ লাগবে। আমি আশ্বাস দিই।

তিনি সান্ত্বনা পান না। 'ছি ছি! মেয়েমানুষের দু-দুবার বিয়ে! জন্মেও শুনিনি। এখন থেকে এটাই কি ডালভাত হবে ?'

আমি আরো কয়েকটা গল্প জানতুম। হিন্দু মতে বিবাহবিচ্ছেদ চলতি হয়নি বলে বেচারীরা কালীঘাটে গিয়ে মনকে চোখ ঠারা গোছের বিয়ে করেছে। তাও তো অনেকে মেনে নিয়েছে। মুশকিল বাধবে ছেলেমেয়ে জন্মালে। জনমত বদলালে আইনও বদলাবে।

একটার পর একটা ট্র্যাজেডী কেমন করে কমেডী হয়ে গেল ভেবে অবাক হয়ে যাই আমি। এমন তো সাধারণত হয় না। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহ কি অত সহজ!

'আমি যতদূর বুঝতে পারছি', আমি মন্তব্য করি, 'পিরান্দেলোর ছ'টি চরিত্রের মতো এঁরাও সাতটি চরিত্র। এরাও একজন নাট্যকারের সন্ধানে ঘুরছেন। এঁদের নিয়ে দিব্যি একখানি নাটক হয়। নাটকের শেষে সাতটি পাত্রপাত্রী মঞ্চের উপর হাত ধরাধরি করে দাঁড়াবেন। প্রথমে ঘোষাল। তার বাঁ হাত ধরে সুকৃতি। তার বাঁ-হাত ধরে দত্ত। তার বাঁ-হাত ধরে রুদ্র। তাঁর বাঁ-হাত ধরে সুরুচি। তাঁর বাঁ-হাত ধরে রাও। সুকৃতির এক হাত ঘোষালের হাতে, আরেক হাত দত্তর হাতে। দত্তর এক হাত সুকৃতির হাতে, আরেক হাত সুনীতির হাতে। সুনীতির এক হাত দত্তর হাতে, আরেক হাত রুদ্রর হাতে। রুদ্রর এক হাত সুনীতির হাতে, আরেক হাত সুরুচির হাতে। সুরুচির এক হাত রুদ্রর হাতে, আরেক হাত রাওয়ের হাতে। বিজোড় কেবল ঘোষাল। আর সবাই জোড়। জোড়দের মধ্যেও রাও ছাড়া আর সবাই দ্বিজোড়।'

মহিলারা শুনে আমোদ পান কি ব্যথা পান বোঝা গেল না। আমি তখন আমার নাট্যকল্পনায় বিভোর। তবে, হ্যাঁ, সন্তানদের বড়ো দুঃখ! আমার নাটকে আমি তাদের আনতে চাইনে। আনলে দর্শকদের চোখে জল আসবে। আর কান্তি ঘোষালকে আমি বিজোড় রাখতে নারাজ। ওঁর বান্ধবীরা কেউ কি ওঁর ডান হাত ধরবেন না?

উত্তরজীবন

সেই সাহিত্যের আসরে বন্ধুবর বিভাসও ছিলেন। তাঁকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলি, "তোমার ধারাবাহিক উপন্যাসের নায়িকার নাম পড়ে আমি চমকে উঠেছিলুম। বাঙালীর মেয়ের বিলিতী নাম তো হাজারে একজনেরও হয় না। মাত্র একজনকেই হয় না। মাত্র একজনকেই আমি চিনতুম যার নাম ডেইজী। পড়তে পড়তে ধরে ফেলি যে এ সেই মেয়ে। পদবীটা তুমি পালটে দিয়েছ, নামটা অবিকল তাই। তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে এদেশে এমন কেউ নেই যে তোমার ডেইজীকে চিনত। কিন্তু ওর পূর্বজীবন সম্বন্ধে কিছুই আমার জানা ছিল না। তোমার লেখা পড়ে আমার চোখের ওপর থেকে পর্দা সরে গেল। সত্যি কী অপূর্ব ছবি তুমি এঁকেছ বিভাস! আমার পূর্ব ধারণা বদলে গেছে। শ্রদ্ধা আমি ওকে আগেও করেছি। কিন্তু পুজা এই প্রথম। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার উপন্যাসের নায়িকা। কার মধ্যে কী মহত্ত লুকিয়ে থাকে তা কি সাধারণ জীবনে প্রকাশ পায়! প্রকাশের জন্যে চাই আকস্মিক কোনো ঘটনা। তুমি ছিলে সেই ঘটনাটির সাক্ষী। তুমি যদি না দেখতে ও না দেখতে তা হলে অর্ধ শতাব্দী পরে আমিও কি দেখতে পেতুম! আচ্ছা, বিভাস ওর পরবর্তী জীবন অবলম্বন করে কিছু লিখবে?"

বিভাস আমার হাতে চাপ দিয়ে বলেন, "ওই ঘটনার পরে ডেইজী বিলেত ফিরে যায়। আমারও তো বিলেত যাবার অভিলাষ ছিল। তা তো আর হলো না। পরবর্তী জীবন আমার অজানা। আমার দৃষ্টিপথ থেকেও সরে যায়।"

"পরে আরেকজনের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল, শোননি ?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"তাই নাকি ! কোথায়, কবে ? ওদেশে না এদেশে ?" বিভাস আশ্চর্য হন।

"এই দেশেই। বছর দশেক বাদে। তখন আমি আবিষ্কার করি যে ওর স্বদেশী নাম সুলেখা। তুমি জানতে ? উপন্যাসের কোনোখানে তো পাইনি।" আমি বলি।

"না, জানতুম না তো। বিলেতে মানুষ হয়েছিল বলে আমার ধারণা ছিল ডেইজী ওর প্রকৃত নাম। সুলেখা। বাঃ। চমৎকার নামটি তো ! জানলে ওই নামটিই ব্যবহার করতুম। এখন কথা হচ্ছে তুমি কি ওর উত্তরজীবন নিয়ে কিছু লিখবে ? জানো যখন এত কথা : তা হলে আমার উপন্যাসেরও পাদপূরণ হতো। কবিতার যেমন পাদপূরণ হতো সংস্কৃত ভাষায় তেমনি উপন্যাসেরও কি হতে পারে না ? একজন খানিকটে লিখে ছেড়ে দেবে, আরেকজন বাকীটা লিখে পূরণ করবে।" বিভাস প্রস্তাব করেন।

আমি যদি কিছু লিখতুম তা হলেও শেষকথা হতো না। ও মেয়ে আমার দৃষ্টিপথ থেকেও সরে যায়। আমি যতটুকু জানি ততটুকু দিয়ে উপন্যাস হয় না। হতে পারে হয়তো একটা ছোটগল্প। কিন্তু তাতে ওর মহত্ত্ব ফোটানো যাবে না। মানুষের জীবনে মহত্ত্বের সুযোগও তো বার বার আসে না। সে সুযোগ জুটিয়ে দেয় নিয়তি। লণ্ডন থেকে যে মেয়ে কলকাতা এল ছুটি কাটাতে সে হয়তো বাগ্‌দত্তা হয়ে বিলেতে ফিরে যেত, যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল সে ছেলেটিও বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার কি সিভিলিয়ান হতো। তার পরে একদিন হতো মধুরেণ সমাপয়েৎ। কিন্তু ঘটল কিনা ঠিক বিপরীত। চাঁদপুরে বেধে গেল কুলীদের ধর্মঘট। তাদের দুর্দশার কাহিনী পড়ে ছেলেটি চলল ভলাণ্টিয়ার হয়ে। ওদিকে চট্টগ্রামে থাকেন মেয়েটির পিতৃবন্ধু। সেখানকার কমিশনার। মেয়েটি যাত্রা করে চট্টগ্রাম অভিমুখে। চাঁদপুরে পৌঁছে খবর পায়

ছেলেটি গুর্খাদের আক্রমণে আহত। মাত্র একদিনের আলাপ। ভালোবাসার সঞ্চার কি অতটুকু পরিচয়ে হয়? তবু দেখতে যায় ছেলেটিকে। অবস্থা দেখে সেবার ভার নেয়। সে কী সেবা! চাঁদপুরে চিকিৎসার সুব্যবস্থা হবে না বলে ছেলেটিকে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। সেখানে হাসপাতালে রাখা হয়। মেয়েটি হাসপাতালেই পড়ে থাকে সেবার ভার নিয়ে। শহরের সেরা বাড়ি হলো কমিশনারের। আরাম করে থাকতে পারত ও বাড়িতে। কিন্তু ছেলেটিকে বাঁচিয়ে তোলাই যে ওর ব্রত। ও যে একালের সাবিত্রী। যমের হাত থেকে কেড়ে আনবে ওর সত্যবানকে। আহা, বেচারী! পুরাণে কি দু'বার ও রকম হয়েছে? ছেলেটি চলে গেল। যাবার আগে জেনে গেল যে মেয়েটি ওকে গভীরভাবে ভালোবাসে। মরণকে শান্তভাবেই বরণ করল। সে মৃত্যুও বীরের মৃত্যু। মহিমময়।" আমি গদ্‌গদ হয়ে বর্ণনা করি।

বিভাস নীরবে শুনে যান। আমি আর একটু জুড়ে দিই। "তোমার কাহিনীর ফাঁকে কী তেজ তুমি ফুটিয়েছ! মেয়েটিও বীরাঙ্গনা। এক স্বদেশীওয়ালার সেবা করাও তো সেদিনকার সাহেবদের চোখে অপরাধ। বিশেষত একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের কন্যার পক্ষে। কিন্তু সাহেবদের মধ্যেও মনুষ্যত্ব ছিল। ওদেরও তুমি মহৎ করে এঁকেছ। মহত্ত্ব থেকে বঞ্চিত করেছ শুধু একজন কমবয়সী বাঙালী সাহেবকে। যিনি ওই গুর্খাদের হুকুম দিয়েছিলেন। মেয়েটির তো ওঁর উপর জাতক্রোধ হবার কথা। কিন্তু শুনে অবাক হবে যে ওই হাকিমই পরে বড়ো হাকিম হন আর যে স্টেশনে তিনি নিযুক্ত হন সেই স্টেশনেই ওরা তিন বোনে দেশে ফিরে এসে তাঁর কুঠিতে অতিথি হয়। ওদের খাতিরে যে পার্টি দেওয়া হয় সে পার্টিতে আমারও ডাক পড়ে। আমিও সদ্য প্রত্যাগত। পরিচয়টা হয়েছিল লণ্ডনে আরো এক পার্টিতে।"

বিভাস সত্যি অবাক হন। "ট্র্যাজেডীর মূলে তো মিস্টার মুস্তফী।"

"বলতে পারো তাঁর জন্যই সতীশের প্রাণটা গেল। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে তাঁকে হুকুম দিতে হয়েছিল সে পরিস্থিতি তো তুমি আমি দেখিনি। পরবর্তী বয়সে লক্ষ্য করেছি তিনি যেমন ন্যায়পরায়ণ তেমনি দয়ালু। প্রথম দিকে হয়তো খুব কড়া ছিলেন। হয়তো জানতেন না গুর্খারা অতখানি নিষ্ঠুর হবে। ঘটনাটার জন্যে নিশ্চয়ই তিনি দুঃখিত। নয়তো ডেইজী, লিলি, আইরিস তাঁর অতিথি হবে কেন? তুমি লিখেছ তাঁর বিয়ের উদ্যোগ হচ্ছে। তাঁর স্ত্রীকে আমি দেখেছি। অতি চমৎকার মহিলা।" আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলি।

"তা হলে ছবিখানাকে সমাপ্ত করার পালা তোমারই।" বিভাস আমার চোখে চোখ রাখেন। তিনি যেন তাঁর প্রথম যৌবনে ফিরে গেছেন।

আমিও ফিরে যাই আমার প্রথম যৌবনে। কিন্তু ছবিটি সমাপ্ত করতে নয়। ওটি অসমাপ্ত।

॥ দুই ॥

"ওহে সুশান্ত, কাল দুপুরে তোমারও নিমন্ত্রণ আছে। আমাদের সঙ্গে যেয়ো! এখানকার বাঙালীদের সবাইকে খেতে বলেছেন মিস্টার ও মিসেস পালিত।" একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে খবর দেন শৈলেনদা। আমাদের গৃহকর্তা।

আমার বন্ধু অনিলেরও নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা সদলবলে যাই। দাদা, বৌদি ও আমরা দুই বন্ধু। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, আরো একজন ছিল। বৌদির ভাই প্রদীপ। লণ্ডনের রাস্তায় শাড়ী অবশ্য প্রায়ই দেখা যেত। ধুতি কিন্তু সেই প্রথম। যতদূর আমি জানি। পালিতরা নাকি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ধুতি পরে আসতে হবে। যে যাই মনে করুক।

পথে সেদিন আমাদের দেখতে ভিড় জমে যায়নি। বরঞ্চ আমরাই ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলুম। মাসটা বোধহয় সেপ্টেম্বর।

আমাদের পক্ষে যথেষ্ট শীত। মেয়েরাই জানে কী করে ওরা শাড়ী পরে কাটায়। ঘরের ভিতরে আমরা মাঝে মাঝে ধুতি পরেছি। ধুতি পরলে বেশ দেশের মতো মনে হয়। তা বলে বাইরে বেরোনো! ইংরেজরা কী ভাববে! ইংরেজ না বলে আমরা বলতুম নেটিভ। নেটিভরা কী ভাববে!

পালিতদের বাড়ি বেশী দূরে নয়। ওই পাড়ারই অপর প্রান্তে। পালিত আমাদের দেশের বিখ্যাত এক নেতার পুত্র। কট্টর স্বদেশী। তাঁর সহধর্মিণীও আর একটি গান্ধারী। তাই নিজ বাসভূমে পরবাসী। শ্বেতাঙ্গিনী হয়েও শাড়ী পরেন। দু'বেলা স্নান করেন। কী শীত কী গ্রীষ্ম। বাংলাও শিখেছেন। বাঙালীর মুখে ইংরেজী শুনলে বাংলায় কথা বলেন। সেদিন আমাদের মধ্যাহ্নভোজন হলো ভারতীয় ধারায়। বসতে হলো মেজেতে আসন পেতে।

একমাত্র ব্যতিক্রম স্যার সুনীল রায়। প্রায় সিকি শতাব্দী ইনি ইংলণ্ড প্রবাসী। রংটাও নেটিভদের মতো ফরসা। আমি তো প্রথমে এঁকে নেটিভ বলেই ভ্রম করেছিলুম। চেয়ারে বসতে বসতে এমন হয়েছে যে মেজেতে এঁর কষ্ট হয়। পালিত তাই এঁকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দেন। রহস্য করে বলেন, "স্যার সুনীল, আপনিই আজকের অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান। বাংলায় বলতে হবে কিন্তু!"

বাংলা উনি ভালোই বলেন। তবে কথায় কথায় ইংরেজীর ফোড়ন দেন। আমরা হাসি চাপি। স্যার সুনীল কিন্তু ভোজনের বেলা বিশুদ্ধ বাঙালী। প্রত্যেকটি পদ চেয়ে নিয়ে খান ও খেয়ে তারিফ করেন। সুক্তো থেকে শুরু করে দই সন্দেশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি তাঁর প্রিয়। পোশাক সাহেবদের মতো, রুচি কিন্তু বাঙালীদের মতো। কাঁটা চামচ সরিয়ে রাখেন। হাত লাগিয়ে না খেলে কি তৃপ্তি হয়!

লেডী রায় ও তাঁদের তিন কন্যার সঙ্গে সেইদিনই আমার পরিচয়। মেয়েদের নামগুলো শুনে আশ্চর্য হই। এঁরা তো খ্রীস্টান নন, তবে

তিন কন্যার নাম কেন ডেইজী, লিলি ও আইরিস? তিনটি প্রসিদ্ধ ফুল। হতে পারে ওঁরা ফুলের মতো দেখতে। বড়ো ও মেজ দুই বোন পেয়েছেন বাপের চেহারা ও রং। ছোটটি মায়ের মতো। অতটা ফরসা নন, তবে আরো সুন্দর। তিনজনই প্রাণবন্ত। তিনজনেই তন্বী। মোটা হয়ে যাবার ভয়ে পেট ভরে খেতেই চান না। একটু মুখে দিয়েই সরিয়ে রাখেন! মা কিন্তু আর তন্বী নন। তবু মোটের উপর সুগঠিতা। আহারে তাঁর অনীহা। পাছে ফিগার নষ্ট হয়ে যায়। কন্যাদের উপর তাঁর প্রখর দৃষ্টি।

নাম ছাড়া কিছুই ওঁদের বিদেশী ছিল না। তবে আজন্ম বা আশৈশব ইংলণ্ডে মানুষ হওয়ার ফলে ইংরেজীই ছিল এঁদের কাছে আরো স্বাভাবিক। মেয়েদের সারিতে ওঁরা আর ছেলেদের সারিতে আমরা মুখোমুখি বসে কখনো বাংলায় কখনো ইংরেজীতে বাক্যবিনিময় করছিলুম। ওঁদের মধ্যে মুখরা ছিলেন আইরিস, একটা কথার উত্তরে দশটা কথা শুনিয়ে দেন। লিলি একেবারেই নীরব। চাউনিটিও করুণ। গড়নটিও রোগা। ডেইজীকে মনে হয় ভারিক্কি। বয়সের তুলনায় গম্ভীর। সমীহ না করে পারিনে। কার কত বয়স বলা শক্ত। তবে আমার অনুমান ডেইজী আমার সমবয়সিনী। আমি তখন পঁচিশ বছরে পড়েছি। কন্যাটির সঙ্গে এই বিষয়ে আমার মিল। আর সব বিষয়ে অমিল বাইরের দিক থেকে। আমি সেইজন্যে বিশেষ আগ্রহ বোধ করিনি। তাঁর সম্বন্ধে যেমন আমি আমার সম্বন্ধে তেমনি তিনি। আগ্রহ যেটা লক্ষ করলুম সেটা তাঁর মায়ের।

তাঁর ভাবে ভরা মোহনীয় বড়ো বড়ো দুটি চোখ তুলে আমার দিকে তিনি তাকান। ভোজের পর কাছে এসে দুটি একটি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমি এখানে কী পড়তে এসেছি, কোথায় পড়ি ইত্যাদির উত্তর দিতে হয়। তা শুনে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে আবার দেখা হবে। তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার একবার পরিচয় হয়েছিল। কলেজের সোশিয়ালে। জানতেন

আমি এখানে কী করি। তিনিও আশা করেন যে দেশে ফিরে যাবার আগে আরো একবার দেখা হবে।

সন্ধ্যাবেলা শৈলেনদা দুষ্টু হাসি হেসে বলেন, "কি হে! রানীকে কেমন লাগল?"

"রানী? কোন্ রানী?" আমি তো বিমূঢ়।

"লেডী হবার আগে রানী ছিলেন যিনি।" তিনি রহস্যময় করে বলেন।

বৌদি আমাকে বুঝিয়ে দেন যে লেডী রায় একদা রানী কিরণময়ী ছিলেন। দেশের লোক এখনো তাঁকে সেই নামেই চেনে।

আমার মনে পড়ে যায় যে ছেলেবেলায় রানী কিরণময়ীর কবিতার বই আমি দেখেছি। সোনার জলে নাম লেখা। ইনি কি তিনি?

"তিনিই। বাল্যকালে জমিদারের ঘরে বিয়ে হয়েছিল। তাদের রাজা খেতাব। পনের ষোল বছর বয়সে বিধবা হন। চোখের জলে কবিতা লিখে দেশবাসীকে অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে দেন। বছর পঁচিশ বয়স যখন, তখন ঘটে যায় এক অঘটন। রাজবাড়ির প্রাচীর টপকে রানী পালিয়ে যান গঙ্গার ধারে। সেখান থেকে জাহাজে করে বিলেত। যাঁর সঙ্গে ইলোপ করেন তিনি রাজা না হলেও রাজশ্যালক। অবশ্য সেই রাজার নয়। বিলেতে তাঁদের বিয়ে হয়ে যায়। পারিবারিক প্রভাবে চাকরিও জুটে যায়। বিলেতেই তাঁরা বসবাস করেন। মহাযুদ্ধের সময় তাঁদের বহুমূল্য সহযোগিতার প্রতিদানে তাঁরা হন স্যার সুনীল ও লেডী রায়।" শৈলেনদা বলেন ফুর্তি করে।

বৌদি বলেন, "বিলেতে বাস করে সবই মিলে যায়। মেলে না কেবল জামাই। তার জন্যে তাঁরা দেশের মুখাপেক্ষী। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে দেশে যাওয়া আসা করতে হয়। মেয়ে তিনটি এখনো পাত্রস্থ হয়নি বলে বাপমায়ের মনে যা দুঃখ তা বাঙালী বাপমায়েরই মতো। তার জন্যে তাঁরা বাঙালীয়ানা করতেও রাজী। নয়তো সাহেবিয়ানায় তাঁদের জুড়ি নেই। শুনলে তো তিন বোনের নাম।

আচ্ছা, সুশান্ত, কোন্‌জনাকে তোমার সব চেয়ে পছন্দ? যদি কিছু মনে না করো।"

জানতুম বৌদির কোথায় দুর্বলতা। আমার জন্যে তিনি সম্বন্ধ করতে চান, কতকটা মেয়েলী শখের খাতিরে। আগেও করেছেন।

আমি কি সহজে ধরাছোঁয়া দিই! জানি যে একজনকে কথা দিলে আর কারো প্রেমে পড়া যায় না। আমার প্রেমের স্বাধীনতা আমি বিবাহের জন্যে বিকিয়ে দেব? কিন্তু বৌদি তা শুনে রাগ করবেন। বলি, "সবাইকে আমার সবচেয়ে পছন্দ।"

দাদা হোহো করে হেসে ওঠেন। "তার মানে তুমি সকলের সঙ্গেই ফ্লার্ট করতে চাও? তারপর দেশে ফিরে গিয়ে গুরুজনের নির্বন্ধে লক্ষ্মীছেলের মতো বিয়ে।"

"ধিক, ধিক, সুশান্ত। ধিক তোমাকে।" বৌদি সে হাসিতে যোগ দেন।

"এমন সুযোগ হাতে পেয়েও তুমি হাতছাড়া করলে। ওদের একজনকে বিয়ে করলে তুমি কত উঁচুতে উঠতে। তোমার শাশুড়ী হতেন রানী বা লেডী। তোমার পিসশাশুড়ী হতেন মহারানী। বাকিংহাম প্যালেস থেকে তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ আসত। ভাইসরয়েস হাউস থেকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ। গভর্নমেণ্ট হাউস থেকে ডিনারের নিমন্ত্রণ। বিশ বছর যেতে না যেতে তুমি হতে স্যার সুশান্ত ঘোষ।"

এর পরেও যতবার ও প্রসঙ্গ উঠেছে বৌদি বলেছেন, "এই ছেলে! এখনো সময় আছে। বলতো চেষ্টা করি। কিন্তু কোন্‌টিকে তুমি চাও?"

"কোন্‌টি আমাকে চায়?" আমি পাল্টা প্রশ্ন করি।

তিনি এর জবাব দিতে পারেন না। বলেন, "খোঁজ নেব নাকি?"

"কাজ কী, বৌদি?" আমি সিরিয়স হয়ে বলি, "চাকরি করলেও চাকরিতে বেশীদিন আমি থাকব না। একথা শুনলে কোন মেয়েই

আর আমাকে চাইবে না। এঁরাও না। কাউকে মিথ্যে আশা দেওয়া উচিত নয়। দেখবেন, এঁদের প্রত্যেকেরই ভালো বিয়ে হবে। যা যা পেলে মেয়েরা সুখী হয় প্রত্যেকেই তা পাবেন। আমাকে বাদ দিন।"

॥ তিন ॥

বছরখানেক বাদে আমার বিলেতের মেয়াদ সারা হয়। আমি দেশে ফিরে আসি ও কলকাতার অদূরে একটি জেলায় নিযুক্ত হই। মুস্তফী সাহেব ছিলেন তখন সেই জেলার উচ্চ পদে। একদিন তাঁর ওখানে কল করি। মিসেস মুস্তফীর সঙ্গেও আলাপ হয়।

আমার অপর বন্ধু হেমন্ত কিছুদিন পরে আমার সঙ্গে যোগ দেন। তিনিও সেইখানে নিযুক্ত। আমরা মাঝে মাঝে মুস্তফীদের ওখানে নিমন্ত্রিত হই। আমরা জুনিয়র, তাঁরা সিনিয়র। আমাদের সভ্য-ভব্য করে তোলার অলিখিত দায়িত্ব তাঁদেরই। টেনিস তো আমরা একসঙ্গে খেলিই। ক্লাবে গিয়ে সামাজিকতাও করি।

হঠাৎ একদিন মিসেস মুস্তফী আমাদের দুই বন্ধুকে সন্ধ্যাবেলা যেতে বলেন। কলকাতা থেকে তাঁর বন্ধুরা এসেছেন। তাই একটু আনন্দের আয়োজন করেছেন। আমরা যদি না যাই তবে তিনি বিমর্ষ হবেন।

গিয়ে দেখি—ওমা, সেই তিন কন্যা! ডেইজী, লিলি, আইরিস। পরস্পরকে আমরা চিনতে পারি! তা দেখে মিসেস মুস্তফী বলেন, "বিলেতে আলাপ ছিল বুঝি? তা হলে আমাকে আর পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না।"

তবে হেমন্তকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। তিনি থাকতেন কেমব্রিজে। তাই লণ্ডনে আলাপের সুযোগ হয়নি।

সন্ধ্যাবেলাটা কাটল কতরকম পারলর গেম খেলে। শেষে একসময় দেখি নাচ শুরু হয়ে গেছে। গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজিয়ে।

জনাকয়েক সাহেব মেম সে আসরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরই উৎসাহ বেশী। মুস্তফীরাও কম যান না।

আর কুমারী রায়রাও। নাচতে গিয়ে তাঁরা দেখেন পার্টনার কম পড়ছে। দু'জন পুরুষ সাংখ্যের পুরুষের মতো নিষ্ক্রিয় বসে আছে। হেমন্ত আর আমি। নাচতে আমরা জানিনে। সে বিদ্যা শিখিনি। শিখতে আমি চেয়েছিলুম। শৈলেনদা ও বৌদি শিখতে দেন নি। হাসাহাসি করেছেন।

নাচের জন্যে নারীর কাছে প্রার্থী হওয়া পুরুষেরই কর্তব্য। আমরা আমাদের কর্তব্য করিনি। আর সহ্য করতে না পেরে আইরিস আমাদের সম্মুখীন হন। বলেন, "ও কী! আপনারা বসে আছেন কেন? নাচবেন না?"

লজ্জা পেয়ে হেমন্ত বলেন, "আমার মাথা ভীষণ ধরেছে।"

আইরিস আমার দিকে তাকাতেই আমি বলি, "আমারও।"

"মানুষ তো মাথা দিয়ে নাচে না।" শ্লেষের সঙ্গে মন্তব্য করেন আইরিস। তারপর আমাদের উপেক্ষা করে চলে যান।

ডেইজীর সাথী জুটেছিল। কে একজন ইংরেজ। জোটেনি বেচারী লিলির। ওই মেয়েটি এত লাজুক! আর আইরিসের। যে সব চেয়ে উদ্দাম। একটু পরে লক্ষ্য করি ওই দুই কন্যা দু'জনে দু'জনের হাত ধরাধরি করে নাচছে। নাচের আসরে ওটাও অনুমোদিত। তবে দৃষ্টিকটু। বিশেষত দু'জন পুরুষ মানুষ বেকার বসে থাকতে।

ডিনার টেবিলে আমাদের দুই বন্ধুর মাঝে ডেইজী। আমার ডানদিকে আইরিস আর হেমন্তর বাঁদিকে লিলি। কথাবার্তা যৎসামান্য হলো। তাও হালকা বিষয়ে। বিলেতের সেই মধ্যাহ্নভোজের প্রসঙ্গ তুলি। কন্যারা সেদিনকার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে সুখী হন।

শুনলুম স্যার সুনীল ও লেডী রায় ওদেশের পাট চুকিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছেন। অবসর গ্রহণের পর বাকী জীবনটা স্বদেশেই কাটাবেন। কলকাতায় ওঁদের পৈত্রিক ভবন। এখন ওঁরা সেই-

খানেই থাকবেন। তবে পঁচিশ বছর ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বাস করার ওর গরমকালটা হয়তো সহ্য হবে না। দার্জিলিং-এ বাড়ি কিনতে চান।

বয়সের অনুপাতে ডেইজীকে বেশ পরিণত মনে হলো। স্বভাবটা চটুল নয়। জীবনে এমন কিছু উপলব্ধি করেছেন যেটা অদৃশ্য এক ছাপ রেখে গেছে। তা বলে কি তিনি হাসবেন না, খেলবেন না, নাচবেন না? করবেন সব কিছুই, কিন্তু সংযতভাবে। যৌবনেরও তো একটা দাবী আছে। তখন অবশ্য ঘুণাক্ষরেও আমি জানতুম না যে সাত বছর আগে প্রিয়জনকে তিনি হারিয়েছেন। বোধ হয় সেই দুঃখ ভুলতে না পেরে এতদিন অনূঢ়া রয়েছেন।

ডিনারের পর আরো এক দফা নাচ গান খেলা। কিন্তু আমার বন্ধু হেমন্তর সত্যি মাথা ধরেছিল। আমরা দুই বন্ধু বিদায় নিয়ে উঠে আসি। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের দশা হয়েছিল হংসো মধ্যে বকো যথা। ওঁরা বিবাহযোগ্যা কুমারী, আমরা বিবাহযোগ্য কুমার। তা নইলে কেই বা আমাদের ডাকত! পার্টিটা ছিল ওই তিন কন্যারই খাতিরে। সেদিক থেকে আমাদেরই স্থান অগ্রগণ্য। অথচ আমরাই বেখাপ।

বিবাহের স্বাধীনতা আমার বন্ধুর ছিল না। সে ভার বন্ধুর পিতা স্বহস্তে নিয়েছিলেন। সে স্বাধীনতা আমার ছিল। আমার পিতা সে দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি চেয়েছিলুম বন্ধনহীন থাকতে। তাই ডেইজীর আকর্ষণ অনুভব করিনি। আর দু'জনের কথা তো ভাবাই যায় না। তিনজনের মধ্যে পার্সনালিটি ছিল প্রথমারই। তা ছাড়া একথা গোপন রেখে কী হবে! আমার হৃদয় ছিল অন্যত্র ন্যস্ত। যদিও অন্যজনের সঙ্গে পরিণয়ের সম্ভাবনা ছিল না।

পরের দিন ক্লাবে টেনিস খেলতে গিয়ে দেখি—ডেইজী। কয়েক সেট খেলা গেল। প্রত্যেকবারই আমার বিপরীত দিকে তিনি। তাঁর সাথী কখনো মুস্তফী, কখনো টমসন, কখনো আলী। আমার

সাথী কখনো হেমন্ত, কখনো মিসেস মুস্তফী, কখনো কখনো মিস মরিস। ডেইজীই বার বার জেতেন। সমস্তক্ষণ লাফিয়ে লাফিয়ে খেললেন। কী শক্তি! কী একাগ্রতা! কী কৌশল! নিশ্চয়ই ইংলণ্ডে তালিম নিয়েছেন।

টেনিসের পর এক সঙ্গে বসে একটু নরম পানীয় পান করা গেল। আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানালুম। তিনি পরিহাস করে বলেন, "নাচলেন না তো? নাচলে দেখা যেত কার গায়ে কত জোর।"

সেই শেষ দেখা। শেষ কথা "গুড বাই।"…

রায়েরা দেশে ফিরে এসেছিলেন মেয়ে তিনটির বিয়ে দিতে। একবছর কি দু'বছর পরে একদিন শুনতে পাই ডেইজীর বিয়ে হয়ে গেছে। তখনি জানতে পারি যে ওঁর আসল নাম সুলেখা। সুলেখা রায়ের বিয়ে মিলন মজুমদারের সঙ্গে। মিলনও বহুদিন বিলেতে ছিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হয়নি। এখন তিনি দিল্লীতে বড়ো চাকুরে। বড়লাটের দলবলের সঙ্গে সিমলায় গ্রীষ্মকাল কাটান। বিলেতের আমেজ পান। তা নয় তো বাংলাদেশের মহকুমা হাকিম হয়ে গ্রাম্যদের সঙ্গে গ্রাম্য বনে যাওয়া! খুব বেঁচে গেছেন সুলেখা! আমি তাঁর মনোনয়নের তারিফ করি। মনে মনে অসংখ্য শুভকামনা জানাই।

তারপর কর্মচক্রে পড়ে ভ্রাম্যমাণ আমি কারো কোনো খবর রাখিনে। না সুলেখার, না লিলির, না আইরিসের, না লণ্ডনে দেখা ও চেনা অন্যান্য তরুণীর। না রাখার আর একটা কারণ ইতিমধ্যে আমারও বিয়ে হয়ে গেছে। অন্য নারীতে আমারও আগ্রহ নেই। বিবাহিত পুরুষে অন্যেরও আগ্রহ নেই। প্রেম এখন একের মধ্যে স্থিতি পেয়েছে। সে আর প্রজাপতির মতো চঞ্চল নয়।

কে জানে ক'বছর বাদে একদিন পুরোনো এক আলাপীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। লণ্ডনের সেই মধ্যাহ্নভোজনের প্রসঙ্গ ওঠে। কে কোথায় আছে, কার সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছে ইত্যাদি সমাচার জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে যা শুনি তা আমার অজানা।

"আচ্ছা, ডেইজী কেমন আছেন?" আমি শুধাই।

"ডেইজী।" তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হন।

"হ্যাঁ, ডেইজী। যার আসল নাম সুলেখা।" আমি মনে করিয়ে দিই।

"তুমি জানো না?" তিনি করুণ স্বরে বলেন, "ডেইজী চলে গেছেন অনেকদিন আগে। বিয়ের পরে মা হতে গিয়ে।"

আমি যদি ল্যাণ্ডর হতুম আর একটি 'রোজ এলমার' লিখে সুলেখা রায়কে অমর করে দিতুম। আমার বন্ধু যে উপন্যাস লিখেছেন এতে আমি আনন্দিত।

অমৃতের সন্ধানে

যাতে আমি অমৃত না হব তা দিয়ে আমি কী করব ? মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন। সেই প্রশ্নই কি ঘুরে ফিরে এল নতুন এক অর্থ নিয়ে একালের এক পুরুষের মুখে ?

সন্তানও তো মানুষকে অমৃত করে। সন্তানের মধ্যেই সে বাঁচে। যাতে আমার সন্তান না হবে তা দিয়ে আমি কী করব ? শুধু শুধু স্ত্রীসঙ্গ করে কী হবে ?

প্রশ্নটা আমার এক পুরাতন বন্ধুর। হঠাৎ দেখা হয়ে যায় ওর সঙ্গে ত্রিশ বছর বাদে এক বিয়েবাড়িতে। চেনা চেনা ঠেকে। কিন্তু চিনতে পারিনে। দারুণ মুটিয়েছে। নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, "কামাল পাশা জোরদার। বকসিং। মোটরসাইকেল। হাইগেট। এবার চিনতে পারলে ?"

"আরে তুমি ! ডেয়ার ডেভিল জো !" আমি ওকে জড়িয়ে ধরি।

চেহারাটা ছিল ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি এক মূর্তি। মাংসল নয়, মাসকুলার। আহারে ছিল অত্যন্ত সংযত। কিন্তু বিহারে ? পরে বলব।

ও যখন আসত তখন ঝড় ডাকত। ওর ওই যানটার বিকট আওয়াজ শুনে আমার কাব্যের ঘোর কেটে যেত। ল্যাণ্ডলেডী এসে দরজার টোকা দিয়ে বলত, 'মিস্টার ডে, ইয়োর ফ্রেণ্ড মিস্টার জো।"

"দেশের হালচাল কী ? খবরের কাগজ কোথায় ?" কমলাপ্রসাদ জোয়ারদার আমার গত মেলের সাপ্তাহিক ও অর্ধসাপ্তাহিক ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকা সামনে ধরে সিগার টানত। যাবার সময় আমার ভাঁড়ার লুট করে এলাচ লবঙ্গ দালচিনি সুপুরি পকেটে

পুরত। আর তার পরিবর্তে আমাকে দিত চকোলেট টফি টার্কিশ ডিলাইট।

"কার জন্যে এসব দিচ্ছ?" আমি অনুযোগ করি।

"তোমার জন্যে নয়, তোমার গার্লসের জন্যে।" বহুবচন ব্যবহার করে।

"যার না আছে মোটরসাইকেল, না আছে মোটর তার গার্লস আসবে কী দেখে? আচ্ছা, রেখে যাও। পাড়ার ছেলেমেয়েদের দিয়ে ভাব জমাব।" ধন্যবাদ দিই।

বকসিং ছিল ওর ব্যাসন। তার থেকে নাকি বেশ দু পয়সা রোজগার করত। সেটা খরচ হতো গার্লসের পেছনে। আর গার্লসও ওর পেছনে প্রায়ই লেগে থাকত। মানে ওর মোটর-সাইকেলের পিলিয়নে চড়ে বেড়াত। ও যখন ঝড়ের বেগে ওর রথ চালিয়ে যেত তখন মনে হতো রুক্মিণী কি সুভদ্রা হরণ করছেন কৃষ্ণ কি অর্জুন। রংটাও তেমনি কালো। আহা, যেন ব্ল্যাক-বোর্ডের পিঠে চকখড়ি।

এক একদিন দেখতুম ওর মেজাজ খুব খারাপ। তাই মুখও তেমনি খারাপ। বোধহয় বকসিং-এ হেরেছে। "আই শ্যাল ব্লাডি নক আউট হিজ ব্লাডি জ।" আরো কী কী বলে যেত বকসারদের পরিভাষায়। পাঞ্চ করত না কী করত। এমন সব স্ল্যাং উচ্চারণ করত যা আমার অবোধ্য।

"ও কী! তোমার খোঁতা নাক যে ভোঁতা করে দিয়েছে, ভাই!" সমবেদনা জানাই।

"ড্যাম ইট! হী-ব্যাচেলারস ডোণ্ট কেয়ার!" ও বুক ফুলিয়ে বলে।

ব্যাচেলার তো এমনিতেই পুরুষ। হী-ব্যাচেলার আবার কী! আমি ওর ভাষার ছিদ্র ধরলে ও হেসে বলে, "যাদের ভাষা তাদের শুধাও।"

একবার ও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় হাসপাতালে শয্যাশায়ী

হয়। আমি যাই দেখতে ও সমবেদনা জানাতে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। একটা চোখ বাঁধা। তবু বলে, “কিচ্ছু হয়নি। একটা গেলেও আরেকটা চোখ তো থাকবে। হী-ব্যাচেলরস ডোন্‌ট কেয়ার।”

কারো কারো ধারণা জোয়ারদারের জন্যে দেশের ছেলেদের বদনাম হচ্ছে। ছাত্ররাই দেশের রাষ্ট্রদূত। কিন্তু ওর যারা পক্ষপাতী তারা বলত, “বকসিং-এর ছলে সাহেবের বাচ্চাদের ও যত পিটিয়েছে আর কেউ কি তা পেরেছে? ও যখন দেশে ফিরবে দেশের লোক ওকে বীরের অভ্যর্থনা জানাবে।”

“কিন্তু এর ফলে দেশে ওর চাকরি জুটবে না দেখো। ওইসব মার খাওয়া বিটকেলরাই তো ওর বস হবে।” বিপক্ষপাতীরা বলত।

দেশে ফিরে ওর সত্যি চাকরি জোটাতে কষ্ট হয়েছিল। তবে ইংরেজদের মধ্যে স্পোর্টসম্যানও তো ছিল। কাজের লোক বলে ও কাজ পেয়ে গেল ঠিক, কিন্তু ওর মাথার উপর দিয়ে প্রমোশন পেয়ে গেল যত সব সরাসরি বিলেত থেকে আমদানী গোরা। ওকেই তখন “সার” “সার” করতে হলো। মাথা কাটা যায়।

বিলেত থেকে ফিরে আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়ি। কেউ কারো খবর রাখিনে। বছর পাঁচেক বাদে দেহরাহুনে ওর সঙ্গে মুখোমুখি। আমি তখন ছুটিতে। সঙ্গে স্ত্রী পুত্র। 'ও আমাকে ধরে নিয়ে যায় ওর বাংলোয়। আলাপ করিয়ে দেয় ওর স্ত্রীর সঙ্গে। একদিন সবাই মিলে মুসৌরি ঘুরে আসি ওর গাড়িতে করে। সেইখানেই স্থির হয় যে আস্ত একটা দিন আমরা একসঙ্গে কাটাব ওদের বাংলোয়। প্রাতরাশ থেকে নৈশভোজন পর্যন্ত সব একসঙ্গে হবে। রাঁধবেন দুই গৃহিণী মিলে।

সেদিনকার অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়। যা মুখে দেওয়া গেল তার জন্যে নয়, যা কানে এল তার জন্যে।

মধ্যাহ্নভোজনের পর আমার একটু গড়ানো অভ্যাস। আমি পাশের ঘরে শুয়ে নভেলের পাতা ওলটাই। জোয়ারদার বেরিয়ে

যায় অফিসে। রবিবারেও ওর ডিউটি থাকে। ড্রইংরুমে বসে মহিলারা খোসগল্প করেন। কখন এক সময় ওঁরা মিতা পাতিয়েছেন। মিতার কাছে মিতার গোপনীয় কী আছে! চাপা গলায় কথাবার্তা। তা হলেও আমার কানে আসে টুকরো কথা। কিছু বুঝি কিছু বুঝিনে।

পম্পা তাঁর স্বামীর বিলেতের ডায়েরি আবিষ্কার করেছেন। বিহারের বিবরণী। টেলিগ্রাফের ভাষায়। পাতায় পাতায় মেয়েলী নাম। এখানে ওখানে চার অক্ষরের একটি শব্দ। কলেজ শিক্ষিতা কন্যা পম্পা। তাঁর কাছেও ওটা গ্রীক।

আমার ইনি বলেন একটু হেসে, "এল দিয়ে আরম্ভ। ই দিয়ে শেষ।"

"না, মিতে। এটা কে না জানে!" পম্পার কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

"তবে কে দিয়ে শুরু। এস দিয়ে সারা!" মিতে হেসে ওঠেন।

"না, মিতে। ওটাও তো অজানা নয়।" পম্পার স্বরে উত্তেজনা।

মিতেও গম্ভীর। বলেন, "তা হলে কী দিয়ে আরম্ভ?"

"এফ দিয়ে।" পম্পার কণ্ঠস্বর কম্পিত।

আর শেষ?" মিতে যেন বিব্রত।

পম্পা অস্ফুট স্বরে কী বলেন তা শুনতে পাইনে।

মিতে জানতেন না। চারটে অক্ষরই তাঁকে শোনাতে হলো। তখন ডিকসনারীর খোঁজ পড়ল। শব্দটাই নিখোঁজ।

আমারও সেটা জানা ছিল না। ভেবেছিলুম বকসিং-এর পরিভাষা। ড্রইংরুমে আমার যখন ডাক পড়ে আমি বলি, "ওটা একরকম প্যাঁচ।"

দীর্ঘকাল পরে ডি এইচ লরেনসের লেডী চ্যাটারলি নিয়ে যখন বিলেতে মামলা বেধে যায় তখন বিলিতী রিপোর্টে চার অক্ষরী শব্দটার উল্লেখ দেখে ও তার অর্থ বুঝতে পেরে আমি শিউরে উঠি। আমার মনে পড়ে যায় দেহরাদুনের সেই দুপুর। কী লজ্জা! "মা ধরণী—"

তা বলে ওর রেকর্ড রাখে কেউ ? রাখলে বিয়ের আগের দিন আগুনে পোড়ায়। একমাত্র টলস্টয় দিয়েছিলেন তার ভাবী বধূকে তাঁর ডায়েরি। কাউনটেস ক্ষমা করলেন, কিন্তু ভুললেন না। শেষ জীবনের অশান্তির সেটাও একটা নিদান।

ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে ভাবিনি। বিয়েবাড়িতে দুজনের সঙ্গেই দুজনের পুনর্দর্শন। আবার একটা দিন ফেলা গেল আস্ত একটা দিনযাপনের। কলকাতার বাড়িতে। জোয়ারদার রিটায়ার করে কাজকর্মের অভাবে মুটিয়ে গেছে। ওর স্ত্রী কিন্তু তেমনি

॥ দুই ॥

এর পরে একদিন জোয়ারদার আমাকে ওর ক্লাবে আমন্ত্রণ করে। প্রথমে হবে বিলিয়ার্ডস। তারপরে ডিনার। মিসেসদের বাদ দিয়ে।

খেলার ফাঁকে ফাঁকে আমরা এক কোণায় বসে গল্প করি। আর গলাটা ভিজিয়ে নিই। আমারটা নরম পানীয়, ওরটা হুইস্কি।

"মনে করো আমি সেদিনকার সেই জো। আর তুমি সেই ডে।" জোয়ারদার বলে। "তোমার কি মনে আছে একদিন মোটর সাইকেল অ্যাকসিডেনট বাধিয়ে আমি হাসপাতালে যাই ? মাথায় চোট। চোখেও আঘাত।"

"মনে আছে বইকি। আমি তোমাকে দেখতে যাই। এক নার্স ভদ্রতা করে অনুমতি দেয়। আরেক নার্স অভদ্রতা করে তাড়িয়ে দেয়।" আমার মনে পড়ে।

"সেই দুর্দিনে আমার বন্ধুদের পরীক্ষা হয়ে গেল। কে কে দেখতে এল কে কে এল না সব নোট করে রেখেছি। তুমি এসেছিলে এর মানে তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু। তোমার মতো প্রকৃত বন্ধু আমার বেশী ছিল না। তবে একজন ছিলেন তিনি বন্ধুর বাড়া।

ফ্রেণ্ড ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড।" জোয়ারদার দুই হাত তুলে প্রণাম করে।

"কার কথা বলছ?" আমি জিজ্ঞাসু হই।

"নিত্যদাকে তোমার মনে নেই?" সে মনে করিয়ে দেয়।

"আছে বই কি। দেশেও তো তাঁর সঙ্গে এক কলেজে পড়েছি। তিনি ছিলেন বছর কয়েকের সিনিয়র। জাঁদরেল গোছের চেহারা। ভারিক্কি চালচলন।" মনে পড়ে। আরো মনে পড়ে দেশে ফিরে এসে তাঁর কী হলো। কিন্তু বলিনে।

"সেই নিত্যদাই আমাকে দিয়ে সত্য করিয়ে নেন যে আমি যেন মেয়েদের পেছনে না ছুটি। আমি অক্ষরে অক্ষরে সত্য রক্ষা করেছি। মেয়েদের পেছনে ছুটিনি। কিন্তু ওরা যদি আমার পেছনে ছোটে যদি আমার মোটরসাইকেলের পিলিয়নে চেপে বসে ও আমার তপোভঙ্গ করে তা হলে আমার ওটা কি সত্যভঙ্গ? দ্যাখ, ডে, এক একজন পুরুষ থাকে তাদের শরীরটা ইস্পাত। কিন্তু মনটা একতাল জেলি। জানি, নিত্যদার কাছে আমি অপরাধী। সত্যি, আমার বড়ো দুঃখ হয় যে কথা দিয়ে আমি কথা রাখিনি। ইচ্ছে করে নিজেকে নিজের হাতে চাবকাতে। কিন্তু লাভ কী হবে? কৃতকর্ম তো অকৃত হবে না। নরকেই যেতে হবে আমাকে। কেউ আমার সঙ্গে যাবে না। সহধর্মিণীও না।" ওর গলা ধরে আসে।

তখনই কিছু কিছু আঁচ করেছিলুম। পরে তো সেই ডায়েরিই ওর কনফেসন। ক'জনের এমন বুকের পাটা যে, যা করবে তা লিখবে!

"ডে, ওল্ড ডে!" জোয়ারদার সেনটিমেনটাল হয়ে পড়ে। "মাই ট্রু ফ্রেণ্ড! আমার জন্য হাসপাতালে গিয়ে নার্সের কাছে তাড়া খেতে হলো। তোমার কাছে কত কী গোপন করেছি। এখন আর কী হবে? ষাট বছর পার হয়েছি। আর কদ্দিন বাঁচব! মানুষ বাঁচে তাঁর সন্তানের জন্যে। আত্মাই পুত্র হয়ে জন্মায়। পুত্রের মুখে আপনাকে দেখে। ও যেন একখানি আয়না।"

আমি নীরবে শুনে যাই। খেলতে আর উৎসাহ বোধ করিনে।

"অনেক সময় মনে হয় সেই যে নিত্যদার কাছে সত্যভঙ্গ এই তার শাস্তি। যেন শত্রুকেও পেতে না হয়। সন্তান যে কী তা তোমরা কী বুঝবে যাদের উপরে ষষ্ঠীর কৃপা! তোমরা পরিবার পরিকল্পনা বিধান দিচ্ছ, কিন্তু পরিবার যার আদপেই হলো না তার জন্যে তোমাদের কী বিধান? কোথায় তোমার বিজ্ঞ' ? কিসে আমি আনফিট? কেন আমি আমার সন্তানের মধ্যে সারভাইভ করব না?" ও ঘুষি বাগায়। যেন আমিই ওকে আনফিট বলেছি।

"পূজা-আর্চা মন্ত্র-টন্ত্র সন্ন্যাসী ফকির মাদুলি তাবিজ মানত উপবাস কী না করেছি! কোথায় না গেছি! সাধুর আশ্রমে পীরের দরগায়! তীর্থে তীর্থে ঘুরেছি। শেষে গেলুম তোমার ভিয়েনা। স্পেশালিস্টরা আমাদের দুজনকেই পরীক্ষা করলেন। বললেন, পারফেকটলি নরম্যাল। হচ্ছে না, জাস্ট ব্যাড লাক। হবে, যদি পার্টনার পরিবর্তন করি।" জো গোপনীয়ভাবে বলে।

"হ্যাঁ, সে রকমও দেখা গেছে।" আমি এক্স ওয়াই মুখার্জির কাহিনী বলি। ওঁর স্ত্রী নালিশ করেন যে উনি পুরুষত্বহীন। মুখার্জি প্রতিবাদ করেন না। বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। পরে আবার বিয়ে করেন। দুটি ছেলেমেয়ে হয়। কী চমৎকার দেখতে! ওদিকে ওই মহিলাটিও আবার বিয়ে করেন। ওঁর কিন্তু ছেলেমেয়ে হয় না। বোধহয় চান না।

"কিন্তু উল্টোটাও তো হতে পারত। তখন আমি মুখ দেখাতুম কী করে! পম্পা অবশ্য পরম পতিব্রতা। ও কখনো অমন কাজ করত না। ও বলে যার অদৃষ্টে যা আছে তাই তো হবে। এসব কি মানুষের হাতে? আমি কিন্তু পুরুষকার মানি। আমি যে পুরুষ। আমি জানি পার্টনার পরিবর্তন করলে ফল হতো। কিন্তু না হলে তখন কী হতো? মিথ্যে কেন এমন সুখের নীড় ভেঙে দিতুম?" জোয়ারদার উদাসভাবে বলে।

আমি বলি, "ঠিকই করেছ। অনিশ্চিতের জন্যে নিশ্চিতকে ছাড়তে নেই।"

"থাঙ্ক ইউ, ডে। কেউ কেউ কিন্তু ও রকম পরামর্শ দিয়েছিল। তখন তো হিন্দু আইন বদলায়নি। পম্পা থাকতেও আমি আর একটি বিয়ে করতে পারতুম। তবে আমার আশঙ্কা ছিল যে পম্পা একালের মেয়ে, সেই হয়তো আমার নামে নালিশ করবে যে আমি ইমপোটেন্ট। আমি যে ইমপোটেন্ট নই তার একঝুড়ি প্রমাণ আছে। লিখিত প্রমাণ। কিন্তু লোকে বিশ্বাস করবে কেন, যখন দেখবে আমি উৎপাদনে অক্ষম ? কিন্তু সত্যি কি তাই !" ও বলে ধাঁধার মতো করে।

"তার মানে ?" আমি ধাঁধার জবাব চাই।

"তুমি কি জানতে যে গ্রেট বিটেনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি আমি মোটর সাইকেল চালিয়েছি ? জন ও, গ্রোটস থেকে ল্যাণ্ডস এণ্ড। কত জায়গায় রাত্রি বাস করেছি। নির্জনে কোণ দেখে বিশ্রাম করেছি। একা নয় বুঝতেই পারছ। কোথাও কি কোনো চিহ্ন থেকে যায়নি ? এই হলো আমার জিজ্ঞাসা। এর উত্তর পাবার জন্যে আমাকে বিলেতে যেতে হয়েছিল আবার ছুটিতে। যেসব জায়গা চষে বেড়িয়েছি সেসব জায়গায় কি চারাগাছ গজায়নি ? আমার মতো দেখতে এমন শিশু কি কেউ কোনদিন দেখেনি ? কেউ বলতে পারে না। তবে আমার সন্দেহ দুটি একটিকে আমার মতো দেখতে। রংটা কিন্তু ধবধবে ফরসা। তাদের মায়েরা শুনে তেড়ে আসে। আসবেই তো। ওরা তো আমার চেনা নয়।" জোয়ারদার বিশ্বাস করে বলে।

আমিও বিশ্বাস করে বলি, "মিসক্যারেজও হয়ে থাকতে পারে।"

"বাঁচালে ! তুমি আমাকে বাঁচালে !" উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে জোয়ারদার। "আমার যেমন মোটা বুদ্ধি এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটি মাথায় আসে না। আমার দোস্ত কর্নেল কিউ ডবলিউ আলী কি মর্দানা নন ? তাঁর বেগম সাহেবার রূপ দেখে কার না চোখ ধাঁধিয়ে যায় ?

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, কী বারেই মিসক্যারেজ! জাস্ট আনফরচুনেট! অদৃষ্ট! অদৃষ্ট মানতে হয় হে!"

"ওটা ইচ্ছাকৃতও হতে পারে।" আমি ফোড়ন দিই।

"তাই নাকি? বেবী আনওয়ানটেড?" জোয়ারদার হাহুতাশ করে। "কী বুদ্ধুই না ছিলুম হে! কামাল জোরদার কামাল পাশার মতোই নিঃসন্তান হলো। কিন্তু ওর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে পম্পা চৌধুরী কেন বন্ধ্যা অপবাদের ভাগী হবে? বিধাতার এ কী রকম বিচার।"

"এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না বিবাহের বেলা। কাউকে দোষ না দিয়ে দায়ী না করে সহ্য করতে হয়।" এছাড়া আমি আর কী বলতে পারি!

॥ তিন ॥

ডাইনিং রুমে দিব্যি ভিড়। নরনারী উভয়ের। জোয়ারদার বুদ্ধি খাটিয়ে দুজনের জন্যে টেবল রিজার্ভ করেছিল পাঞ্জাবীদের আটজনের টেবলের পাশে। বাংলার ওরা কী বুঝবে? আমরা যথাসাধ্য ইংরেজী এড়াই।

"সেই যে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা সেই অমঙ্গলই আমার চোখ ফোটায়। যদিও দৃষ্টিশক্তি দুর্বল করে।" ওর চশমার একটা কাচ তার সাক্ষী।

"তারপর থেকে তুমি মোটরসাইকেল চালানো ছেড়ে দিলে মনে আছে। পড়াশুনায় আরো সময় দিলে। ভালো পাস করলে।" আমি খেই ধরিয়ে দিই।

"আমি বড়ো আশা করেছিলুম যে ওরাও আমাকে দেখতে আসবে। আসবে সমবেদনা জানাতে।" ও আপন মনে বলে যায়।

"কারা?" আমার খটকা লাগে।

"আমার গার্ল ফ্রেণ্ডরা। যারা আমার সুখের সাথী। আমার

দুঃখের দিনে তো কই একজনও এল না হে! ভগবান আমাকে মার দিয়ে শেখালেন যে অনেক জনকে ভালোবাসলে একজনেরও ভালোবাসা মেলে না। আমার উচিত ছিল একটিকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। তা হলে সেই একজন আসত আমাকে দেখতে, আমার হাতে হাত রাখতে। তার হৃদয়ের পরশখানি দিতে। একটু উষ্ণতা সঞ্চার করতে। আহা, তেমন একটি মেয়ের জন্যে আমি কী না দিতে পারতুম! কী না করতে পারতুম!" ওকে বিষণ্ণ দেখায়।

"কেন, তোমার বিয়ে কি সুখের হয়নি? একটু আগেই তো বলেছিলে সুখের নীড়।" বিস্মিত হই।

"সুখের নীড় তো নিশ্চয়। তা বলে ওটাও কম সুখের হতো না। কে জানে হয়তো আমার একটি সাধ পূর্ণ হতো। সন্তান সাধ। আমার স্বপ্ন ছিল আমার একটি ছেলে হবে যে আমার মতোই সাহসী। আমার সেই ছেলে কোথায়? আমার স্বপনকুমার! ওর গলা ধরে আসে।

ও কি জানত না যে বিলেত থেকে ফিরে এসে নিত্যদা পড়ে যান এক অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী বিধবা রানীর প্রেমে। রানী তাঁর রাজমর্যাদা খোয়াবেন না। বৈধব্যও খণ্ডাবেন না। কিন্তু সহবাসে তাঁর অরুচি নেই। নিত্যদা কি অমনি পুরুষ যে রানীর প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়ে যাবেন? তার আত্মসম্মান অতি প্রখর। হয় পতি হবেন নয় পলাতক। কিন্তু প্রেমের টান কাটিয়ে পালাবেন কতদূরে? নারী যে অন্তর বাহির জুড়ে। নিত্যদা শেষকালে শিকার করতে গিয়ে গুলীবিদ্ধ হন। নিজেরই গুলী।"

"নিত্যদার পরিণাম কী ট্র্যাজিক!" আমার স্বর কাঁপে।

"বিধাতার আরো এক অবিচার। স্বামীজীদের সঙ্গে মিশে তাঁদের মতো যে শুদ্ধ, তাঁদেরই মতো অপাপবিদ্ধ, তাঁরই কিনা এই শোচনীয় পরিণাম! যারা নির্বোধ তারাই ওঁর নিন্দে করে। বলে ইনফ্যাচুয়েশন। যেন ইনফ্যাচুয়েশন ইচ্ছে করলেই এড়ানো যায়। দেশীয় রাজ্যে চাকরি করতে গিয়ে নিত্যদা পড়ে গেলেন বাঘিনীর

মুখে। মারা উচিত ছিল বাঘিনীকেই। কিন্তু পুরুষের ধর্ম শিভালরী। পুরুষ কখনো নারীর প্রাণ নাশ করতে পারে ? তার চেয়ে আত্মহত্যা ভালো।" জোয়ারদার হাহুতাশ করে।

"হত্যা কিংবা আত্মহত্যা কোনোটাই ভালো নয়। সব চেয়ে ভালো আত্মসম্বরণ। না পারলে আত্মসমর্পণ।" নিত্যদাকে শ্রদ্ধা করি বলে তাঁর আত্মহত্যার সমর্থন করিনে।

"আমিও কি সমর্থন করি নাকি ? ওরকম একটা ডাকিনীর জন্যে কেউ প্রাণ দেয় ? চোখ ঝলসানো রূপ যার আছে সে কি কখনো একজনের হতে চাইবে যে তুমি তাকে বিয়ে করবে ? একজনের হলেও সে কি কখনো মা হতে চাইবে ?" ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

"বিয়ে না করে কি এক সঙ্গে থাকা যায় না ? মা না হলেই বা ক্ষতি কী ?" আমি ওকে বোঝাই।

"আমার মেয়ে হলে অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী হতো না। হতো অশেষ গুণবতী। ওর মায়ের মতো। আহা, বেচারী পম্পা ! আমার জন্যেই ওর জীবনটা ব্যর্থ। আমরা পুরুষ। জীবনে আমরা একভাবে না হোক আরেকভাবে সার্থক হতে পারি। মাতৃত্ব ভিন্ন ওদের জীবনে আর কী সার্থকতা আছে, বল ! মেয়ে হয়ে জন্মানো মানে মা হবার জন্যেই জন্মানো। নারী ওই দিয়েই অমৃত হয়।" ও বলে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে।

"মৈত্রেয়ী কি অমৃত হতে চেয়েছিলেন ওই অর্থে ? কাত্যায়নীর ছেলেপুলে হয়েছিল, মৈত্রেয়ীর হয়নি। সেইজন্যেই কি তিনি স্বামীর কাছে সন্তান অভিলাষ করেছিলেন ? কই, উপনিষদে তো ও কথা লেখে না" আমি মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন আবৃত্তি করি।

"আমার অত বিদ্যে নেই, ভাই। মৈত্রেয়ী যে কে তাই আমি জানিনে। আর কাত্যায়নীই বা কে ?" ও জানতে চায়।

"যাজ্ঞবল্‌ক্য ঋষির দুই পত্নী।" আমি জানাই।

"দুই পত্নী কি ভালো ? আমার যদি দুই পত্নী থাকত তাহলে দুজনের একজনও কি আমাকে ভালোবাসত ? কর্তব্য করা এক

জিনিস, ভালোবাসা আরেক। তারপর সেও তো এক বিষম সঙ্কট। একজনের সন্তান হবে, আরেকজনের হবে না। একজন আমার সন্তানক্ষুধা মেটাবে, আরেকজনের সন্তানক্ষুধা আমি মেটাতে পারব না। তা হলে তাকেও তো আবার বিয়ের অনুমতি দিতে হয়। আমার স্ত্রী হবে আরেকজনের সন্তানজননী! আই শ্যাল ব্লাডি নক আউট হিজ ব্লাডি জ।" বলে পাঞ্জাবীদের চমকে দেয় বিলেতের কামাল পাশা জোয়ারদার।

এর পর আমাকেও চমকে দিয়ে বলে, "কাত্যায়নী অমৃত হয়েছিলেন। মৈত্রেয়ী হননি। সেইজন্যেই তো তাঁর প্রশ্ন, যাতে আমি অমৃত না হব তা দিয়ে আমি কী করব? আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। যাতে আমি অমৃত না হব তা দিয়ে আমি কী করব? মানে, শুধু শুধু স্ত্রীসঙ্গ করে কী হবে? এখন তো ওর মা হবার বয়সও পেরিয়ে গেছে।"

ভেবে বলি, "জো, ওটা এমন একটা সিদ্ধান্ত যেটা একপক্ষ স্বাধীনভাবে নিলে অপর পক্ষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। চাপা অশান্তি।"

"এ কী জ্বালা, বল দেখি! আমার আত্মার উদ্ধারের সিদ্ধান্ত আমি স্বাধীনভাবে নিতে পারব না? আমি যদি বেঁচে থাকতে শুদ্ধ হয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই সেটা হবে স্ত্রীর উপর আমার ইচ্ছা চাপানো? অবশ্য পম্পা তেমন ডিমাণ্ডিং নয়।" ও অন্তরঙ্গ স্বরে বলে।

"দ্যাখ, জো! সত্য করে সত্যভঙ্গ করার চেয়ে সত্য না করাই কি ভালো নয়? সত্যরক্ষা করতে গিয়ে কেন ওঁকে সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করবে?" আমিও বলি অন্তরঙ্গ স্বরে।

"জীবনের শেষপ্রান্তে তুমিও এসে ঠেকেছ। আমিও এসে ঠেকেছি। বল দেখি সত্যি করে? কী আছে হে ওতে!" জো বলে বৈরাগ্যভরে। একালের এক ভর্তৃহরি।

"অমৃত। সন্তান যার হয়নি সেও অমৃত হয়েছে।" আমি ওকে আশ্বাস দিই।

“স্তোকবাক্য। ভবী ওতে ভুলবে ভেবেছ?” জো পানের মাত্রা চড়িয়ে বলে, “শোন তা হলে আরো একটা গোপন কথা। রিটায়ারমেনটের আগে ছুটি নিয়ে আরো একবার ওদেশে যাই। এবার আমি সন্তানের খোঁজখবর করিনি। করেছি সম্ভবপর জননীদের। নামধাম ডায়েরিতে টোকা ছিল। ঠিকানা বদলেছে। নিরুদ্দেশ। তবু হলো দেখা কয়েকজনের সঙ্গে। কতক তো আমাকে চিনতেই পারে না। চক্ষেও দেখেনি। কতকের আমাকে মনে আছে, কিন্তু আমার সঙ্গের ঘটনাকে নয়। একেই তুমি বল অমৃত! একজনকেই শুধু পাওয়া গেল যে আমাকেও মনে রেখেছে, ঘটনাকেও। কিন্তু সেও স্বীকার করল না যে তার ফলে তার অবস্থান্তর হয়েছিল। সে আমাকে তার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সন্তানদের সঙ্গেও। সমাদরও করল সপরিবারে। বিদায়কালে হাতে চাপ দিয়ে বলল, ফিফটি ফিফটি। তুমি আমাকে তৃপ্ত করেছিলে। আমি তোমাকে তৃপ্ত করেছিলুম। লীভ ইট অ্যাট দ্যাট।”

ততক্ষণে ওর চোখে জল এসে গেছে। বলে, “আমার কিন্তু সন্দেহ ও সব কথা বলেনি। রহস্যভেদ আমি এ জীবনে করতে পারব না। অমৃত হয়েছি না হইনি? নারীই একমাত্র জানে। পুরুষ বলে আমার যে অহঙ্কার তা সে ডোবায় চোখের জলে।”

পলায়নবাদী

উপরে যে ঘরে বসে তিনি লেখার কাজ করেন সে ঘরে গিয়ে তাঁর ধ্যানভঙ্গ করে বিধু। বলে, 'দাদা, আজকের দিনেও আপনি ওই নিয়ে থাকবেন?'

'কেন, আজ কিসের দিন?' তিনি একটু আশ্চর্য হন।

'স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী। সারা শহর আজ উৎসবমুখর।' সে-ও আশ্চর্য হয়।

'তাই বল।' তিনি তাঁর হাতের কাজ সরিয়ে রাখেন। তার পরে তাঁর সেই ভক্ত পাঠকের জন্যে চায়ের ফরমাশ করেন।

দু'জনেই ইতিহাসের সেই মহান লগ্নটিতে ফিরে যান। সে যে অপূর্ব অনুভূতি তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। জগদ্দল পাথরের মতো বুকে চেপে বসেছিল দুই শতকের বিদেশী শাসন। সে যে একদিন সত্যি সরে যাবে এটা বিশ্বাস করত যারা তারাও ভাবত সিপাহী বিদ্রোহের শতবর্ষপূর্তির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

'দাদা, আপনি যে কল্পনা করেছিলেন নতুন একখানা মহাভারত লিখবেন, তার কতদূর হল? মনে করিয়ে দেয় বিধু।

'এ জীবনে তার কোনো আশা দেখছিনে।" দাদা বিমর্ষ হয়ে বলেন, 'প্রকৃত সত্য কী তা অবগত হতে আরো পঁচিশ বছর লাগবে। মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রকাশ করে যান নি। ব্রিটিশ সরকার, ভারত সরকার বিস্তর দলিল অপ্রকাশিত রেখেছেন। আমরা বাইরে থেকে সংগ্রামটাই দেখছি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কথাবার্তাও চলছিল। কখনো সরাসরি, কখনো দূত-মারফত। সে সব এত গোপনীয় যে সারা দেশে চারজন কি পাঁচজনের বেশী জানতেন না। ইংরেজ পক্ষে বড়লাট, কংগ্রেস পক্ষে গান্ধী, বল্লভভাই, জবাহরলাল ও আজাদ, লীগ পক্ষে জিন্না। যার আসল নাম ঝীণা। শেষের

দিকে গান্ধীকেও বাইরে রাখা হয়। আজাদকে তো আরো আগে সরিয়ে দেওয়া হয়। ওই যে একটা খেলা আছে যাকে বলে মিউজিকাল চেয়ার। সে খেলায় শেষপর্যন্ত রইলেন চারজন। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন মাউন্টব্যাটেন ও জবাহরলাল।'

বিধুর অত কথা জানা ছিল না। সে তাজ্জব বনে যায়।

দাদা বলে যান, 'কিন্তু ভুলে যেয়ো না যে দর-কষাকষিও সংগ্রামের অঙ্গ। ওটা ছিল একটা ড্রন গেম। কোনো পক্ষই কোনো পক্ষকে হারিয়ে দিতে পারে নি ও পারত না। আরো একবার বল-কষাকষির জন্যেও কোন পক্ষ ইচ্ছুক ছিল না। ওদিকে সময় বয়ে যাচ্ছিল। দেশ দিন দিন অরাজক হয়ে উঠছিল। শাসকদের মন উড়ু উড়ু। সিভিলিয়ানরা একটানা দশ বছর হোম লীভ পান নি। মিলিটারিও রণক্লান্ত। ওদিকে রুশবাহিনী পূর্ব জার্মানী জুড়ে বসে আছে। ওদের সঙ্গে মুখোমুখি বসতে হলে তার স্থান ভারতবর্ষ নয়, পশ্চিম জার্মানী। মিটমাটের ইচ্ছাটা আন্তরিক বলেই অমন তড়িঘড়ি মিটমাট হয়ে যায়। আর মিটমাটটা ত্রিপাক্ষিক বলেই পার্টিশনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ত্রিপাক্ষিক না হলে সিভিল ওয়ার বেধে যেত। ইংরেজ তাতে বাধা দিত না, অংশও নিত না। নিরপেক্ষ থাকত।'

বিধু পীড়াপীড়ি করে। 'দাদা, লিখুন, লিখুন, আপনিই যোগ্যতম পাত্র। আপনি ইংরেজ শিবিরেও ছিলেন, কংগ্রেস শিবিরও দেখেছেন, লীগ শিবিরও আপনার অচেনা ছিল না। মহাভারতে সবাই উপস্থিত থাকবে, কেউ বাদ যাবে না। বিপ্লবীরাও না। তাদের খবরও তো দূর থেকে রাখতেন।'

'তাদের খবর সরাসরি নয়, পুলিস-সূত্রে। মানুষকে আমি পুলিসের চোখে দেখতে চাইনি। তবু দেখতে হয়েছে। বিপ্লবীদের বেলা ওই ভুলটাই করে গেল ইংরেজরা। তেমনি পালটা ভুল করল বিপ্লবীরাও। পুলিস সাহেবদেরই ঠাওরাল ইংরেজ জাতি। খুন করে বসল এমন সব ইংরেজকে যারা মানুষ হিসাবে অতিশয় সজ্জন। কবিগুরু একবার বলেন, আহা! অমন ভালো

সাহেবটাকেও মেরে ফেললে গো! হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গেও ও প্রসঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। উনি বিপ্লবীদেরও ভালোবাসতেন। ওদের কথা লিখতে এত ইচ্ছে করে, কিন্তু লিখতে দিচ্ছে কে? এই বলে মুখে হাত চাপা দেন। এর পরে দেখি 'চার অধ্যায়' লিখেছেন। রেখে ঢেকে।' দাদা স্মরণ করে বলেন।

'দাদা লিখুন, লিখুন।' বিধু উৎসাহের সঙ্গে বলে। 'মানুষ আঁকতে হবে। শুধু সাহেব বা শুধু বিপ্লবী নয়। আপনি তো মানুষ বড় কম দেখেন নি।'

'এমন কী বেশী!' দাদা পেছন ফিরে অতীতের দিকে তাকান।

প্রথমে বলি ইংরেজ শিবিরের কথা। বড়লাটদের মধ্যে একমাত্র উইলিংডনকেই আমি দেখেছি। বাংলার লাটদের মধ্যে প্রায় সবাইকে। অ্যাণ্ডারসন, ব্র্যাবোর্ন, বারোজ, এঁদের সঙ্গে লাঞ্চ বা ডিনার খেয়েছি। শেষের জনের কাছেই তো খবরটা প্রথম পাই যে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে যাচ্ছে। অ্যাটলীর ঘোষণার পূর্বে। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। মিলিটারি অফিসারদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে মিশতে হয়েছে। আর্মি আর নেভি! কিন্তু পুলিসের সঙ্গে আমার বনিবনা হত না। ওরা যাদের ধরত আমি তাদের ছেড়ে দিতুম বা কম সাজা দিতুম।'

'মহাভারতের ওয়াই তো ভিলেন।' বিধু বলে পরম প্রত্যয়ভরে।

'গোড়ায় আমারও ধারণা ছিল তাই। কিন্তু ফাসিস্ট ইটালী, নাৎসী জার্মানী আর সোভিয়েট রাশিয়ার হালচাল শুনে আমার মনে হয় দুনিয়ায় আরো খারাপ আছে। আর স্বদেশের ইতিহাস পড়ে জ্ঞান হয় যে অতীতে আরো খারাপ ছিল। ইংরেজ আমলের শেষের দিকে যখন অরাজকতা শুরু হয়ে যায় তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করি যে পুলিস ব্যর্থ হলে আমিও ব্যর্থ হব। গান্ধীজীও যে সফল হতেন তার নিশ্চয়তা কোথায়? যখন শুনতে পাই যে নোয়াখালীতে তাঁর ভক্ত সেজে তাঁকে পাহারা দিচ্ছে কে, বল তো?' দাদা রহস্যময় হাসি হাসেন।

'পুলিস!' বিধু বিস্মিত হয়। 'না, না, তাঁর এত সব সহকর্মী থাকতে!'

'সহকর্মীরা তো খুব বাঁচাল তাঁকে পরে দিল্লীতে! পুলিসের উপর ভার দিলে কি সে ট্র্যাজেডী ঘটত! পুলিসকে তো দেখেছি জবাহরলালকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকতে। নইলে তাঁকেও বেঁচে থাকতে হত না। গান্ধীজী যে শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন সে শক্তি ছাড়াও আরো কয়েকটা শক্তি কাজ করছিল। তারা আরো খারাপ!'

দাদা দুঃখিত হন।

এর পরে কংগ্রেস শিবিরের কথা ওঠে। দাদা বলেন, 'হ্যাঁ, মহাত্মাকে আমি দর্শন করেছি। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর প্রার্থনাসভায় যোগ দিয়েছি। মওলানা মহম্মদ আলীকে ইণ্টারভিউ করেছি, মওলনা শওকত আলীর বক্তৃতা শুনেছি। মোতিলাল নেহরুকে দেখেছি। জবাহরলাল নেহরুর সঙ্গে এক টেবিলে বসে সভা করেছি, ভোজন করেছি। তেমনি মওলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গেও তেমনি সরোজিনী নাইডুর সঙ্গেও। কোনটা চাকরিতে থাকতে, কোনটা চাকরি থেকে বেরিয়ে। বল্লভভাইকে দেখি খালি গায়ে গামছা কাঁধে স্নান করতে যেতে। এটা খাস ইংরেজ আমলে। যেবার মহাত্মার সঙ্গে মালিকান্দায় গিয়ে সাক্ষাৎ করি সেইবার। খান্ আব্দুল গফ্ফার খানের দর্শন পাই সেদিন কলকাতার একটি নিভৃত সভায়। রাজেন্দ্রপ্রসাদকে আমি জানতুম পাটনায় ছাত্র অবস্থায়। সুভাষচন্দ্রকে আমি অল্পের জন্যে মিস করি। পরে তাঁর বার্লিনের বেতারভাষণ শুনেছি।'

'নেতাজীকে বাদ দিয়ে মহাভারত নয়। যেমন ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নয়।' বিধু বলে বিধুর স্বরে।

'সেই জন্যেই তো মহাভারতে হাত দেওয়া আমার সাধ্য নয়। তাঁর জীবনের আসল কাজটাই তো ভারতের বাইরে। জার্মানীতে, জাপানে, সিঙ্গাপুরে, মালয়ে, বর্মায়, থাইল্যাণ্ডে, ইন্দোচীনে।' দাদা পাশ কাটাতে চান।

'ওসব অজুহাত শুনব না। মহাভারত আপনাকেই লিখতে হবে। যেখানে যেখানে ফাঁক থেকে যাবে অন্যেরা পূরণ করবেন।' বিধু নাছোড়বান্দা।

এবার ওঠে মুসলিম লীগ শিবিরের কথা। দাদা বলেন, 'ঝীণা সাহেবকে আমি দেখি ফিরপো থেকে বেরিয়ে গাড়ির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে। সঙ্গে তাঁর কন্যা ' যাঁর মা রতনপ্রিয়া পেতিত। রতনপ্রিয়া যেমন পিতার অমতে ভিন্নধর্মীকে বিবাহ করেন, তাঁর কন্যাও তেমনি পিতার অমতে ভিন্নধর্মীকে। নাজিমউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে লঞ্চে করে ঘুরেছি। খানা খেয়েছি। জনতার আক্রমণ থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছি। তিনিও আমার সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছেন। তখন নতুন সিগারেট খেতে শুরু করেছি কিনা, আনাড়ির মতো ধরাই দেখে তিনি আমোদ পান। মহকুমা হাকিম অসুস্থ শুনে তিনি খোদ তাঁর বাংলোয় গিয়ে দেখা করেন। সৌজন্য না স্বধর্মপ্রীতি! ঢাকার নবাবের সঙ্গে মোটরে ঘুরেছি। বাংলায় তিনি যে বক্তৃতা দেন, সেটা বাঙালীর অবোধ্য। ফেরবার পথে আমার অভিমত জানতে চান। তাঁর বাংলাজ্ঞান কেমন? আমি বলি, চমৎকার। একথা শুনে তিনি খোশমেজাজে বলেন, ভাষা শেখার আমার একটা ন্যাক আছে। আই অ্যাম র‍্যাদার গুড অ্যাট ল্যাঙ্গোয়েজেস। নাজিমউদ্দীন সাহেবও আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলেন। গদি হারাবার পর ফজলুল হক সাহেব একবার আমার কোর্টে সওয়াল করেছিলেন। ইংরেজীতেই। কেসটা বিশ্রী। হিন্দু রমণী। মুসলমান পুরুষ। তার থেকে আসে সাধারণভাবে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের প্রসঙ্গ। আফটার অল দে উইল হ্যাভ টু লিভ টুগেদার। এই হল হক সাহেবের বক্তব্য। তাঁর কণ্ঠস্বরে কারুণ্য। তখন কি তিনি জানতেন যে ঠিক এই প্রশ্নটি পার্টিশন ডেকে আনবে এক বছর বাদে?"

বিধু বলে, 'কেউ জানত না ছ'মাস আগেও। নোয়াখালীর পর থেকেই ওই লাইনে ভাবতে শুরু করি আমরা।'

'মানে তোমরা। আমি তখন হেসে উড়িয়ে দিতুম। কিন্তু

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেধে যায়। ইংরেজের উত্তরাধিকারী হবে কে? মেজরিটি না মাইনরিটি? দেশ ভাগ করলে মুসলমানরাও হয় মেজরিটি। অতএব করো দেশ ভাগ। তা হলে আবার হিন্দুরা হয়ে যায় মাইনরিটি। অতএব কারো প্রদেশ ভাগ। এই হলো লজিক। মেনে যদি নাও তো শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর। নয়তো অশান্তিপূর্ণভাবে ব্রিটিশ অপসরণ। তার পরে ওয়ার অফ সাকসেশন। ভারতের ইতিহাসে যা বার-বার ঘটেছে। আমার মোহভঙ্গ হয়। কিন্তু তখনো আমি জানতুম না যে এর পরে আসছে মোহমুদ্গর বা মোহরোলার। আমারই বুকের উপর দিয়ে চালানো হবে।' দাদার মুখে যন্ত্রণার ছাপ।

বিধু হকচকিয়ে যায়। 'সে কী, দাদা! আপনার বুকের উপর দিয়ে!'

'দ্যাখ, ভাই। প্রায় পঁচিশ বছর বাদে বুঝতে পারছি আমরা সবাই ইতিহাসের হাতের পুতুল। পেছন থেকে তার টানে ঐতিহাসিক নিয়তি যাঁদের উপর এতদিন অভিমান করেছি তাঁরাও ফ্রী এজেন্ট ছিলেন না। তবে তাঁদের তুলনায় আমিই ভাগ্যবান। কারণ আমি ছিলাম এস্কেপিস্ট। আমার এস্কেপ রুট খোলা ছিল। চাকরিতে যখন যোগ দিই তখন থেকেই আমার সঙ্কল্প ছিল আমাকে যদি ময়লা কাজ করতে বলা হয় আমি হাত ময়লা করব না। যা থাকে কপালে। তেমনি আমাকে যদি মানুষের রক্তে হাত রাঙাতে হয় আমি হাত রাঙাব না। যা থাকে অদৃষ্টে। আমার সংকল্পে আমি অটল।

'আস্ত ইংরেজ আমলটা নির্বিবাদে কেটে যায়। কেউ আমাকে ময়লা কাজ করতে বলে না। তবে হাত রাঙাবার মতো পরিস্থিতি মাঝে মাঝে উদিত হয়। কারো হুকুমে নয়। ঘটনাচক্রে। আমার ভাগ্য আমাকে রক্ষা করে।' দাদা শিউরে ওঠেন।

'শুনতে হচ্ছে তো।' বিধু আরো কাছে সরে বসে।

'একবার হয়েছিল কী, রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে গেছি।

হঠাৎ চিঠি নিয়ে আসে পুলিসের আরদালী। লিখেছেন ডি. এস. পি.। কলেজ হোস্টেলের প্রাঙ্গণে শহরের মুসলমানরা উত্তেজিত হয়ে জমায়েৎ হয়েছে। হিন্দুর ছেলেরা নাকি মুসলমানের ছেলেদের মারবে বলে শাসিয়েছে। দাঙ্গা আসন্ন। এস. পি. বাইরে। আমার আদেশ ভিন্ন পুলিস গুলী চালাতে পারবে না। আমি যখন শহরেই রয়েছি। হ্যাঁ, সে সময় আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। বাড়িতে তখনকার দিনে টেলিফোন থাকত না। থাকবার মধ্যে ছিল একটি চাপরাশী। তাকেই সঙ্গে নিয়ে আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। অন্ধকার রাত। পথে দেখি বন্দুকধারী এক কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে। তাকে আমার গাড়িতে তুলে নিই। লোকবল অসীম। দেখি না কী হয়। গুলী চালাবার হুকুম দিতে হবে এমন কী কথা আছে! তবে নিয়ামত আলীর মতো আমি জনতার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করতে পারব না। নিয়ামত আলী ছিলেন এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর কাছে আমার মোকদ্দমা শোনার শিক্ষানবীশী। তাঁকে একবার পাঠানো হয়েছিল পুলিসের সঙ্গে দাঙ্গা থামাতে। দরকার হলে গুলী চালানোর হুকুম দিতে। তিনি আমুদে মানুষ। জনতার সঙ্গে মোকাবিলার সময় তিনি তাদের হাসিয়ে রসিয়ে তাদের রাগ জল করে দেন।' দাদা তার বৃত্তান্ত শোনান।

'নিয়ামত আলী যদি হাসিয়ে রসিয়ে দাঙ্গা থামাতে পারলেন তো আপনিই বা কেন তা পারতেন না?' বিধু জানতে চায়।

'কারণ তাতে প্রেস্টিজ থাকে না। আমি যে রাজপ্রতিনিধি। সমস্যা তো সেইখানে। আমি রক্তপাতও করব না, রসিকতাও করব না, অথচ শান্তিরক্ষা করব। কেমন করে সেটা সম্ভব! শো অফ ফোর্স। তাহলে অন্তত পঞ্চাশজন সশস্ত্র সিপাহী চাই। তাদের জমায়েৎ করতেও সময় লাগে। কে দিচ্ছে অত সময়! গিয়ে দেখি জনতা ইতিমধ্যেই বিদায় হয়েছে। ডি. এস. পি. বলেন ওরা স্বচক্ষে দেখে গেছে যে মুসলমান ছাত্ররা নিরাপদ। বলে গেছে আবার আসবে। তা আসতে পারে। পুলিসও

ইতিমধ্যে দলবল বাড়িয়ে নেবে। হোস্টেল-প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখি হিন্দু ছাত্ররা লক্ষ্মণসেনের পন্থা অনুসরণ করেছে। যে দু'চারটি অবশিষ্ট ছিল তারা কান্নাকাটি করছে। তাদের পালাবার পথ থাকলেও গন্তব্য স্থান নেই। সেই ক'জনকে পাহারা দেবার জন্যে চার পাঁচগুণ পুলিস মোতায়েন করতে হল। তাতে আবার মুসলিম ছাত্রদের প্রাণে আতঙ্ক। তাদের বোঝানো গেল যে ওটা তাদের বিরুদ্ধে নয়। তারা বুঝল, কিন্তু পরের দিন কলকাতায় টেলিগ্রাম করল যে পুলিস নাকি তাদের সারারাত জ্বালিয়েছে আর সেটা নাকি হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষপাতিত্বের ফলে। হিন্দু মুসলমান যে পাশাপাশি বাস করতে পারে না পার্টিশনের দশ বছর আগেই এর পূর্বাভাস পেয়ে মনটা দমে যায়। ওরা চায় মুসলিম ম্যাজিস্ট্রেট। তখন মুসলিম এত কোথায়! পায় একজন ইংরেজকে। তা, পাক, আমি কিন্তু এইজন্যে খুশি যে আমাকে গুলীর হুকুম দিতে হয়নি। দরকার হলে দিতে হতই। কিন্তু জখম হত আমার নিজের অন্তর।' দাদা বিবৃত করেন।

বিধুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'না তেমন পরিস্থিতিতে আর পড়তে হয়নি। কারণ পরে একসময় আমাকে জজ করে দেওয়া হয়। তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ। এবার গুলীর হুকুম নয়, ফাঁসীর হুকুম। কদ্দিন এড়ানো যায়, বল?'

তাঁর মুখভাব দেখে মনে হয় তাঁরই যেন ফাঁসীর হুকুম হয়েছে। বিধু অবাক হয়।

'তুমি ভাবছ ফাঁসীর হুকুম এমন কী মন্দ। শূলের হুকুম তো ওর চেয়েও নিষ্ঠুর ছিল। কিংবা শিরশ্ছেদের হুকুম। কিংবা পুড়িয়ে মারার হুকুম। দ্যাখ, বিধু! আমার কাছে এটা তর্কের বিষয় নয়। নীতির বিষয়। মানুষকে মারতে নয়, বাঁচাতে হবে, এটাই আমার মতে ধর্ম। বাবা-মা যেদিন বৈষ্ণব দীক্ষা নেন সেইদিন থেকেই আমাদের বাড়িতে জীবহিংসা নিষেধ। আরো আগে একদিন একটা দাঁড়কাক আমাদের মাটির ঘরের চালে বসে

ডাকছিল। কথা নেই, বার্তা নেই, বাবার বন্দুকটা নিয়ে একজন চাকর কি বামুন তাকে গুলী করে মারে। কাকটা নিচে পড়ে যায়। তার সেই দৃষ্টি ভোলবার নয়। কাক কি তোমার খাদ্য যে তাকে তুমি মারবে? জন্তুরা যে মারে সেটা প্রাণধারণের জন্যে। আমার জীবনের এটা একটা কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা। এ যুগের মানুষের জীবনেও। গান্ধীজীর ও টলস্টয়ের প্রভাবও আমার উপর কাজ করছিল। পারলে চাকরিটাই ছেড়ে দিতুম। তাই যতবার খুনী মামলার বিচার করতে হতো ততবার উভয়-সঙ্কটে পড়তুম। খুন যদি প্রমাণ হয় মৃত্যুই যে বিধান। অথচ আমার হাত দিয়ে মৃত্যু যে হৃদয়ের পক্ষে দুঃসহ। মনের পক্ষে দুর্বহ। এর পরে কি আমার আহারে রুচি হবে, না রাত্রে নিদ্রা হবে! তাই যতবার ও রকম মামলা আসে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়।' দাদা যেন বিলাপ করেন।

'তা হলে আপনি এড়ালেন কী করে? না, পারলেন না এড়াতে?' বিধু প্রশ্ন করে।

'প্রত্যেকবারই একটা না একটা কারণ থাকে যার দরুন আসামী খালাস পায় বা দ্বীপান্তরে যায়। তবে আমি বুঝতে পারছিলুম যে একদিন না একদিন আমাকে প্রাণদণ্ড দিতেই হবে। এমন একটা বেয়াড়া কেস আসবে যে না-দেবার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন সময় আমি আরো বড় জেলার ভার পাই ও খুনী মামলা বিচারের দায় আমার অতিরিক্ত দায়রা জজদের উপর চাপাই। তাঁদের কিন্তু আপত্তি নেই। অনেকে তো উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেন। যিনি যতবার প্রাণদণ্ড দেন লোকে তাঁকে তত বেশী ভয় করে, তত বেশী ভক্তি। আমার ইউরোপীয় পূর্ববর্তী তো হপ্তায় দুটো করে খুনী মামলা শুনতেন ও দুই হাতে ফাঁসীর হুকুম দিতেন। অথচ তাঁর মতো দয়ালু লোক কম দেখেছি। ওটা এমন একটা জেলা, খুন যেখানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মানুষগুলো শক্তের ভক্ত নরমের যম। আমিও দিন দিন কড়া হয়ে উঠি। কিন্তু ওইটুকু বাকী রাখি। কদ্দিন রাখতে পারতুম জানিনে। এমন সময়

দেশ ভাগ হয়ে যায়। নতুন সরকার আমাকে কিছুদিন পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট করে দেন ও সীমান্তের অশান্তি রোধ করতে পাঠান। এটা অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত। এই পরিবর্তনটা আমি এককালে নিজেই চেয়েছিলুম, কিন্তু ইংরেজ সরকার রাজী হয়নি। ততদিনে ওটা মুসলিম মন্ত্রীদের পরিচালনায় এসেছিল। তাঁদের পলিসি পালন করাও কষ্টকর ছিল। নতুন একটা সুযোগ পেয়ে আমি বর্তে যাই। কলকাতার আকর্ষণ ছেড়ে আমি ভিন্ন আর কেউ যেত না। ওটা নিছক ত্যাগস্বীকার। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নষ্ট।' দাদা পঁচিশ বছর পেছিয়ে যান।

বিধু বলে, 'সীমান্ত তখন অশান্ত ছিল মনে আছে।'

'অমন অ্যাবসার্ড ব্যাপার কেউ কখনো ভাবতে পেরেছে? সীমান্তের দুই পারেই আমি কাজ করেছি। দুই পারেই আমার বন্ধু। দুই পারেই আমার প্রিয়জন। হিন্দু মুসলমান ভেদ আমি মানিনি। সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলেরই নিমক খেয়েছি। দেশ ভাগ হয়েছে বলে, ভেদনীতি স্বীকার করলে তো ইংরেজের ভেদনীতিরও সমর্থন করতে হয়। আমি যখন সীমান্ত অঞ্চলে যাই তখন ওপারের মানুষকেও চিনতে পারি। ওরাও চিনতে পারে আমাকে। আমারই পুরাতন সহকর্মী ছিলেন ওপারের ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। সমস্তক্ষণ 'স্যর'. 'স্যর' করেন। আমি যেন সেই আমি ও তিনি যেন সেই তিনি। আপিসের লোক আমাকে পরম আত্মীয়ের মতো আপ্যায়ন করে। আমি অভিভূত হই। আবিষ্কার করি যে আমার পুরাতন বাসভবনের সামনে রাখা কামান দুটো পাকিস্তানী কামান নয়, পুরাকীর্তি। খুব একচোট হাসি আমাদের পুলিসের বিদ্যের বহর দেখে। যুদ্ধের উদ্যোগ কোনখানেই লক্ষ করিনে। আমি আশ্বস্ত হই।' দাদা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

বিধু বলে, 'তার পর?'

'তার পরে যেটা ঘটে সেটা বাঙালী মুসলমান বা হিন্দুর দোষে

নয়। ইতিমধ্যে ঝগড়া বেধে গেছল কাশ্মীর নিয়ে, হায়দরাবাদ নিয়ে। বাঙালী তার জন্যে দায়ী নয়। অথচ পশ্চিমে ওরা হাতের কাছে হিন্দু না পেয়ে পূবের হিন্দুদের উপর ঝাল ঝাড়ে। হিন্দুরা এপারে পালিয়ে আসে। তখন এপারের মুসলমানদের উপর ঝাল ঝাড়া শুরু হয়। বাঙালীতে বাঙালীতে এমন জাতিবৈর কেউ কল্পনা করতে পারেনি। উৎকটতম সাম্প্রদায়িকতাবাদীর সঙ্গেও আমি মিশেছি। সব হিন্দু সব মুসলমানের চিরশত্রু একথা কারো মুখে শুনিনি। সবাই চেয়েছে একটা মিটমাট। যে যার নিজের শর্তে। কিন্তু সব হিন্দুকে বা সব মুসলমানকে তাড়িয়ে দিয়ে নয়। আমার কাছে দেশভাগই চূড়ান্ত ট্র্যাজেডী। তার উপর লোকভাগ যেন সুপার-ট্র্যাজেডী। আমার বন্ধু খান্ বাহাদুরেরও একই মত।' দাদা তাঁকে স্মরণ করেন।

'বোধহয় আমার বন্ধু বলে খান্ বাহাদুরকে তাঁর সরকার বদলী করে দেন। নতুন যিনি এলেন তিনি একজন অবাঙালী মুসলমান। আমার সঙ্গে যোগসূত্র কেটে যায়। কয়েকটা চর ছিল আমার মতে আমাদের। কারণ বরাবর আমার জেলা থেকেই শাসন করা হয়ে এসেছে। তাঁদের মতে তাঁদের। কারণ দুই স্বাধীন দেশের মাঝখানে যদি নদী থাকে তবে নদীর বহতা স্রোতের মাঝখান অবধি সীমানা প্রসারিত হয়। তা হলে কিন্তু চরগুলি আমরা হারাই। যারা সেখানে গোরু চরায়, ফসল ফলায় তারা হয়ে যায় অনধিকারী। এ নিয়ে ঝগড়া পেকে ওঠে। বেদখল চর আমরা বর্ষার পরেই দখল করার প্ল্যান আঁটি ও নদীতে ঢল নামার সঙ্গে সঙ্গেই পার হয়ে ঘাঁটি গাড়ি। মূর্খের মতো সরকারকে রেডিওগ্রাম করে জানাই যে অপারেশন সাকসেসফুল।' দাদা চোখ বুজে মাথা নাড়েন।

'মূর্খের মতো বলছেন কেন, দাদা?' বিধু আশ্চর্য হয়।

মূর্খের মতো নয় তো ইডিয়টের মতো। কখনো বাহাদুরি নিতে যেয়ো না। নিতে গেলে পস্তাবে। আমার রেডিওগ্রাম পেয়ে মেজকর্তা ছুটে আসেন আমাকে অভিনন্দন জানাতে। সঙ্গে আমার

উপরওয়ালা। তাঁদের খাতিরে লঞ্চের উপরে বিরাট এক ভোজ দেওয়া হয়। বিরাট এইজন্যে যে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন একপাল সঙ্গোপাঙ্গ। তাঁরা যখন ক্যাবিনে গিয়ে ভোজের জন্যে তৈরি হচ্ছেন তখন আমি তদারকের জন্যে ডেকের উপর ঘোরাঘুরি করছি। আমার কানে এল সাঙ্গো বলছে পাঙ্গোকে, ওঁরা কেন এসেছেন জান? জবাহরলাল এখন দেশের বাইরে। যা করবার এইবেলা করে নিতে হবে। আমি কলকাতায় এর একটা পূর্বাভাষ পেয়েছিলুম। কিন্তু সীরিয়াসলি নিইনি। তখন একটা সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কেন তা বুঝতে পারিনি। এইবার আমার টনক নড়ে। আমি হুঁশিয়ার হয়ে যাই। চট করে স্থির করে নিই আমার কর্তব্য। যার উপর নির্ভর করছে আমার নিজের ভবিষ্যৎ, আমার দেশের ভবিষ্যৎ, হিন্দু মুসলমান দুই ভাইয়ের ভবিষ্যৎ। চর নিয়ে ঝগড়া যার কাছে অতি তুচ্ছ। কর্তারা শুভাগমন করলেন। মধ্যাহ্নভোজন সমাধা হল। এর পরে তাঁরা বিশ্রামের জন্যে প্রস্থান করলেন। আমিও আমার সহকর্মীদের সাধুবাদ জানিয়ে আমার ক্যাবিনে গেলুম।' দাদা বিধুকে আরেক পেয়ালা চা ঢেলে দেন।

'তার পর?'

'তার পর শুনি কর্তরা আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। তখন ছুটতে হয় তাঁদের সকাশে। তাঁদের ক্যাবিনে তাঁরা দুজন। আমাকে নিয়ে তিনজন। খুব চুপি চুপি কথাবার্তা। টপ সীক্রেট। মেজকর্তা আমার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পদোন্নতির টোপ ফেলেন। তার পরে আস্তে আস্তে কথাটা পাড়েন। তিনি নাকি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছেন যে যুদ্ধ আসন্ন। অমুকদিনের মধ্যে সীমান্ত সাফ করে দিতে হবে। সীমান্তের এরা হবে পঞ্চম বাহিনী। তখন আমি বুঝতে পারি কেন এই শুভাগমন। আমাকে অভিনন্দন জানাতে নয়, আমাকে দিয়ে যুদ্ধের নাম করে নীতিবিরুদ্ধ কাজ করিয়ে নিতে। জবাহরলালের অনুপস্থিতির অবকাশে। আমার কাছে ছিল লিখিত সারকুলার। মাইনরিটির গায়ে যেন হাত

না দেওয়া হয়। দিলে কঠোর সাজা। এখন ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আমাকেই করতে হবে ক্রিমিনালের মতো কাজ। কর্তারা লিখিত হুকুম দেবেন না। যাতে তাঁদের জবাবদিহি করতে না হয়। কলকাতায় আমাকে ডেকে নিয়ে মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাতে যুদ্ধের নামগন্ধ ছিল না। কোন কারণ দর্শানো হয়নি। আমিও গ্রাহ্য করিনি। তাই সশরীরে আগমন মুখে মুখে আদেশ জারী করতে।' দাদা গম্ভীরভাবে বলেন।

বিধুর মুখ বিবর্ণ। এ কি বিশ্বাসযোগ্য!

'এখন আমিও যদি আমার অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস অফিসারদের মৌখিক আদেশ দিতে যাই তাঁরা নিশ্চয়ই দাবী করবেন লিখিত আদেশ। সীমান্তের সত্তর মাইল জুড়ে বাস করছে সাত লাখ মাইনরিটি। ওরাও তো দাবী করবে লিখিত আদেশ। ওরা প্রথমে পড়েছিল পাকিস্তানের ভাগে। পরে ভারতের ভাগে পড়ে। এমনিতেই ওরা বিক্ষুব্ধ। ইন্ধন যোগালে ওরা মারমুখো হবে। রক্তপাত অনিবার্য। আমাকে পাঠানো হয়েছিল সীমান্তকে শান্ত করতে। বহু যত্নে শান্ত করে এনেছি। শান্তকে আবার অশান্ত করে তুলব? আমি শুধু একটি কথা বলি, ও কাজ করতে গেলে রক্তপাত হবে। মেজকর্তা বলেন, 'হোক না! হোক না!' তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'আমি সৈনিকের মতো লড়তে পারি। কিন্তু অমন কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। আমি ইস্তফা দেব। কর্তারা তা শুনে ভড়কে যান। তখন ঝুলি থেকে বাহির হয় বেড়াল।' দাদা কৌতুক করেন।

তার পর বলে যান, 'মেজকর্তা আমার পরামর্শ চান। ওপার থেকে এই যে হাজার হাজার শরণার্থী আসছে এদের জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এদের আমরা রাখব কোথায়? আমি বলি, সীমান্তে নয়। মাইনরিটির জায়গায় নয়। অন্যান্য প্রদেশে বিস্তর জমি খালি পড়ে রয়েছে। তিনি বলেন, কিন্তু ওরা যদি না যায়? তখন আমি বলি, তা হলে আমি এর কী করতে পারি?

তিনি চটে গিয়ে বলেন, 'পলিসি নির্দেশ করব আমরাই। এই যদি হয় আমাদের পলিসি, আপনি ক্যারি আউট করবেন কি করবেন না ? আমি বলি, করলে এমন হৈচৈ শুরু হয়ে যাবে যে আপনাদের ও পলিসি প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মিসচীফ যা ঘটে যাবে তাকে অঘটিত করা যাবে না। তার জন্যে জবাবদিহি করবে কে ? আমি ইস্তফা দেব। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সেই যে প্রমোদভোজ তার সমস্তটা খরচ উঠেছিল সীমান্তেরই মাইনরিটি প্রধানদের কাছ থেকে। বিকেলে তাঁরা আসেন দর্শন করতে। কর্তার মুখ অপ্রসন্ন। আমি তাঁদের অভয় দিই। আমি যতদিন আছি আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ওটা আমার চ্যালেঞ্জ। কর্তার কেন সহ্য হবে ? তিনি ডিনারে এলেন না। উপরওয়ালাও না। তাঁদের খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হল। সাঙ্গোপাঙ্গ কিন্তু ভূরিভোজনে আপ্যায়িত হল। এর পরে শুনি তাঁরা নদীর ধারে রাখা রেলের সেলুনে ফিরে গেছেন। গিয়ে বিদায় দিই ও নিই। কর্তার মুখে বাঁকা হাসি। বুঝতে পারি তিনি প্রতিশোধ নেবেন। অনেক রাত্রে সদরে ফেরার সময় ট্রেনে অপূর্ব এক উল্লাস অনুভব করি। আমি না করলে কেউ ও কাজ করবে না। লোকগুলো বেঁচে গেল। রক্তপাত হবে না।' দাদা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন। বিধু জানতে চায় তার পরে কী হল।

'তার পরে হলো আমারই বিতাড়ন। কিন্তু আমাকে বিতাড়ন করলে কী হবে, জবাহরলাল করলেন প্রত্যাবর্তন আর ওই পলিসিটা করা হল প্রত্যাহার। 'কোথায় যুদ্ধ ! কে চায় যুদ্ধ ! মিলিটারি অফিসারদের নিয়ে আমি কি কম ঘুরেছি ? সবাই তাঁরা যুদ্ধ-বিরোধী। ব্রিগেডিয়ার সাহেব তো বলেন দু'দুটো মহাযুদ্ধে তিনি লড়েছেন। তাঁর মতো নন্‌ভায়োলেন্ট কেউ নয় মেজর জেনারেল তো আমাকে সতর্ক করে দিয়ে যান যে চর নিয়ে শেষকালে না আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বেধে যায়। চর অপারেশন আমি মাসের পর মাস মাথা খাটিয়ে করেছি। যাতে রক্তপাত না হয়। ওটাও আমাদের এলাকার মাইনরিটির স্বার্থে। চরের ফসল তো ওদেরই সম্পত্তি।

ওদেরই অভিযোগ শুনে আমিও কাজে নামি। ওদের শান্তও করেছি, ওদের বিশ্বাসও পেয়েছি।' দাদা প্রীতির সঙ্গে বলেন।

বিধু বলে, 'তার পরে আপনার কী গতি হল?'

'আবার ফিরে যেতে হল তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত উনুনে। সেবার বিদেশী আমলে বা মুসলিম আমলে। এবার স্বদেশী আমলে বা হিন্দু আমলে। স্বদেশী জুতো কিছু কম মিষ্টি নয়। কিন্তু আসল কথা হল আমাকে একভাবে না হোক আরেকভাবে হাত রাঙাতেই হবে। হয় গুলী চালিয়ে, নয় ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে। আমি এসকেপিস্ট। বার বার এসকেপ করেছি। কিন্তু চাকরিতে যদি পড়ে থাকি তবে একদিন না একদিন এসকেপের পথ রুদ্ধ হবে। ধরো, গান্ধীহত্যার বিচার যদি আমাকেই করতে হত আমি কী হুকুম দিতুম? প্রাণদণ্ড নিশ্চয়। সে দণ্ড যিনি দেন তিনি একজন জৈন। আমারই সমসময়িক। ইস্তফার অন্যান্য কারণও ছিল। একদিন সকালে উঠে হঠাৎ স্থির করি যে আধুলি টস করে মাথায় পিঠটা উঠলে ইস্তফা দেব। টস করলেন আমার স্ত্রী। তিনি লিখলেন, আমি সই করলুম। পুরুষের শক্তি তার স্ত্রী। নইলে সে সাহস আমি পেতুম কোথায়?'

'সত্যি। তিনিই আপনার শক্তি।' বিধু তার প্রশংসা করে।

'কিন্তু আমার মুক্তি অত সহজে হল না। একজন সেক্রেটারির হঠাৎ অসুখ করে। আমার ডাক পড়ে অস্থায়ীভাবে। বিতাড়ন করেছিলেন যাঁরা তাঁরাই সমাদর করলেন। আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। কিন্তু আমি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে। যেদিন চার্জ দিয়ে বিদায় নেব ঠিক তার আগের দিন আমার সামনে একটি জরুরী অর্ডার রাখা হয়। তৎক্ষণাৎ সই করে জেলখানায় পাঠাতে হবে। শেষরাত্রে একটি মহাপ্রাণীর ভবলীলা সাঙ্গ। বেলা দশটায় আমারও চাকরিলীলা সাঙ্গ। কেমন বিচিত্র যোগাযোগ! যেন আমি হাত রাঙা করবার জন্যেই এই আসনে বসেছিলুম। ফাঁসীর আসামীকে একটা দিনও ঝুলিয়ে রাখা যায় না। মুলতুবির হুকুম দেওয়া অন্যায়। এবার আমার

এসকেপ নেই। দুয়ার রুদ্ধ।' এই বলে বিধুকে দাদা ঝুলিয়ে রাখেন।

সে রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'তার পর?'

'এমন সময় রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। প্রবেশ করেন শেষ ব্রিটিশ ব্যারিস্টার। তাঁকে আমি বিশেষ সমীহ করতুম। তিনি বলেন, 'আমরা আরো একবার প্রাণভিক্ষার সুযোগ প্রার্থনা করি। উপর থেকে ভরসা পেয়েছি প্রাণদণ্ড মকুব হবে।' দিলুম আরো একটা সুযোগ। লোকটা হয়তো বেঁচে যাবে। অন্তত কিছুদিন তো বাচবেই। পরের দিন আমিও হালকা মনে বিদায় নিই। আমার নিয়তি আমাকে সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেয়। আমার ভাগ্য আমাকে টেনে বার করে। বোধহয় এর অন্তর্নিহিত কারণ আমি একজন লেখক। লেখকের জন্যে এসকেপ রুট সব সময় খোলা থাকা চাই।' দাদা এইখানে শেষ করেন।

বিধু অভিভূত হয়। এত কথার পরেও আবার বলে, দাদা, মহাভারত আপনাকে লিখতেই হবে। আপনাকে লিখতে হবে।'

'কার জন্মদিন আজ মনে আছে?' দাদা হাতজোড় করে বলেন, 'এস, শ্রীঅরবিন্দকে স্মরণ করি। তাঁর 'সাবিত্রী'ই একালের মহাভারত।'

দুই জগতের মাঝখানে

রায়বাহাদুর আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'এস, ভাই, এস। স্বাগতম। সুস্বাগতম্।' আর তাঁর সহধর্মিণী মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে বলেন, 'বোস, বাবা বোস।'

হ্যাঁ, একজন বলতেন 'ভাই'। যদিও বয়সের ব্যবধান চৌদ্দ কি পনেরো বছর। অপরজন বলতেন, 'বাবা'। কারণ, পর্দার ব্যবধান তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

গৃহিণী যান চা আনতে। কর্তা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেন সোফার উপর নিজের একপাশে। আর সমস্তক্ষণ ধরে থাকেন আমার একটা হাত। পাছে পালিয়ে যাই।

বলেন, 'জানো, রিটায়ারমেণ্টের পরের দিন থেকে জনমানব আসে না আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তুমিই প্রথম। তুমি তো এলে সেই সুদূর বীরভূম থেকে। কিন্তু যাঁরা এই বালীগঞ্জে বাস করেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হলে তাঁদের বাড়ি যেতে হবে। তাঁরা কষ্ট করে আসবেন না। এই সেদিনও যারা আমার চারদিকে ঘুরঘুর করত তারাও আমাকে দেখলে পাশ কাটিয়ে যায়। চাপরাশিরা সেলাম করে না। কেরানীরা উঠে দাঁড়ায় না। অফিসাররা বসতে চেয়ার অফার করেন না। গোটা সরকারী মহলটাই আমার দিকে এমন করে তাকায় আমি যেন একটা ভূত। না, ভূতকেও তো লোকে ভয় করে। আমাকে কেউ ভয় করে না। অথচ এককালে কে না করত!'

আমি সহানুভূতির সঙ্গে বলি, "আপনি বড্ড সেনসিটিভ। রিটায়ার যাঁরা করেন তাঁরা কেনই বা প্রত্যাশা করেন যে লোকে তাঁদের পূর্বপরিচয় মনে রাখবে? একজন রিটায়ার্ড বাঘ ও একজন রিটায়ার্ড ছাগ দুজনেই ওদের চোখে সমান।'

'সাধারণ লোক তা মনে করতে পারে, কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা তো জানে আমি রায় রোহিণীকান্ত চ্যাটার্জি বাহাদুর। রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসন্‌স জজ। আমি কি একজন রিটায়ার্ড সেরেস্তাদার কি পেশকারের সঙ্গে সমান!' রায়বাহাদুর গর্জন করতে গিয়ে আর্ত স্বরে বলেন।

'সমান। সমান। সম্পূর্ণ সমান। চাকরির আগে যেমনটি ছিলেন। মনে করুন চাকরির আগের অবস্থায় ফিরে গেছেন। তাহলে শুধু একটু শিষ্টাচারই প্রত্যাশা করবেন। তার বেশী নয়। সেটুকু যে-কোনো ভদ্রলোকের পাওনা।' আমি আশ্বাস দিই।

রায়বাহাদুর ফণা নত করে বলেন, 'সত্যি বলছি, ভাই। ত্রিশ বছরের দর্প চূর্ণ হতে তিনটে মাসও লাগল না। চাপরাশি-হীন জীবন কখনো কল্পনা করতে পারি নি। ওরাই তো রোজ বাজার করে আনত। নাজির এসে দু'বেলা খবর নিত কিছু দরকার আছে কিনা। স্টেনো এসে ডিকটেশন নিয়ে যেত! এখন অভ্যেস এমন খারাপ হয়ে গেছে যে নিজের হাতে একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারিনে। একজন টাইপিস্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, সে এসে টাইপ করে দিয়ে যায়।

আমি দুঃখ প্রকাশ করি। বলি, 'সময়ে সয়ে যাবে।'

'আরো সর্বনেশে কথা আয় অর্ধেকের নিচে। ব্যয় যেমনকে তেমন। স্টাইল একবার বাড়িয়ে দিলে নামে না, এ শিক্ষা আমার হয়নি। এখন আমি শিক্ষানবীশ। কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে, ভাই। কোনোমতেই ঠাট বজায় রাখতে পারছিনে। অথচ তুমি যে বললে চাকরির আগেকার অবস্থায় ফিরে যেতে সেটাই বা কেমন করে সম্ভব? এ বয়সে কি তেমন কষ্ট সইতে পারব?' রায়বাহাদুর আক্ষেপ করেন।

তাঁর সার্ভিসের অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে তাঁর এই বিষয়ে তফাত ছিল যে তিনি থাকতেন ইউরোপীয় স্টাইলে। এটা চাকরির গোড়া থেকেই। যখন তাঁর সঙ্গে এক স্টেশনে কাজ করতুম তখনি

লক্ষ করেছি যে তিনি বাড়িতে ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন না কিংবা আদালতে চাপকান পায়জামা। টেবিল চেয়ার না হলে তাঁর খাওয়া হতো না। তবে আহারটা ছিল দেশী। তাঁর স্ত্রীর স্বহস্তের পাক।

'ছ্যাখ হে, সবচেয়ে বড়ো দুঃখ হাতে কাজ নেই। কোর্টে যাবার জন্যে পা ছটফট করে। মামলার শুনানীর জন্যে প্রাণ আইঢাই করে। অফিসের ফাইল দেখার জন্যে চোখভরা কৌতূহল। কিন্তু কেউ ভুলেও আমাকে স্মরণ করে না। স্মরণ যা কিছু তা আমিই করি। কবে কী রায় দিয়েছি সব আমার মুখস্থ। একটু শোনাব নাকি?' রায়বাহাদুর সতৃষ্ণনয়নে তাকান।

শুনি মিনিট দশেক। 'অপূর্ব! অপূর্ব ইংরেজী!' আমি তারিফ করি। ইংরেজী তিনি এত ভালো শিখেছিলেন যে তাঁর দুটি ছেলে-মেয়ে বিলেত গিয়ে সেদেশেও নাম করে। তিনি নাকি স্বপ্নও দেখতেন ইংরেজীতে।

'কিন্তু কোন কাজে লাগছে সেই ইংরেজী! রিটায়ার্ড বলে আমি কি সব কাজের অযোগ্য? কী নিয়ে আমি বাঁচব? কেন আমি বাঁচব? সেটা কি শুধু এইজন্যে যে আমার পেনসনটা এদের কাজে লাগছে?' তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেন।

আমি বলি, 'জীবন আরম্ভ হয় পঞ্চান্ন বছর বয়সে। মনে করুন এটা আপনার নবজন্ম। জগতে কি কাজের অভাব!'

'দ্বিজ কথাটার মানে জানো তো? যে দু'বার জন্মায়। তেমনি আরো একটা শব্দ বানাতে পারো। তার অর্থ যে দু'বার মরে। দ্বিমর। আমরা সরকারী কর্মচারীরা দ্বিমর। আমরা একবার মরি রিটায়ারমেণ্টের সময়, আরেকবার তার কিছুদিন বাদে। অনেকেই ষাটের আগে মারা যায়। আমিও যে ততদিন বাঁচব তার স্থিরতা কী? একেই কি তুমি বলবে নবজন্ম? তবে হতুম যদি উকিল, তাহলে আশি বছর বয়স অবধি চুটিয়ে প্র্যাকটিস করতুম। গোড়ায় তো সেই ইচ্ছাই ছিল তাই। প্রথম কয়েক বছর স্ট্রাগল করতে

হয়। সেটার জন্যে কিছু অর্থসাহায্যেরও প্রয়োজন। কারো কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নেব না বলেই তো মুনসেফী নিই। না বাপের কাছ থেকে, না শ্বশুরের কাছ থেকে। আমি সেল্‌ফ-মেড ম্যান। বরাবর স্কলারশিপ পেয়েছি।' তিনি স্মৃতিচারণ করেন।

'তা আপনি তো এখনো প্র্যাকটিসে নামতে পারেন। স্যার আশুতোষকেও তো পাটনা হাইকোর্টে মামলা লড়তে দেখেছি।' আমিও করি স্মৃতিচারণ।

'কার সঙ্গে কার তুলনা!' রায়বাহাদুর নম্রভাবে বলেন, 'না, ভাই, ওটি আমাকে দিয়ে হবে না। আমার সাবর্ডিনেটদের 'ইওর অনার' বলে সম্বোধন করা। হাইকোর্টের জজদের বেলা অন্য কথা। কিন্তু তেমন সুযোগ তো বেশী জুটবে না। ওইসব সাবর্ডিনেটদের সামনেই দাঁড়াতে হবে আমাকে! যে আমি জজের আসনে বসেছি! যে আমি রিটায়ার্ড জজ বলে পেনসন ড্র করছি! ছি ছি ছি!'

কয়েক বছর বাদে আবার দেখা করতে যাই। 'রায়বাহাদুর' বলতেই তিনি চমকে উঠে হাত নেড়ে নিষেধ করেন।

'ভূত! ভূত! আমি এখন রায়বাহাদুর নই, রায়বাহাদুরের ভূত! জানো না, ইংরেজ যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আমলের খেতাবগুলো বাতিল হয়ে গেছে। আমি ছিলুম দ্বিময়, এখন হয়েছি ত্রিময়। ভালোই হল যে ময়ূরপুচ্ছটা খসে গেল। তুমি বুঝবে না সে কী যন্ত্রণা। জানতেন তোমার গুরুদেব। পরতে গেলে লাগে এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে। লোকে ভাবে রায়বাহাদুর যখন খয়ের খাঁ নিশ্চয়। কী করে জানবে যে হাইকোর্টের জজদের যেমন নাইট উপাধি দেওয়া হতো জেলা ও দায়রা জজদের তেমনি রায় বাহাদুর খেতাব! তাঁদের রেকর্ড দেখে। অবশ্য আমার সার্ভিসের কথাই বলছি। এর জন্যে কারো দ্বারস্থ হতে হয়নি আমাকে। কারো ফরমাসও খাটতে হয়নি।' তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন।

'কিন্তু আপনি খুব কড়া হাকিম ছিলেন মনে আছে।' আমি উস্‌কে দিই।

'হ্যাঁ, কোর্টে আমি ভয়ানক কড়া ছিলুম। কারো মুখ দেখে বিচার করতুম না। কী জমিদার কী মহাজন, কী স্বামীজী, কী ব্রাহ্মণ!" তিনি দেখতেন শুধু আইন।

একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের নাম করেন যাঁর জমিদারি এস্টেটের বাকী খাজনার নালিশটা ছিল মিথ্যা। প্রজাকে অকারণে নাজেহাল হতে হয়।

'ওটা বোধহয় ওঁর জ্ঞাতসারে হয়নি। অন্যান্য শরিকের মতো উনিও সই করে দিয়ে থাকবেন। নায়েব গোমস্তার কারসাজি।' আমি ওঁর হয়ে কৈফিয়ত দিই।

'অমনি করেই তো জমিদারবাবুরা প্রজাদের হৃদয় থেকে মুছে গেলেন। থাকবেন কলকাতায়, করবেন অধ্যাপনা, লিখবেন গ্রন্থ, রাখবেন জমিদারি, মারবেন প্রজাদের অন্ন। ধর্মাধিকরণে বসে আমি এঁদের ক্ষমা করতে পারি কখনো? কড়া স্টিকচার দিই। ও রোগ সারবার নয়। তাই তো জমিদারি উঠে যাচ্ছে।' তিনি বলেন খেদের সঙ্গে।

'ওটা ইংরেজের সৃষ্টি। ইংরেজ গেলে জমিদারিও যায়।' আমি মন্তব্য করি।

'দেখলুম কেউ চিরস্থায়ী নয়, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। ইংরেজ নয়, তার সাম্রাজ্যও নয়, তার করদ রাজ্য বা জমিদারিও নয়, তার আমলের নাইটহুডও নয়, রাজা উপাধিও নয়। এতদিন আমি আমার নিজের দুঃখেই কাতর হয়েছি। এখন চোখে জল আসে হতভাগ্য রাজন্যদের দশা দেখে। অভিজাতদের দশা দেখে। আমার কী মনে হয় জানো? মনে হয় পুরাতন জগতের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু নূতন জগতের জন্ম হয়নি। আমরা বাস করছি দুই জগতের মাঝখানে। তিনি বলে দার্শনিকের মতো।

আমিও দার্শনিকতা করি। 'এটা একটা গোধূলিকাল। বলা যেতে পারে উদয়গোধূলি। রাতের আঁধার গেছে, অথচ দিনের আলো ফোটেনি।'

তিনি মাথা নাড়েন। রাতের আঁধার যেটাকে বলছ সেইটেই ছিল দিনের আলো। সেই আলোর পরশ লেগে শতদলের এক একটি দল চোখ মেলে। কারো নাম রামমোহন, কারো নাম বিদ্যাসাগর, কারো নাম বঙ্কিম, কারো নাম রবীন্দ্র, কারো নাম বিবেকানন্দ, কারো নাম অরবিন্দ। হ্যাঁ, কারো নাম গান্ধী, কারো নাম সুভাষ। এঁরা কেউ আঁধারের শিশু নন, সকলেই আলোর শিশু।'

আমি তাঁকে আশ্বাস দিই যে ওর চেয়েও শক্তিশালী আলোকের স্পর্শে সহস্রদলের সহস্রটি দল খুলে যাবে। জনগণের উপর প্রত্যয় রাখতে হবে।

তাঁর বিশ্বাস হয় না। 'ভাই, তোমার বয়স কম। তুমি আশাবাদী। আমি কিন্তু নৈরাশ্যবাদী। সার্ভিস ট্র্যাডিশন দুই শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল, এত শীগগির পড়ে যাবে না। কিন্তু পোড়ো বাড়ির মতো পড়ে যাবেই। এরা শুধু দল গড়তেই শিখেছে, আর কিছু গড়তে শেখনি। অথচ ভাঙতে ওস্তাদ। যাক, আমার কী! আমি ততদিন বাঁচলে তো? আমিও এখন দুই জগতের মাঝখানে। ইহলোক আর পরলোক। অথচ পরলোক আছে কিনা তাও নিশ্চিত জানিনে। প্রমাণাভাব। পুজো আর্চাও করিনে, মন্দিরেও যাইনে, মঠবাড়িতেও না। গীতা চণ্ডীও পড়িনে। পড়ি ইতিহাস।'

ইহলোক ও পরলোক নিয়ে আমার মনে কোনো সমস্যা ছিল না। আমি জানতুম যে যখন যেখানেই যাব তখন সেইখানটাই হবে ইহলোক। তেমনি সেই কালটাই হবে ইহকাল। একে একে সবাই তো আমরা সে অভিমুখে যাচ্ছি। কেউ দুদিন আগে, কেউ দুদিন পরে। তবে যাদের এপারের কাজ ফুরিয়েছে, সত্যিকার কিছু করবার নেই, তাদের মনে হতে পারে যে তাঁরা এপারেরও নন ওপারেরও নন। দুই জগতের মাঝখানে।

কিন্তু ওর আরো একটা অর্থও তো আছে। ব্যক্তির বেলা নয়

সমাজের বেলা এটা যদি একটা গোধূলিকায় হয়ে থাকে তবে অস্ত-গোধূলি না উদয়গোধূলি। এটা কি 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, না 'হরি, দিন যে গেল সন্ধ্যা হলো, পার করো আমায়'? সন্ধ্যা বলতে একটা যুগের সন্ধ্যা।

'পশ্চিমের মনীষীরাও ভাবতে আরম্ভ করেছেন যে সামনে আসছে একটা অন্ধকার যুগ। যে প্রদীপটার উপর তাঁদের ভরসা ছিল সেই প্রদীপটার নিচেই অন্ধকার। বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে এক বিভীষিকা। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি বাধে তবে এবার আসছে বায়োলজিকাল ওয়ার-ফেয়ার। ভারতের স্বাধীনতা যদি হয়ে থাকে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ানোর স্বাধীনতা তাহলে ওটি একটি অমূল্য রত্ন। ওকে অতি যত্নে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু পশ্চিমের ওঁরা যে পথ নিয়েছেন সেটা সরে দাঁড়ানোর নয়। প্রতিরোধের। অন্ধকারকে প্রতিরোধ করতে হলে আলো জ্বালাতে হয়। সেটা কিসের আলো? বিজ্ঞানের আলো না ধর্মের আলো? নতুন করে অনেকেই ধর্মের শরণ নিচ্ছেন। খ্রীস্টের শরণ নিচ্ছেন। সঙ্ঘের শরণ নিচ্ছেন। এটার মধ্যে নূতনত্ব কোথায়? তাঁরাও প্রতিরোধ করবেন অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রের। পরমাণু অস্ত্র দিয়ে পরমাণু অস্ত্রের। ব্যাধিবীজ দিয়ে ব্যাধিবীজের। তাহলে তো পুরোনো পিদিমটার তলায়ও অন্ধকার।' আমি স্বগতভাবেই বলি।

'আমি কিন্তু ইউরোপের কথা ভাবছিনে। ভাবছি আমার এই সনাতন স্বদেশের কথা। এই সনাতন অচলায়তনটিকে সচল করেছিল যে শক্তি সে শক্তি স্বেচ্ছায় অপসরণ করেছে। এঁদের বিশ্বাস এঁরাই সেটা ঘটিয়েছেন। সেটা সত্য হলেও অর্ধসত্য। সেই-জন্যে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। ইতি জবাহরলালঃ।' তিনি হাসলেন। তাঁর হাসিটিও পরিমিত।

'আপনার কি আশঙ্কা মধ্যযুগ ফিরে আসবে?" সোজাসুজি প্রশ্ন করি।

'মধ্যযুগ গেল কবে যে ফিরে আসবে! বলতে পারো চাপা

পড়েছিল, এখন মাথা তুলবে। তুমি মনে করেছ তোমার সাধের জনগণ তার সঙ্গে লড়বে? না সে কাজ রামমোহন রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরীদের। তাঁরা লড়বেন কি? লড়বার শক্তি আছে কি? ইচ্ছা আছে কি? লড়াইটা অচলায়তন বনাম সচলায়তন নয়। অচলায়তন বনাম অর্ধচলায়তন। তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।' তিনি নৈরাশ্যবাদী।

গৃহকর্ত্রী আমাকে ভিতরে নিয়ে যান। বলেন, ওঁর কী হয়েছে, জানো? সারাজীবন ভৃত্যের মতো খেটেছেন। বেশীর ভাগ মফঃস্বলের চৌকিতে। পটিয়া আর রাউজান, হাতিয়া আর খাতড়া, এমনি কত জায়গায়। কোথায় দুদণ্ড বিশ্রাম করবেন, দার্জিলিং কি শিলং যাবেন, বেনারস কি হরিদ্বার, আগ্রা কি দিল্লী, তা তো নয়। তাঁরই মতো জনাকয়েক রিটায়ার্ড জজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে অতীতের জাবর কাটবেন। এঁরা ধর্মপ্রাণ নন কর্মপ্রাণ। কাজ না থাকলে ডাঙার মাছ। সমস্তক্ষণ ছটফট করেন। কিন্তু কাজ কোথায় যে করবেন? নতুন সরকার কতলোককে ট্রাইবুনালে নিচ্ছে, কিন্তু ইনি তো কোনদিন কুর্নিশ করেন নি, করবেনও না। চাকরি যতদিন ছিল দাবী ছিল। চাকরিও নেই, দাবীও নেই। ওঁর ধারণা সরকারী লোকই দরকারী লোক। উনি সরকারী নন বলে দরকারী নন। একটা কিছু দরকারী কাজে ওঁকে লাগিয়ে দেওয়া যায় না? টাকার জন্যে নয়। উনি যে একজন দরকারী লোক এই ধারণাটার জন্যে।'

আমি এর কী উত্তর দিতে পারি? বলি ভেবে দেখব।

এর পরে একদিন আমিও অকালে অবসর নিয়ে সরে পড়ি। আবার যখন দেখা মিস্টার চ্যাটার্জি—রোহিণীবাবু বললে তিনি ক্ষুণ্ণ হন—আমার সঙ্গে কোলাকুলি করেন।

বলেন, 'তুমিও দ্বিমর হয়ে আমাদের দলে ভিড়লে? কিন্তু আরো কিছুদিন থাকলে ভালো করতে। তোমার তো কচি বয়েস। বানপ্রস্থের তাড়া কিসের?'

'আমাকে আমার জীবনের কাজ সারা করে যেতে হবে। জীবিকার

জন্যে কাজ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলে তারপরে আর এনার্জি থাকত না। তাছাড়া আপনি যেমন দুই জগতের মাঝখানে আমিও ছিলুম তেমনি। কিন্তু আরেক অর্থে। সাবেক আমলের কর্মচারী হাল আমলে মানিয়ে চলতে জানে না। মানে মানে সরে যাওয়াই শ্রেয়। সময় থাকতে সরে যাওয়াই বিজ্ঞতা।' আমি কৈফিয়ত দিই।

'কিন্তু তোমার সাধের জনগণের প্রতিও তো একটা কর্তব্য ছিল। তারা চায় সুবিচার, তারা চায় সুশাসন। এটাও একপ্রকার বিট্রেয়াল।' তিনি মৃদু ভর্ৎসনা করেন।

'কই আমাকে তো ওরা জানতে দেয়নি যে আমি একজন দরকারী লোক? সরকারকেও তো জানায়নি। তাছাড়া জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক তো আমি চুকিয়ে দিচ্ছিনে। দিচ্ছি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক। জনগণের সেবা অন্যভাবে করব।' তাঁকে আশ্বাস দিই।

ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে নতুন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সরকারী কর্মচারী বা দ্বিমর রূপে নয়। সারস্বত রূপে আমরা একসঙ্গে সভাসমিতিতে যাই। আলাপ-আলোচনায় যোগ দিই। তাঁর উৎসাহের জোয়ার আসে। নৈরাশ্যবাদ চাপা পড়ে যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি সভাপতিত্বের আহ্বান পান। কিংবা উপসভাপতিত্বের। সরকারী না হলেও তিনি হন একজন দরকারী লোক। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এর স্বীকৃতি দেয়। কমিটির মেম্বর করে। তিনি আর পুরোনো দিনের জাবর কাটেন না।

আমি তো ভেবেছিলাম নতুন জমানার সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়ে গেছে। তা নয়। বছর কয়েক বাদে একবার তাঁর অতিথি হতে হয়। তখন কথাবার্তায় অখণ্ড অবসর মেলে। জিজ্ঞাসা করি আশা করবার মতো কিছু দেখছেন কিনা।

'জানি তোমার মনে কষ্ট হবে। সেইজন্যে ও প্রসঙ্গ তুলিনে। কিন্তু তুমি যখন নিজেই তুলেছ তখন আমার কথাটা আমি খুলেই বলি।' তিনি চুপ করে ভাবেন, তারপর জোর দিলে বলেন, 'না।'

নতুন জগতের কিছুমাত্র পূর্বাভাস পাচ্ছিনে। শুধু, পুরোনো জগৎটাই একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে। একে একে নিবিছে দেউটি।'

আমি তাঁকে বাধা দিইনে। প্রাণ খুলতে দিই।

'দেউটি আরো নিববে। দেউটি সব নিবে যাবে। বয়স তো বাড়ছে। মানুষ তো অমর নয়। তার জন্যে আপসোস করে কী হবে? ওটা আমি সভাসমিতির জন্যে তুলে রেখে দিয়েছি। অপূরণীয় ক্ষতি। যদুনাথ সরকার, রাজশেখর বসু এঁদের স্থান শূন্যই থেকে যাবে। শতবার্ষিকীর হিড়িক পড়ে গেছে। সেখানেও আরেক দফা কাঁদুনি গেয়ে আসি। শতবার্ষিকী ঘুরেফিরে আসবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর একটিবারও আসবেন না। লোকের ভালো লাগে শুনতে। আমারও ভালো লাগে বলতে। কিন্তু নবাগত যাঁরা তাঁদের নতুন জগতের অগ্রদূত বলে চিনতেই পারিনে। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় যে তাঁরাও বর্ণচোরা পুরাতন। তাঁদের নূতনত্ব কেবল শব্দে আর ভঙ্গীতে আর কৌশলে আর মেজাজে। সেটা বাসি হতে কতক্ষণ! খবরের কাগজ কে দু'বার পড়ে!' তিনি বকবক করেন।

আমি এবার একটু অস্ফুট প্রতিবাদ করি। 'তবু নূতনত্ব কি একেবারে নেই?'

'থাকবে না কেন? দেশে শিল্পবিপ্লব হলে বিস্তর নতুন সমস্যা ওঠে। তেমনি কমিউনিজম হলে বিস্তর নতুন মুখ দেখা যায়। একেই যদি তুমি বল নূতনত্ব তবে তুমিই ঠিক। আমিই বেঠিক। কিন্তু এটাও তোমাকে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। এদের কারো শতবার্ষিকী কোনোদিন অনুষ্ঠিত হবে না। এমনকি অর্ধশতবার্ষিকীও না। সিকি শতবার্ষিকীও হয় কিনা দেখো। তুমি তো ততদিন বেঁচে থাকবেই।' তিনি সহাস্যে বলেন।

আমি আর কথা বাড়াইনে। অন্দরে গিয়ে দিদির সঙ্গে গল্প করি। তিনি বলেন, 'ওঁর দুজন বন্ধু আছেন রায়সাহেব আর এম. বি. ই। তিনজনে মিলে রোজ লেকের ধারে বেড়ান আর

আড্ডা দেন। ওঁরা বলেন 'রায়বাহাদুর। ইনি বলেন 'রায়সাহেব' বা 'মিস্টার'। মান্ধাতার আমলের মতো। আর ওদিকে ওঁর যে ভাইটি তিনি তো এখন থেকেই একটা লাল ঝাণ্ডা যোগাড় করে লুকিয়ে রেখেছেন। তাঁর ছেলেদেরও তালিম দিচ্ছেন চ্যাটার্জির বদলে চটস্কি বলে পরিচয় দিতে।'

'হা হা হা!' আমি হেসে বলি, 'তা এতে দোষের কী আছে? চাটুজ্যে যদি চ্যাটার্জি হতে পারল তবে চ্যাটার্জি কেন চটস্কি হবে না?'

'তুমি তো হাসছ। ওঁর কিন্তু রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। ওঁকেও কি শেষ বয়সে চটস্কি সাজতে হবে? আর ওই যে লাল ঝাণ্ডা ওটা যেন ষাঁড়ের সামনে লাল ন্যাকড়া। বাড়িটা কোন্‌দিন না বাজেয়াপ্ত করে! সারাজীবনের সঞ্চয়। চোরাকারবারের টাকা তো নয়। তফাতটা কি ওরা বুঝবে? স্বর্গে গিয়েও উনি শান্তি পাবেন না। যদি স্বর্গ বলে কিছু থাকে। বলেন তো স্বর্গ নরক উনি মানেন না। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। কিন্তু শ্রাদ্ধ না করলে ওঁর আত্মার তৃপ্তি হবে না এটাও জানিয়ে রেখেছেন।' দিদির মুখে স্মিত হাসি।

মানুষমাত্রেই জটিল। অসঙ্গতিতে ভরা। আমি এর জন্যে কাউকে দোষ দিইনে। কিন্তু কথাটি কি সত্যি? নতুন জগতের কি পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছে না? কোথায় গেলে পূর্বাভাষ পাব? ভিলাইতে না মাইথনে, চণ্ডীগড়ে না ভাকরা নাঙ্গালে? দিল্লীতে না কেরলে? গ্রামে না বস্তিতে? কোন্ শ্রেণীর মধ্যে পাব? যারা হঠাৎ বড়লোক না রাতারাতি গরিব? আঙুল ফুলে কলাগাছ না কলাগাছ শুকিয়ে সলতে? ছাত্ররা যদি একটা শ্রেণী বলে গণ্য হয় তো তারা একই কালে ইংরেজী উঠিয়ে দিচ্ছে ও সাহেবী পোশাক পরছে। এর মধ্যে কোন্‌টা নতুন? মেয়েরা যদি একটা শ্রেণী বলে মান্য হয় তবে ওরা একই কালে পর্দা ছেড়ে দিচ্ছে ও নাকছাবি বা নথ পরছে। দিকে দিকে কালীপূজার ধুম পড়ে গেছে। শীতলা, শনি কেই বা পূজা না পাচ্ছেন! অপর পক্ষে আজ ধর্মঘট কাল

ঘেরাও পরশু মিছিল। লাল ঝাণ্ডার ছড়াছড়ি। দেখলে মনে হবে কলকাতা নয় মস্কো।

পরের বার যখন দেখা করতে যাই লক্ষ করি যে একতলাটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। স্বামী স্ত্রী দুজনের মুখে দুর্দিনের ছায়া। টাকার দাম পড়ে গেছে, পেনসনে কুলয় না। মিস্টার চ্যাটার্জি এই ভেবে অস্থির যে তিনি যদি হঠাৎ চোখ বোজেন পেনসনটা বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে ভাবনার কথা তাঁর গৃহিণীকে বলা হবে ল্যাণ্ডলেডী। ভাড়াটেরা ওছাড়া আর কী বলবে! ছি ছি ছি!

একদিন আমার স্ত্রী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গেটের ফলকে খোদাই ছিল রায় রোহিণীকান্ত চ্যাটার্জি বাহাদুর। সে ফলক কোথায়? তার জায়গায় নতুন ফলকে খোদাই পি কে চ্যাটার্জি। এটা কি ল্যাণ্ডলেডী সমস্যার সমাধান?

এরপরে দিদির মুখে হাসি নেই। যে মুখে হাসি সব সময় লেগে থাকত। দারুণ পুত্রশোকের পরেও। তাঁর নিগূঢ় বেদনা তিনি কাউকে জানতে দিতেন না। এবার কিন্তু আমাকে বলেন আর বইতে পারছেন না। ছোট নাতিটির দুরারোগ্য ব্যাধি। নিজেরও শরীর ভেঙে পড়ছে। সংসারে অশান্তি। কর্তার বিরুদ্ধেও মৃদু অভিযোগ। এই প্রথম বিদ্রোহ।

পরে একদিন শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই দুপুরবেলা তিনি সেই যে শুতে যান তার পরে আর ওঠেন না। ঘুমের মধ্যেই চলে যান। তাঁর স্বামী টের পান না। যদিও পাশের খাটে শুয়ে বই পড়ছিলেন। বিনা মেঘে বজ্রপাত!

গভীর সমবেদনায় অভিভূত হই। ভদ্রলোক কোনোমতে অশ্রুসম্বরণ করেন। মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বলেন, 'চলে গেল। বলে গেল না। এত অভিমান!'

তিনি সভাসমিতিতে যাওয়া ছেড়ে দেন। অথচ গীতা উপনিষদ নিয়েও বসেন না। আমি তাঁকে ধর্মের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে পরামর্শ দিই। তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, 'শোক কি আমার জীবনে

এই প্রথম ? মনে নেই সেবারকার দুর্ঘটনা ? চব্বিশ ঘণ্টা যেন বায়োস্কোপ দেখি। অমন কৃতী ছেলে যশস্বী ছেলে কেমন করে চলে যায় ! ঈশ্বর থাকলে সমস্তই তাঁর ইচ্ছায় ঘটে। কিংবা তাঁরই অমোঘ নিয়মে। আর যদি কর্মে বিশ্বাস করি যে যার কর্মফল ভোগ করতে এসেছে, ভোগের শেষে দেহ রেখে যাবে। কোথায় ? এর ঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেনি ও পারবে না। ওপার থেকে তো কেউ ফিরে আসেনি।'

মাঝে মাঝে যাই। দেখা করি। জন্মদিনে শুভকামনা জানালে বলেন, 'তুই জগতের মাঝখানে আর কদ্দিন পড়ে থাকি ! ঘরেরও নই ঘাটেরও নই।'

'আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। নতুন জগতের পূর্বাভাষ দেখে যাবেন। দ্য বেস্ট ইজ ইয়েট টু বী।' আমি ব্রাউনিং থেকে উদ্ধার করি।

'না, ভাই। এ আঁধার আরো ঘন হবে। দ্য ওয়ার্স্ট ইজ ইয়েট টু বী। তখন আমার কথা মনে থাকবে তো ?' তিনি হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় দেন।

একদিন শুনি তাঁর শ্রাদ্ধ। অথচ মৃত্যুর খবরটাই আমার অজানা। যাবার সময় নাকি বড়ো নাতির হাতে একটি উপহার দিয়ে বিলিতী কায়দায় হ্যাণ্ডশেক করে বলেন, 'গুডবাই। ভালো ছেলে হবে, কেমন ?'

পথি নারী বিবর্জিতা

এক যে ছিলেন রাজা। রাজা একদিন মৃগয়ায় গিয়ে দেখেন এক পরমাসুন্দরী কন্যা গহন বনে বসে কাঁদছে। তিনি তাকে দয়া করে উদ্ধার করেন। রাজবাড়িতে নিয়ে যান। তারপরে একদিন হলো কী—

ওটা হলো রূপকথা। ওরকম রূপকথা কে না শুনেছে ছেলেবেলায় ঠাকুমা দিদিমার মুখে? কিন্তু বড়ো হয়ে আমি যা শুনেছি তা রূপকথা নয়, রূপকথার চেয়েও বিচিত্র। এক নবপরিচিত বন্ধুর মুখে। শুনে ব্যথিত হয়েছি। সেই গৌরবর্ণ আরক্তাধর সুপুরুষের জন্যে। চল্লিশ বছর বয়সেও যিনি অবিবাহিত।

সিংহলে তাঁর সঙ্গে আলাপ। সেখানে তখন তিনি উচ্চপদারূঢ় রাজকর্মচারী। ব্রিটিশ শাসন তখনো শেষ হয়নি। তাঁর মতো আরো কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে কলম্বোর বাঙালী সমাজ। দিন দশেকের জন্যে সপরিবারে বেড়াতে গিয়ে তাঁদের সকলের সঙ্গে ভাব হয়ে যায়। সকলেই আমাদের সাহায্য করেন। এক একজন এক একভাবে। ইচ্ছা তো ছিল আরো কিছুদিন থেকে সিংহল দ্বীপটাকে আর তার বৌদ্ধ সমাজটিকে ভালো করে চিনব। শুধু কয়েকটা দৃশ্য দেখাই তো দেশকে চেনা বা মানুষকে চেনা নয়।

কিন্তু অনবরত ঘোরাঘুরি করা একজনের পক্ষে ক্লান্তিকর না হলেও স্ত্রীর পক্ষে ছেলেমেয়ের পক্ষে কষ্টকর। তা ছাড়া যাঁদের অতিথি আমরা তাঁদেরও তো বিব্রত করা হয়। আবার আমরা নিজেরাও তো বিব্রত বোধ করতে পারি। তাই কলম্বো কাণ্ডি, পোলান্নারুয়া, সিগিরিয়া দর্শন করেই ক্ষান্ত হই। অনুরাধপুর— অনুরাধা নয়, অনুরাধ—রয়ে যায় দৃষ্টির বাইরে। যেখানে বোধিদ্রুমের শাখা বহন করে নিয়ে যান সঙ্ঘমিত্রা ও মহীন্দ্র। এখনো সে জীবিত। এতদিনে মহাবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

'চলুন না আমিই আপনাদের ঘুরিয়ে আনব।' প্রস্তাব করেন সেই নব পরিচিত বন্ধু বিনায়ক ভঞ্জ। 'আমার বাড়িতেই থাকবেন আপনারা। ঘরগুলো খালি পড়ে রয়েছে। আমার তো শূন্য মন্দির।'

'না ধন্যবাদ। এবার আর নয়। আমরা আজ রাত্রেই ট্রেন ধরতে চাই। পরে আবার আসব। সিংহল হচ্ছে বৌদ্ধদের শেষ আশ্রয়। যেমন দাক্ষিণাত্য হচ্ছে দ্রাবিড়দের শেষ আশ্রয়। প্রাচীন ভারতে যারা চতুর্দিকে ছড়িয়েছিল তারা এখন এক একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ। এবার আমি সিংহলের উপর চোখ বুলিয়ে নিলুম, দাক্ষিণাত্যের উপরেও নিয়েছি ও নেব। পরে আবার খুঁটিয়ে দেখব।' আমি তার প্রস্তাবের উত্তরে বলি।

'তাহলে আজকের বিকেলটা আমাকে দিন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।' তিনি আমাকে অনুরোধ করেন।

বুঝতে পারি যে কথাটা শুধুমাত্র আমার সঙ্গেই। তিনি আর আমি দুজনে মিলে স্থির করি যে বিকেলে একসঙ্গে বেড়াতে বেরোব রথ দেখতে ও কলা বেচতে। রবারের বাগান দেখতে ও কথাবার্তা বলতে। আমার স্ত্রীর তাতে আগ্রহ ছিল না। তিনি যান দোকান দেখতে ও উপহার কিনতে। বাচ্চাদের সেনগুপ্তদের ওখানে রেখে।

ড্রাইভ করেন গাড়ির মালিক স্বয়ং। মোটরে আমরা পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে চলি। চড়াই আর উৎরাই। চমৎকার পিচদেওয়া রাস্তা। সিংহলের সর্বত্র তেমনি। মোটরে করে এই কদিনে আমরা বেড়ানোর আরাম পেয়েছি। পথে কিন্তু হোটেল পাইনি। রেস্টোরান্ট পাইনি। সেইজন্যে টুরিস্ট তেমন কিছু দেখিনি।

চালাতে চালাতে বিনায়ক বলেন, 'কেমন সুন্দর দেশ দেখছেন তো? এদেশে কাজ করেও আনন্দ আছে। লোকেও খুব ফ্রেণ্ডলি। আমি যে বিজয়সিংহের দেশ থেকে এসেছি এর জন্যে আমার কত সমাদর! সেদিন একটা মানপত্র দিয়েছে দেখেছেন? লিখেছে ওরা আর আমরা পরস্পরের জ্ঞাতি। কারণ আমাদের একই পূর্বপুরুষ।'

'তা নেহাত ভুল নয়। চেহারায় কিছু কিছু মিল নেই কি? তবে ভাষার কথা বলতে পারব না।' আমি সে বিষয়ে অজ্ঞ।

'না ভাষার কথা আলাদা। তবে সংস্কৃত শব্দ প্রচুর ব্যবহার করে। আর একটা জিনিস লক্ষ করেছি। ওরা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সংস্রব রাখতে চায় না। ওদের ধর্মের মতো ওদের সংস্কৃতিও উত্তর ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত।' বিনায়ক আলোকপাত করেন।

'তা তো হবেই। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের সময় থেকেই যোগাযোগ। রামায়ণ যদিও ইতিহাস নয় তবু ঐতিহ্যেরও মূল্য আছে। আর সেই যে আমাদের ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর তারা কি কেবল বাণিজ্য করতে আসত, সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে আসত না? নিয়েও যেত লঙ্কার সংস্কৃতি। লঙ্কামরিচ না হলে আমাদের রান্নাই হয় না। রন্ধনও তো একটা কলা। সংস্কৃতির অঙ্গ।' আমি পরিহাস করি।

তিনি চালাতে চালাতে এক সময় বলেন, 'আচ্ছা, শহর ছাড়িয়ে মাইল পনেরো ষোল পথ অতিক্রম করে এলুম। এর মধ্যে ক'জন পথিককে আপনি পায়ে হাঁটতে দেখলেন?'

আমার খেয়াল ছিল না। মনে করে বলি, 'বেশী নয়। পাঁচ সাত জন।'

'তবু তো এটা কলম্বোর নিকটবর্তী অঞ্চল। সুদূর নয়।' তিনি মন্তব্য করেন। 'কেন? সুদূর হলে কী হতো?' আমি জানতে চাই।

'তাহলে আরো কম দেখতেন। যাচ্ছি তো আমরা আরো দূরে। নজর রাখুন। কমতে কমতে একটি কি দুটিতে ঠেকবে।' তিনি আমাকে জানান।

আমি এ রহস্য ভেদ করতে পারিনে। অনেকক্ষণ রাস্তার উপর নজর রেখে বলি, 'কী ব্যাপার বলুন দেখি? এমন জনবিরল কেন?'

'শুনুন তাহলে একদিন কী হয়েছিল। এ রাস্তা নয়, এমনি এক

রাস্তা দিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছিলুম ডাকবাংলায়। আমার পরিদর্শনের কাজ সেরে। গাড়িতে আমি ভিন্ন আর কেউ ছিল না। আমিই আরোহী আমিই চালক। অমন তো হামেশাই হয়ে থাকে। আমরা এদেশে চাপরাশি নিয়ে ঘুরিনে আপনাদের ওদেশের মতো।' তিনি শুরু করেন বলতে।

'তারপর?' আমার কৌতূহল জাগে।

'পথের দুধারে বনজঙ্গল। লোকালয় নেই। থাকলেও অনেকটা দূরে। লোক চলাচল খুবই কম। বেলা পড়ে এসেছে। হঠাৎ সামনে দেখি একটি মেয়েমানুষ—রাস্তার ধারে বসে কাঁদছে। আমি গাড়ি থামিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করি, কাঁদছ কেন? কোথায় যাবে? তোমার সঙ্গের লোকজন কোথায়? সে আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় না। কেবল কান্নার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। যতদূর দৃষ্টি যায় দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নজরে পড়ে না। এমনও হতে পারে যে তার সঙ্গের মানুষটি জঙ্গলে ঢুকেছে। আর কিছুক্ষণ বাদে এসে হাজির হবে। আমি ডাকাডাকি করি। সাড়া পাইনে। ওদিকে আঁধার হয়ে আসছে। একটা সিদ্ধান্ত না নিলেই নয়। একটি অসহায় স্ত্রীলোককে একলা ফেলে রেখে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যাওয়া তো মনুষ্যত্ব নয়। তার চেয়ে ওকে নিয়ে যাওয়া যাক ডাকবাংলায়। সেখান থেকে ওর গ্রামে যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। যদি সন্ধান মেলে। আমার তখন ধারণা ছিল ডাকবাংলায় আরো লোকজন থাকবে, তারা ওর ভাষা আমার চেয়ে ভালো বুঝবে, ওর স্বদেশবাসীর কাছে ও নিঃসঙ্কোচে কথা বলবে। এইসব ভেবে আমি ওকে আমার গাড়িতে উঠতে বলি। ওর পোঁটলা-পুঁটলি তুলতে বলি। ওসব দেখে মনে হচ্ছিল হাট থেকে ফিরছে। সঙ্গের লোক এগিয়ে গেছে। ও পেছিয়ে পড়েছে। কিন্তু গাড়িতে ওঠার পর টের পাই ওর মুখে মদের গন্ধ।' তিনি বলে যান।

আমি তো হাঁ। চমৎকার একটা রোমান্সের স্বাদ পাচ্ছিলুম। হঠাৎ এ কী রসভঙ্গ!.

'দেখতে কেমন? পরমা সুন্দরী কন্যা? নবযৌবনা?' আমি রসিকতা করি।

'আরে, না, না। সুন্দরীও নয় যুবতীও নয়। এদেশের অতি সাধারণ দেহাতী কালো মেয়ে। বয়স হয়েছে। আমার চেয়ে বড়ো।' তিনি কাষ্ঠহাসি হাসেন।

তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেছিলেন। আমারই সমসাময়িক। তবে কখনো দেখা হয় নি। তাঁর শিক্ষার স্থান ছিল গ্লাসগো আর আমার শিক্ষানবীশীর স্থান লণ্ডন। পড়াশুনার পর নানা দেশে ও নানা পদে কাজকর্ম করে বছর দুই আগে সিংহল সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। চুক্তির আরো তিন বছর বাকী।

'তাহলে হিচ-হাইকিং নয়?' আমি রগড় করি।

তিনি তা শুনে কোথায় আমোদ পাবেন না উল্টো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। বলেন, 'এমনি করেই মানুষ নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনে।'

'বিপদ!' আমি চমকে উঠি। 'বিপদ কিসের? বরং আপনিই তো একটি অসহায় নারীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।'

'শুনুন তো আগে সবটা'। তিনি আস্তে আস্তে গাড়ি চালান যাতে আমি ভালো করে শুনতে পাই। স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে যখন ডাকবাংলায় পৌঁছই তখন দেখি যে অন্যান্য অতিথিরা প্রস্থান করেছেন। একমাত্র আমিই সেখানে অধিষ্ঠান করছি। আমার সঙ্গে আমার চাপরাশি। সে আমার জন্যে খানা তৈরি করে রেখেছে। গা ধোবার জন্যে গরম জলও তৈয়ার। আমি সকাল সকাল শুতে যাব। আর ছিল ডাকবাংলার চৌকিদার। সে একটু পরে বিদায় নিয়ে চলে যাবে। তার গ্রাম মাইলখানেক দূরে। ডাকবাংলার অবস্থান চৌরাস্তার মোড়ে। লোকালয়ের বাইরে। যে যার চাপরাশি খানসামা নিয়ে আসেন, দুচারদিন আস্তানা গাড়েন, সারা দিন টুর করেন। রাত্রে খানার সঙ্গে পিনা।'

'আপনি তো ও রসে বঞ্চিত।' আমি তামাশা করি।

'আমি গান্ধীজীর শিষ্য। তাঁর ডাকে কলেজ ছেড়েছিলুম। জেলে গেছলুম। পরে আমার গুরুজন আমাকে বিলেত চালান করে দেন। সেখানে সবরকম প্রলোভন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলি। এখানেও চলেছি।' তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন।

'তার পরে?' আমার কৌতূহল বাগ মানে না।

'তার পরে চৌকিদার আর চাপরাশি দুজনে মিলে প্রাণপণ চেষ্টা করি স্ত্রীলোকটির নামধাম বার করতে। কিন্তু কিছুতেই পারিনে। মদের নেশায় মেয়েটি আবোল তাবোল বকে। তখন আমি হুকুম দিই ওকে চৌকিদারের গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে রাতটা ওখানে রাখতে ও পরে দরকার হলে পুলিসে খবর দিতে। হুকুমটা মাঠে মারা যায়। স্ত্রীলোকটিও নড়বে না চৌকিদার বা চাপরাশি ওর গায়ে হাত দেবে না। আমি যখন খেতে বসি ওকেও খেতে দিই। ডাকবাংলার খালি একটা ঘরে ওকে শুতে দেওয়া হয়। এর পর চৌকিদার যথারীতি বাড়ি যায় ও চাপরাশি বারান্দায় শোয়। আমি যাই আমার ঘরে। ভিতর থেকে খিল দিই। এক ঘুমে রাত কাবার।" তিনি তাঁর কাহিনীটা থামান।

পথের ধারে একটা চায়ের দোকান পড়ে। সেখানে গিয়ে আমরা চায়ের অর্ডার দিই। খাঁটি সিংহলী চা। চমৎকার স্বাদ। গাড়িতে আবার ওঠার আগে আমরা কিছুক্ষণ পায়চারি করি। হাত পা আড়ষ্ট বোধ হচ্ছিল।

'তারপর কী হলো?' আমি তাঁকে শুধাই।

'পরের দিন উঠে দেখি পাখি উড়ে গেছে। কেউ বলতে পারে না কখন ও কোন্ দিকে। আমার এমন ভ্যাবাচাকা লাগে যে পুলিশে একটা খবর দিতেও ভুলে যাই। চাপরাশি বলে ও নিশ্চয় ওর নিজের গাঁয়ের পথ ধরেছে। ঘরমুখো গোরু। এতক্ষণে হয়তো অর্ধেক রাস্তা এগিয়ে গেছে। দৌড় দিয়েও ওর নাগাল পাওয়া যাবে না। চৌকিদারও বলে তল্লাস ছেড়ে দিতে। ও তো বিদেশী নয় যে পথ হারাবে বা পথে হারিয়ে যাবে। দিনের বেলা বিপদেও

পড়বে না। তখন আমি কেবল ওর বিপদের কথাই ভেবেছি। নিজের বিপদের কথা কল্পনাই করতে পারিনি। আমার মাথায়ই আসেনি যে ডাকবাংলার খাতায় প্রত্যেকটি অতিথির নাম ঠিকানা লিখতে হয়। ও যখন একখানা ঘরে রাত্রিবাস করছে তখন ও তো অতিথি ছাড়া আর কিছু নয়। যদি বারান্দায় শুয়ে থাকত তাহলে অন্য কথা। ভদ্রতা করতে গিয়েই আমি নিয়মভঙ্গ করেছি। চৌকিদার বলে ওর জন্যে কিছু চার্জও লাগবে। সেটা অবশ্য তুচ্ছ। কিন্তু আসল কথা হলো ওর নাম ঠিকানা।' তিনি আমাকেও ভাবিয়ে তোলেন।

'কী মুশকিল' আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলি।

'অমনি করেই মানুষ নিজের কবর নিজের হাতেই খোঁড়ে। আমি ডাকবাংলার খাতায় কিছু না লিখে আলাদা একখানা কাগজে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর উদ্দেশে লিখি একটি অসহায় নারীকে পথের বিপদ থেকে উদ্ধার করে আমি ডাকবাংলায় আশ্রয় দিতে বাধ্য হই। সে তার নাম ঠিকানা জানায়নি। সকালে উঠে শুনি সে নিরুদ্দেশ। চার্জ হিসাবে এত টাকা চৌকিদারের হাতে দিয়েছি। চৌকিদার আমাকে নিষেধ করে ওসব লিখতে। আমি তার অর্থ করি, আমি যদি ওসব না লিখি চৌকিদার ও টাকাটা নিজের পকেটে পুরবে। একেই বলে হিতে বিপরীত।' তিনি করুণ কণ্ঠে বলেন।

'কেন? কেন?' আমি আরো উৎকণ্ঠিত হই।

'চিঠিখানা যাঁর উদ্দেশে লেখা তিনি উপরওয়ালাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা আমার উপরওয়ালাদের কাছে। এখন আমার বিরুদ্ধে চার্জ আমি কেন বেগানা নারীকে ডাকবাংলায় ধরে নিয়ে গিয়ে বিনা অনুমতিতে সেখানে রেখেছি ও তার সঙ্গে পান আহার ও রাত্রিযাপন করেছি। তার পরে তাকে কোথায় চালান করে দিয়েছি। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। আমি মাথা তুলতে পারিনে। বন্ধুদের একথা বলতে ওঁরা বলেন, তুমি তো নেহাত সুবোধ বালক হে! তুমি কি জানতে না যে ডাকবাংলায় মেয়েমানুষ নিয়ে গিয়ে

মউজ করা হামেশা ঘটে। চৌকিদারকে মোটা বখশিশ দিলে সব চাপা পড়ে যায়। কেউ কেয়ার করে না। তুমি কিন্তু নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ সৃষ্টি করেছ। এখন সীতার মতো তোমাকেও সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে। লঙ্কায় এসেছ যখন তখন সহজে নিষ্কৃতি নেই।' তিনি কাতর স্বরে বলেন।

'সত্যি হলেও ওটা এমন কিছু দোষের নয় যে চাকরিটা যাবে। বড়জোর সেনসার করবে। তা আপনি চার্জের জবাবে কী লিখলেন?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'লিখলুম আমি ওকে ধরেও নিয়ে যাইনি, ওর সঙ্গে পানও করিনি, আহারও করিনি, রাত্রিযাপনও করিনি, ওকে কোথাও চালানও করে দিইনি। তবে বিনা অনুমতিতে ওকে ডাকবাংলার একখানা ঘরে আশ্রয় দিয়েছি এটা ঠিক। বারান্দায় শুতে বললে ওর প্রতি অন্যায় করা হতো। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হাতের কাছে থাকলে অনুমতিও নিতুম। কিন্তু তিনি থাকেন বহুদূরে। চৌকিদারকে তো জানিয়েছি। কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে দেখতে পারেন।' তিনি আমার দিকে তাকান।

তারপর আরো বলেন, 'না, সেনসার আমি সহ্য করব না। সেনসার করলে আমি ব্যাগ ও ব্যাগেজ সমেত সিংহল ত্যাগ করব। করতে গেলুম সৎকাজ। মাথায় নিতে হবে অপবাদ! চাকরির জন্যে হীনতা স্বীকার আমার কোষ্ঠীতে লেখেনি। সিংহল ছাড়া আরো তো চাকরি আছে। ওরা যদি ছাগল দিয়ে ধান মাড়াই করতে চায় করুক গে। জানি আমি অনেকেরই ঈর্ষাভাজন। তাঁরা থাকতে একজন বিদেশী কেন এত বড়ো একটা পদ অধিকার করবে! তা নইলে সামান্য একটা ঘটনা নিয়ে এত তোলপাড়! সেনসারের পর কি আমি মুখ দেখাতে পারব? সকলেই ধরে নেবে যে আমি সত্যি অমন কাজ করেছিলুম বা করতে পারি। মানুষের রেপুটেশন চুরি গেলে আর কী থাকে! এতকাল তাকে সযত্নে পাহারা দিয়ে এসেছি।'

'তাহলে তদন্ত চলছে বলুন।' আমি কৌতূহল দমন করতে পারিনে।

'চলছে কি চলছে না বোঝা শক্ত। আমাকে আর জানায়নি। যখন জানাবে তখন আমিও গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার বক্তব্য জানাব। তবে মনে মনে স্থির করে ফেলেছি যে আমাকে অবিশ্বাস করলে আমি পদত্যাগ করব।' তিনি ঘোষণা করেন।

আমি তাঁকে আরো চিন্তা করতে বলি। লোকে বলবে নিশ্চয় কিছু ঘটেছিল, নয়তো পদত্যাগ করবে কেন? বাধ্য না হলে কি কেউ পদত্যাগ করে? এটা একটা চ্যালেঞ্জ। তিনি যেন চ্যালেঞ্জের সমুচিত উত্তর দেন। ফ্লাইট নয়, ফাইট। অশুভ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। যেমন রাম করেছিলেন রাবণের সঙ্গে। এই লঙ্কায়।

ফেরবার পথে তিনি অনেকক্ষণ মৌন থাকেন। তারপর বলেন 'আমার কিছু মন উঠে গেছে। এ সেই হনুমতীর অভিশাপ।'

'হনুমতীর অভিশাপ!' আমি প্রতিধ্বনি করি। বিস্ময়ের সঙ্গে।

'তাহলে শুনুন সে কাহিনী। আমার কেমন যেন মনে হয় একটার সঙ্গে আরেকটার সম্বন্ধ আছে। যদিও প্রমাণ করতে পারব না যুক্তি দিয়ে।' তিনি রহস্যময় করে বলেন।

'এ তো বড়ো আশ্চর্য।' আমি রুদ্ধশ্বাসে শুনি।

'একদিন ওই পথেই আমি মোটর চালিয়ে যাচ্ছিলুম। ওই ডাকবাংলার থেকে বেরিয়ে। পথে লোকজন নেই বলে গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিই। তারপর সামনে পড়ে যায় এক হনুমান দম্পতি। ঠিক রাস্তার মাঝখানে ওরা বসেছিল। ব্রেক কষতে না কষতেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। হনুমানটা পালাতে পারে না, চাপা পড়ে মারা যায়। তখন হনুমতীটির সে কী কান্না! অবিকল মানুষের মতো। আমার কাছে এসে সে মানুষের মতো করেই ওর স্বামীর প্রাণভিক্ষা করে। দুই হাত জুড়ে অনুনয় করে বলে ওকে বাঁচিয়ে দাও! বাঁচাব কী করে? আমি কি ধন্বন্তরী? ধন্বন্তরীও কি পারতেন? আমি গাড়ি থেকে নেমে হনুমানটির অঙ্গ পরীক্ষা

করি। মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। একখানা হাত বা পা নয় যে কোথাও নিয়ে গেলে সারবে। ওকে সেই অবস্থায় রেখে চলে যেতেও পা ওঠে না। গাড়িতে তুলে নিয়েই বা করব কী! অপেক্ষা করি যতক্ষণ না লোকজন জড়ো হয়। সেটা সকালবেলা। তাই লোক চলাচলের পক্ষে প্রশস্ত সময়। লোকজন এসে আমাকেই গাল পাড়ে। আমি আমার অপরাধ প্রাণ খুলে স্বীকার করি। ওদের উপরেই ছেড়ে দিই বিচারের ভার। ওরা হনুমানটিকে সরানোর ভার নেয়। জঙ্গলের মধ্যে গোর দেবে। আমি ক্ষতিপূরণ বাবদ আমার থলে উজাড় করে দিই। কিন্তু সেটা তো হনুমতীর কোনো কাজে লাগে না। সে কেঁদে কেঁদে পাগলের মতো ঘোরে। অনেকক্ষণ অবধি আমাকে মিনতি করে বলে তুমিই মেরেছ তুমিই বাঁচাও।' তাঁর গলা ধরে আসে।

আমি সমবেদনা প্রকাশ করি। আমারও মন কেমন করে। আহা বেচারি!

'ওই রাস্তা। ওইরকম জায়গা। তাহলে ওই হনুমতী নয় কেন? ওরা কি মানুষের বেশ ধারণ করতে পারে না? দেশটা যখন লঙ্কা।' তিনি অবুঝের মতো উক্তি করেন।

'ঘটনাটা সত্যি করুণ।' আমি সান্ত্বনা দিই। 'কিন্তু তা বলে কি সেই হনুমতী মানুষের রূপ ধরে আপনাকে ছলনা করতে পারে? ওটা রূপকথার জগতেই সম্ভব। আপনি যে বাস করছেন বাস্তবজগতে।'

'কিন্তু, ভাই, আমার যে শাস্তি একটা পাওনা ছিল। হনুমানের মৃত্যুর জন্যে আমিই যে দায়ী। একভাবে না হোক আরেকভাবে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হতোই। হোক না এইভাবেই। আমিও আমার রক্তমাখা হাত ধুয়ে ফেলে নির্মল হই। ওরা যদি আমার বয়ান বিশ্বাস না করে আমিও শাপমুক্ত হব। ফাইট নয়, ফ্লাইট। তিনি মনে মনে প্রস্তুত।

'প্রায়শ্চিত্ত অন্যভাবেও তো হতে পারে। জীবে দয়া আপনার ব্রত হোক। জীবহত্যা করবেন না। মাছ মাংস ছেড়ে দিন। চাকরি

ছাড়বেন কেন ? বরং বিয়ে থা করে সংসারী হোন। জীবনে একটা স্থিতি চাই।' আমি তাঁকে পরামর্শ দিই। যদিও বয়সে তিনিই আমার অগ্রজ। তাঁর এলোমেলো জীবনযাত্রা দেখে আমি আন্তরিক দুঃখিত।

তিনি আমাদের রাতের এক্সপ্রেসে তুলে দেন। তখন লক্ষ করি তাঁর মুখে প্রগাঢ় বিষাদ। বলেন, 'আরো কিছুদিন থাকতে রাজী হলেন না। হলে কত সুখী হতুম! এই কটা দিনের আনন্দের পর আবার নিরানন্দ।'

আমি তাঁর হাতে চাপ দিয়ে বলি, 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।' তারপর বুঝিয়ে দিই ওর মর্ম। কে বলেছিলেন কাকে। কবে কোথায়।

তাঁর মুখে হাসি ফোটে। 'আচ্ছা, আবার দেখা হবে।'

সিংহল থেকে ফেরার পর নিজের শোকেই আমি পাগল। কে কাকে উপদেশ দেয়! জানতুম না যে তিনিও দেশে ফিরে এসেছেন ও কংগ্রেস নেতারা তাঁকে একটা দায়িত্বের কাজ দিয়েছেন। নেতারা জেলে যাবার পর তিনি একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। একদিন আসে শুভবিবাহের লিপি। আমি আনন্দিত হই। সব ভালো যার শেষ ভালো।

চৌত্রিশ বছর বাদে সেদিন সিংহলের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এখন আমার বয়স বেড়েছে। তাই সেদিনকার মতো আমি অতটা নিশ্চিত নই যে ওটা শুধু রূপকথার জগতেই সম্ভব। রূপকথার জগৎ কোথায় শেষ হয়েছে বাস্তব জগৎ কোথায় শুরু হয়েছে কে আমাকে বলবে! বাস্তব সত্য যাকে ভাবি সেও নিপট রূপকথা হতে পারে। নিছক রূপকথা যাকে ঠাওরাই সেও নিরেট সত্য হতে পারে। ওই যে মেয়েটি অকস্মাৎ কোনখান থেকে এসে কোনখানে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল ওকি রূপকথার জগতের নয়? তাই যদি না হবে তো একটি পুরুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে কোন্ জাদুবলে? আর সেই যে হনুমতী সেই বা কেমন করে মানুষের মতো কাঁদে, হাত জোড় করে পতির প্রাণভিক্ষা করে?

যমের অরুচি

একহাতে চায়ের পেয়ালা, আরেক হাতে খবরের কাগজ। সামনে রুটি টোস্ট। পাশের চেয়ারে জীবনসঙ্গিনী। কেমন ? ওমর খায়য়ামের রুবাইর সঙ্গে মিল আছে কি না ? সংসারকান্তারে নন্দনকানন হয়তো অত্যুক্তি।

এমন সময় বেল বেজে ওঠে। কে ডাকে এত সকালে। ডাক্তার গুপ্তর ড্রাইভার। সাহেব গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। হঠাৎ! নিয়োগী সাহেব গুরুতর অসুস্থ। বার বার লাহিড়ী সাহেবের নাম করছেন। লাহিড়ী যদি তৈরী থাকেন এই গাড়ি তাঁকে নিয়োগীর ওখানে পৌঁছে দেবে। ডাক্তারের গাড়ি। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

তখনো দাড়ি কামানো বাকি। রাতের কাপড়ই ছাড়া হয়নি। কিন্তু ওদিকে যে প্রিয়বন্ধু গুরুতর অসুস্থ। এতক্ষণে কী ঘটেছে কে জানে। ডাক্তার, ড্রাইভার, গাড়ি অসুখ সব মিলিয়ে দেখলে ঘোরতর জরুরী বলেই আশঙ্কা হয়।

"কী করি, বল তো ? দাড়ি কামাতে গেলে মিনিট পাঁচেক দেরি হবেই। মৃত্যু কি সেই ক'মিনিট সবুর করবে ?" লাহাড়ী ইতস্তত করেন।

"থাক, দাড়ি কামাতে হবে না। আঁদ্রে জিদ একদিন কি দুদিন অন্তর কামাতেন। তোমার চেয়ে ঢের বড়ো লেখক।" তাঁর স্ত্রী তাড়া দেন।

তাড়াতাড়ি রাতের কাপড় ছেড়ে দিনের কাপড় পরে চট করে গাড়িতে উঠে বসেন লাহিড়ী। জীবনে কখনো অত কম সময়ের মধ্যে বেশ পরিবর্তন করেননি। ড্রাইভারকে বলেন জোরে চালাতে। না বললেও চলত।

গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে দোতলায় উঠে যান। সামনে পড়ে

নিয়োগীর শোবার ঘর। পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে আসছিল বন্ধুকন্যা লীনা। জিজ্ঞাসা করেন, "চানু কেমন আছে?"

"ওঃ আপনি, মেসোমশায়।" প্রণাম করে লীনা। "একটু ভালো মনে হচ্ছে। আসুন, ভিতরে আসুন।"

"আরে, এস, এস, নিকি। তোমার কথাই বার বার মুখে আসছিল। তা খবর পেলে কী করে? তোমার ওখানে তো টেলিফোন নেই। নিয়োগী শুয়ে শুয়ে স্বাগত জানান। একমুখ দাড়িগোঁফ। কতকাল কামাননি। ফ্যাকাসে চেহারা। ক্ষীণ হাসি। নিস্তেজ চাউনি।"

"ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে হে।" লাহিড়ী বিছানার ধারে বসেন ও বন্ধুর হাতে হাত রাখেন। না, জ্বর নেই।

"আমি কিন্তু ভয় পাইনি। জানতুম যে যমের অরুচি। নিয়োগী কী ভেবে বলেন।

"সে কী, হে!" শুনে অবাক হন লাহিড়ী।

"ভিতরে ভিতরে আমি তেতো হয়ে গেছি, ভাই। এতখানি তিক্ততা নিয়ে মরি কী করে? ক্ষমা করতে হবে, ভুলতে হবে। মরব যে, তার জন্যেও প্রস্তুতি চাই। তাই যম এযাত্রা ফিরে গেল। আজ সকাল থেকে বেশ ভালো বোধ করছি। তবে খুব দুর্বল। তুমি আবার একসময় এসো। কথা আছে। প্রাণের কথা কাকেই বা বলি! সেইজন্যেই তো বার বার তোমাকে মনে পড়ছিল।" নিয়োগী বলতে বলতে শ্রান্ত হয়ে পড়েন।

লাহিড়ী তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে সেদিন বিদায় নেন। বাইরে গিয়ে লীনার সঙ্গে দুটি একটি কথা বলেন। লীনা তাঁর জন্যে খাবার সাজিয়ে রেখেছিল। তিনি বলেন, "দূর, পাগলী! এই কি আপ্যায়নের সময়! হবে আরেক দিন।"

নিয়োগী বিপত্নীক। ছেলে বিদেশে। মেয়েও থাকে শ্বশুরবাড়িতে। খবর পেয়ে বাপের সেবা করতে এসেছে। সংসারটা চাকরবাকরদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিয়োগী সভাসমিতি করে বেড়ান। এখানে

সভাপতি, ওখানে প্রধান অতিথি। শরীরটা বেশ মজবুতই ছিল। কিন্তু উটের পিঠে কুটোর পর কুটো চাপালে যা হয়।

ডাক্তারের গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরেন লাহিড়ী। স্ত্রীকে বলেন, "এখনকার মতো সঙ্কট কেটে গেছে। তবে এখন থেকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হবে। কিন্তু রাখবে কে? লীনা তো বেশীদিন থাকতে পারবে না। চানু বেচারার এমন দুর্ভাগ্য যে ছেলের সঙ্গে বৌমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ছেলে থাকে বিদেশে। বউমা থাকেন বাপের বাড়িতে। এই কলকাতারই আরেক পাড়ায়। নাতি থাকে তাঁরই কাছে। কিন্তু এত বড়ো অসুখেও খোকাকে নিয়ে তিনি দেখতে এলেন না।"

"কী আফসোসের কথা। কিন্তু তা বলে তুমি পরের মেয়েকে দোষ দিয়ো না। তারও তো একটা কৈফিয়ত থাকতে পারে। গম্ভীরভাবে বলেন সহধর্মিণী।

"তা হলে কি বাড়িতে সব সময়ের জন্যে একজন নার্স রাখতে হবে? না, একজন নয়, দু'জন। ফতুর হতে কতক্ষণ!" লাহিড়ী উদ্বিগ্নস্বরে বলেন।

"তুমিও দেখবে যে নার্সের চেয়ে বউয়ের খরচ কম।" ভার্যার মন্তব্য।

"বউয়েরও তো অসুখ করতে পারে! তখন!" ভর্তার প্রত্যুক্তি।

"তখন বরই দেখবে শুনবে। তুমি থাকতে আমার ভাবনা কিসের!" এই বলে প্রসঙ্গটার উপর যবনিকা টেনে দেন সুপ্রভা।

তাতে কিন্তু বন্ধুর চিন্তা দূর হয় না। চানু কি বাঁচবে! কে বাঁচবে!

রবিবারের তাসের আড্ডায় গুপ্তর সঙ্গে দেখা। নিয়োগীর জন্যে লাহিড়ীকে বিমর্ষ দেখে ডাক্তার বলেন, "ভেবে কোন ফল নেই, নিকি। চানুর কেসটা এমন যে দশ বছরও হেসে-খেলে বাঁচতে পারে, আবার দশ দিনের মধ্যেই চলে যেতে পারে। কোন্‌টা বেশী সম্ভবপর যদি জানতে চাও তবে আমি বলব মাঝামাঝি একটা সময়।

ধরো, ছ'বছর। মনে রেখো, এটা নিছক সম্ভবপরতা। ইচ্ছে করলে তুমি দুয়ের জায়গায় তিন করতে পারো। কিংবা এক। আমার জীবনদর্শন জানো তো। কাজ করতে করতেই আমি মরব। আর নয়তো তাস খেলতে খেলতে। অসুখে ভুগে মরতে আমার বিলক্ষণ আপত্তি। ডাক্তারের উপর ডাক্তারি করবে কে?"

দশদিনের মধ্যেই নিয়োগী চলে যেতে পারেন একথা শুনে প্রাণটা কেমন করে ওঠে তাঁর বন্ধুর। দশ বছরের সম্ভবপরতা তাঁকে আশ্বাস যোগায় না। তিনি সেইদিনই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। সন্ধ্যাবেলা।

"তোমার কথাই ভাবছিলুম, নিকি। তারপর? সব কুশল তো?" নিয়োগী তাঁর শয্যায় বালিশের উপর বালিশ পেতে হেলান দিয়ে বসে রেডিও শুনছিলেন। বন্ধুর দিকে হাত বাড়িয়ে দেন।

"আমরা তো বেশ ভালোই আছি। তুমি আছো কেমন?" লাহিড়ী বিছানার একধারে বসে বন্ধুর হাতে হাত রাখেন।

"এযাত্রা সামলে উঠেছি। একটা লাভ হলো এই যে সারাজীবনের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া গেল। জানো, নিকি, ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একটা পালঙ্কের উপর আমরা রাত্রে শুতুম। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর থেকে সেটা আমাদের দুই ভাইয়ের এজমালী সম্পত্তি। বছর দশেক বয়সে সেই পালঙ্কে শুয়ে হঠাৎ আমার মনে একটা ভাব এলো। আমি যদি এই বয়সে মরে যাই আমার হৃদয়ে একটুও খেদ থাকবে না। জীবন আমার কানায় কানায় পূর্ণ।" নিয়োগী তদ্‌গত হয়ে বলেন।

"ছেলেমানুষী! দশ বছর বয়সে জীবন কখনো পূর্ণ হয়।" লাহিড়ী উড়িয়ে দেন।

"বাইরে থেকে দেখলে নয় ভিতর থেকে দেখলে হয়। একই অনুভূতি আমার বিশ বছর বয়সেও হয়েছিল। তখন সমুদ্রের বালুকাশয্যায় শুয়ে। না, তখনো আমার জীবনে প্রেম আসেনি। অমৃতের আস্বাদন তখনো পাইনি। তা হলেও মনে হতো জীবন

আমার কানায় কানায় পূর্ণ। যদি এই বয়সে যেতে হয় তবে আনন্দলোক থেকে আনন্দলোকে যাব। পূর্ণতা থেকে পূর্ণতায়। খেদ কিসের!" তিনি যেন সেই বয়সে ফিরে যান।

"আমি তখন তোমার সহপাঠী। কই, কোনদিন তো বলনি। তবে তখনি লক্ষ করেছি যে সংসারে তোমার মন নেই। তুমি সব কিছুতে যোগ দিলেও কোন কিছুতে লিপ্ত নও। তুমি কাছের মানুষ হয়েও দূরের মানুষ।" লাহিড়ীও অতীতে ফিরে যান।

"হ্যাঁ, স্পেস টাইমের বাইরেও আমার সত্তা আছে। ব্যবহারিক জীবনে তাকে আমি ভুলে থাকি কিন্তু সে যে আছে এ বিষয়ে আমি সচেতন। সংসার আমাকে ভোলাতে চায়। ভুলিয়েছেও। আমিও সংসারী মানুষ বনে গেছি।" নিয়োগী আত্মস্থ হয়ে বলেন।

"তাতে ক্ষতিটা হয়েছে কী! ভালোই তো হয়েছে। আমার তো আশঙ্কা ছিল যে তুমি বিয়ে থা করবে না, চাকরি বা ওকালতী করবে না, বনবাসী বা আশ্রমবাসী হবে। প্রায়ই তো বলতে আমি বেশীদিন থাকতে আসিনি, আমি শেলী কীটস বায়রনের মতো ক্ষণজীবী। এত রাগ হতো কথা শুনে!" লাহিড়ী রাগের ভাব করেন।

"এখন তো তুমি খুশি।" নিয়োগী হাসিমুখে বলেন। দাঁড়িগোফ সাফ হয়েছে।

"খুশি বলে খুশি! ষাট পেরিয়েছে, একটু বুঝে সুঝে চললে সত্তরও পেরোবে। কিন্তু এই অসুখটা বেধে একটু সন্দেহের উদ্রেক করেছে। বউদি তো নেই। কে দেখবে শুনবে? বউমারই উচিত, কিন্তু—সবই তো জানি। তাই ভাবনায় পড়েছি। দেখি কী করতে পারি।" লাহিড়ী অন্যমনস্ক হন।

"তোমাদের মতো বন্ধুরা থাকতে দুশ্চিন্তার কী আছে? হাসপাতালেও যাবো, চিকিৎসাও হবে। তার পর যা থাকে কপালে।" নিয়োগী হোহো করে হেসে ওঠেন।

লীনা ছুটে আসেন ওঘর থেকে। "বাবা, তোমার না বেশী

কথা বলা বারণ। মেসোমশায়, প্লীজ। যা বলবার আপনিই বলবেন, ওঁকে বলতে দেবেন না।"

"লীনা, আমি বলি কী, তুমি তোমার বাবার কাছে মাসকয়েক থাকার অনুমতি শ্বশুরের কাছ থেকে নাও। তোমার মতো একজন পাহারা না দিলে কে কখন এসে ওঁকে উত্তেজনা যোগাবে। ওঁর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তো কম নয়। কত জনের উনি ফ্রেণ্ড, ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড।" লাহিড়ী বন্ধুকন্যার দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকান।

"আমার যে হাত বাঁধা, মেসোমহাশয়। আমার সংসার দেখবে কে! এই যে ক'টা দিন এখানে রয়েছি এর জন্যেও কথা শুনতে হচ্ছে।" লীনা আঁচলে মুখ ঢাকে।

"নিকি, শুনলে তো? সংসার! সংসারী হয়ে কেমন সুখ!" নিয়োগী রঙ্গ করেন।

"তা হলে, লীনা, তুমিই বল কী উপায়। এই বৃদ্ধ বালকটিকে চোখে চোখে রাখার ভার কে নেবে? এর একটি মা চাই। মা বলতে বোঝায় মেয়ে। মা বলতে বোঝায় বউমা। এর দু'ই আছে। তবু এ অনাথ। দু'একজন অপরিণীতা ছাত্রী হয়তো বললে রাজী হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের গুরুজন কি অনুমতি দেবেন?" লাহিড়ী মাথা নাড়েন। লীলা কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "কিছুতেই না।"

"অথচ আমি যদি বলি যে আমি বিয়ে করব তা হলে অনুমতি দেওয়া বিচিত্র নয়।" নিয়োগী আবার হেসে ওঠেন। তাঁর মুখে কৌতুক।

"হ্যাঁ, এটা একটা উপায় বটে।" লাহিড়ীও রসিকতা করেন।

তা শুনে শিউরে ওঠে লীনা। মেয়েটি সরল। যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। বলে, "না, মেসোমহাশয়। কিছুতেই না। আপনি অত বড় পণ্ডিত হয়ে এ কি বলছেন!"

"দূর, পাগলী! আমি কি জানিনে তোমার বাবা তোমার মাকে ওয়ারশিপ করতেন?" মেসোমশায়ের গলা ধরে আসে।

লীনা কাঁদতে কাঁদতে ও ঘরে চলে যায়। ওর মনে খটকা বাধে।

"তা হলে, চানু, আজকের মতো উঠি।" লাহিড়ী বন্ধুর হাতে চাপ দেন।

"সে কী! কথাটা শেষ করতে দাও। তোমাকে বলেছিলুম যে বিশ বছর বয়সেও সেই একই ভাব। যদিও ততদিনে প্রেমে পড়েছি, বিয়ে করেছি, বাপ হয়েছি। জানতুম না কাকে দিয়ে যাবো আমার পরিবারের ভার!" নিয়োগী অন্তরের অতলে তলিয়ে যান।

"পাগলামি আর কাকে বলে!" লাহিড়ী হাকিমের মতো রায় দেন।

"ত্যাখ, নিকি, এটা হলো ইনটুইশনের ব্যাপার। আমার ইনটুইশন ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সতেজ ছিল। তার পর হলো কী একদিন সতুদার সঙ্গে দেখা। গান্ধীজীর সহকর্মী। জেল থেকে ফিরেছে। জেলের অভিজ্ঞতা ওর জীবনদর্শন বদলে দিয়েছে। বলে, ভগবান যারা মানে তারা জগতের ভার তাঁরই উপর ছেড়ে দিয়ে যে যার মুক্তির বা সদ্‌গতির কথাই ভাবে। জগৎটাকে তাঁর হাত থেকে উদ্ধার করে মানুষের হাতে না আনলে প্রকৃতির উৎপাতও থামবে না, শাসকের অত্যাচারও কমবে না, শোষকের উৎপীড়নও বন্ধ হবে না। বুঝলে, চানু। প্রথম পদক্ষেপেই ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও মানুষে বিশ্বাস। এটা না হলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিপ্লব। সতুদা আমার ভাব-জীবনে একটা ওলটপালট ঘটিয়ে দিয়ে যায়।" নিয়োগী চোখ বুজে স্মরণ করেন।

"কখনো শুনিনি তো!" লাহিড়ী আশ্চর্য হন।

"কাউকেই বলিনি যে আমি ঈশ্বরকে ছেড়ে মানুষকে ধরেছি। ঈশ্বরের বিধান বলিনে, বলি ইতিহাসের লিখন। ইতিহাস যেন একটা নাটক। তাতে আমারও একটা ভূমিকা আছে। আমি সেই ঐতিহাসিক ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যেই জন্মেছি, তাতেই আমার সার্থকতা। প্রেমিক বা স্বামী বা জনক হয়ে নয়। চিরন্তন পথিক হয়েও নয়। যে পথিক আনন্দলোক থেকে আনন্দলোকে

চলেছে। মৃত্যু যার কাছে একটা সীমান্ত। সীমান্তের ওপারেও অপর এক দেশ।" নিয়োগী বলতে বলতে আনমনা হন।

লাহিড়ী বাধা দেন না। নীরব থাকেন। একটা সিগারেট ধরান।

"সংসার আমাকে জড়ায়নি, নিকি। সে ক্ষমতা তার ছিল না। খেদ না নিয়ে আমি মরতে পারতুম চল্লিশ বছর বয়সেও, যদি না ইতিহাস এসে আমাকে বন্দী করত। তখন ইউরোপেও চলছে মহাযুদ্ধ। আর আমি ভাবছি ভারতেও যে-কোন দিন রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটবে। ঘটলে আমারও তাতে একটা ভূমিকা থাকবে। আমাকে বাদ দিয়ে কি তা ঘটতে পারে? কক্ষনো নয়।" নিয়োগী এক গ্লাস জল চেয়ে নেন।

"মাই গড!" লাহিড়ী হকচকিয়ে যান।

"চল্লিশ বছর বয়সে আর সে অনুভূতি জাগে না। তখন মনে হয় মরিতে চাহি না আমি বিপ্লবের আগে। যদি মরি তবে খেদ রবে।" নিয়োগীর ভাষা নাটকীয়।

"মরোনি। না মরে আমাদের কৃতার্থ করেছ। কিন্তু এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে! বিপ্লব! কী সাংঘাতিক!" লাহিড়ী সিগারেট নিবিয়ে দেন।

"আহা, বুঝলে না! সতুদা চেয়েছিল জার নিকোলাসের মতো লর্ড লিনলিথগাউ সিংহাসনচ্যুত হবেন। কেরেনস্কির মতো জবাহরলাল প্রোভিসনাল গভর্নমেণ্ট গঠন করবেন। তারপর সুভাষ বোস এসে লেনিনের মতো তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন। আমারও ধারণা ছিল ইতিহাস আপনার পুনরাবৃত্তি করবে। কেন করবে না শুনি? অত্যাচার কি একই রকম নয়? শোষণ কি একই রকম নয়? কিন্তু খেয়াল ছিল না জনগণ একই রকম নয়। এরা বিপ্লবের দিন বিপ্লব করবে না, করবে ধর্মের নামে দাঙ্গা হাঙ্গামা। এরা মধ্যযুগের বাসিন্দা। মধ্যযুগে কোথাও বিপ্লব হয় নি, তা জানো। সতুদার ভুল হয়েছিল। তার সঙ্গে একমত হয়ে

আমারও। ভুল যেদিন ভাঙল সেদিন দেখি দেশ ভেঙে দুখানা। দেশের মানুষও ভাগ হয়ে যাচ্ছে। যেন দু'পাল ছাগল আর ভেড়া। ইতিহাস এমন মোড় নেবে তা তো কোনোদিন ভাবিনি। কী আমার ভূমিকা! নতুন করে ভাবতে ভাবতে পঞ্চাশ পেরিয়ে যায়।" কাতর কণ্ঠে বলেন নিয়োগী।

"তখন মরতে চাওনি তো? আমাদের মহাভাগ্য।" মন্তব্য করেন লাহিড়ী।

"কী করে মরি? মাইনরটিকে মেজরিটির হাত থেকে বাঁচাবে কে? মরলে খেদ রয়ে যেত। ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করি যে একবার ইতিহাসের পাল্লায় পড়লে তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া শক্ত। একটার পর একটা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উদয় হয় আর আমি ভাবি আমারও একটা ভূমিকা আছে। বিধাতার দায় মানুষকেই বইতে হবে। সংসার আমাকে ভোলাতে পারেনি যে আমি চিরন্তন পথিক। এই দেশই একমাত্র দেশ নয়। এই যুগই একমাত্র যুগ নয়। কিন্তু ইতিহাস আমাকে তা ভুলিয়েছে। এই আমার দেশ এই আমার কাল। এই মঞ্চে আমাকে অভিনয় করতে হবে। এই সময়সীমার মধ্যে। তার আগে আমি মরতে পারব না। যদি মরি খেদ নিয়ে মরব। অথচ পারলুম কোথায়! কতটুকুই বা পারলুম! মাঝখান থেকে মাধুরী হারালুম। তিক্ততা নিয়ে যেতে হয়।" নিয়োগী একেবারে এলিয়ে পড়েন।

"থাক, থাক। যথেষ্ট হয়েছে। বুঝতে পেরেছি তোমার বক্তব্য। পরে আবার একদিন আসব। এখন একটু শান্ত হও তো দেখি।" লাহিড়ী তার হাতে ঝাঁকানি দেন।

"মাঝে মাঝে আসবেন, মেসোমশায়।" বিদায় নিতে গিয়ে মিনতি জানায় লীনা। "আমি এই মাসটা আছি। তারপরে পাটনা ফিরে যেতে হবে।"

তিনি ওকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেন, "লীনা, তোমার বাবা আমার কলেজের সহপাঠী। অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সেই সুবাদে

তুমিও আমার আর-একটি কন্যা। বল তো, মা, এই পরিস্থিতিতে কার উপরে ওঁর ভার দিয়ে যাবে?"

"সেকথা ভেবে আমার মনও খারাপ, মাথাও খারাপ হবার যোগাড়। কিন্তু আপনার ওই প্রস্তাব আমি কেমন করে মেনে নিই?" লীনা কাতরস্বরে বলে।

"তা হলে এক কাজ করো। তোমার বউদির সঙ্গে তোমার দাদার মিটমাট যাতে হয় তার চেষ্টা করো। তা হলে বউদি এসে এ বাড়ির ভার নেবে। কলকাতাতেই যখন আছে তখন বাপের বাড়িতে কেন, শ্বশুরবাড়িতে কেন নয়? বরাবরের জন্য বলছিনে। কিছুদিনের জন্যে।" তিনি অনুনয় করেন।

"আমাকে না বলে আপনি বরং ওকেই বলুন, মেসোমশায়। বিয়েতে তো আপনারও হাত ছিল। তখন তো ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।" লীনা মনে করিয়ে দেয়।

"অন্যায় প্রশংসা করিনি। কার সঙ্গে কার জোড় হবে, কার সঙ্গে বিজোড়, তা দেবতারাও জানেন না। আমি তো সামান্য মানুষ।" তিনি হাত রগড়ান।

"থাক, ও নিয়ে পস্তাতে হবে না। এখন কথা হচ্ছে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? আমার সাধ্য নয়, মেসোমশায়। বড়-লোকের মেয়ে ঘরে আনার সময় দুবার ভাবা উচিত ছিল ও মেয়ে কি অল্পে সুখী হবে? কেন বেচারীকে অসুখের মধ্যে টেনে আনা? আরো কষ্ট পাবে। দেখছেন তো বাড়িঘরের কী ছিরি! বাবার টাকা ফুরিয়ে এসেছে, মেসোমশায়। তাই দিনও ফুরিয়ে এসেছে।" লীনা চোখ মোছে।

লাহিড়ী হাঁ করে শোনেন। তারপর পা চালিয়ে দেন।

এর পরে আবার যেদিন দেখা হয় নিয়োগী আপনা হতে বলেন, "তুমি মিছিমিছি মন খারাপ করছ, নিকি। আমার অভাবটা সেবাযত্ন নয়। মিষ্টতার। আমার সকল সত্তা তিক্ত হয়ে গেছে। চারিদিকে স্বেচ্ছাচার আর অনাচার। তার উত্তরে উন্মত্ততা। একেই কি বলে

ঐতিহাসিক ভূমিকা? না, না, আমি ফিরে যেতে চাই আমার ত্রিশ বছর বয়সে। যখন সতুদার জীবনদর্শন আমার জীবনদর্শনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়নি। সতুদার বলছি কেন? বলা উচিত ত্রিশের দশকের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলের। ওদেশের আর এদেশের। যুগের সঙ্গে তাল রাখতে হবে, এই হলো আমার কাছে প্রথম। ভুল, ভুল। এখন বুঝতে পারছি ভুল। চিরন্তনের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে, সেই ছিল আমার কাছে প্রথম। ঠিক ঠিক। এখন বুঝতে পারছি ঠিক। কিন্তু ভুল পথে এতদূর এসে ঠিক পথে ফিরে যাওয়া কি সহজ? এর জন্যে চাই প্রবল ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছা অনুসারে কর্ম। বলিষ্ঠ কর্ম। আমার বল কোথায়, নিকি।" তিনি করুণ দৃষ্টিতে তাকান।

নানা কারণে দুই বন্ধুর মানসিক বিবর্তন দুই ভাবে হয়েছিল। হৃদয় অভিন্ন হলে কী হবে, মানস ভিন্ন। লাহিড়ী বলেন, "তোমার ওসব উক্তি আমার কাছে গ্রীক। তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি, বল। তোমার তিক্ততা দূর হবে, মিষ্টতা ফিরে আসবে এ যদি বিলেত বা আমেরিকা গেলে সম্ভব হয় তবে আমরা পাঁচজনে মিলে তার ব্যবস্থা করব। হয়তো সুইটজারল্যাণ্ডে কিছুদিন কাটালে দেহমন সরস ও সবল হবে। যেতে চাও তো বল।"

"ক্ষেপেছ! সেই ইউরোপ কি আর আছে! না সে আমেরিকা আর আছে! এত কাল পরে যাওয়া যেন রিপ ভ্যান উইঙ্কলের প্রত্যাবর্তন। কেউ চিনতে পারে না লোকটা কে। লোকটাও চিনতে পারে না কাউকে। ট্র্যাজেডি তো ওখানেই, নিকি। মানুষ বিশ ত্রিশ বছর বাদে মানুষকে চিনতে পারে না। তা সে যতই পরিচিত হোক। চিনতে পারে প্রকৃতি। চিনতে পারে গির্জা। চিনতে পারে জাদুঘর আর আর্ট গ্যালারি। যেতে হলে এদের জন্যেই যেতে হয়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মনের ধারা মিলবে না। তার চেয়ে ওদের লেখা পড়াই ভালো। পড়ি, যত পারি পড়ি। ওরাও আমারই মতো ইতিহাসের বন্দী। চিরন্তনের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য।" নিয়োগী বিছানার উপর সোজা হয়ে বসেন।

"তোমাকে তো আগের চেয়ে ভালোই দেখছি, চানু। বিদেশেই যাও আর স্বদেশেই থাক তুমি তোমার পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পেলেই আমরা নিশ্চিন্ত। পূর্বের মিষ্টতা ফিরে পাওয়া না পাওয়া তার পরের কথা। আজকের দিনে কারই বা মন মেজাজ তিক্ত নয়! যার অঢেল টাকা সেই হয়তো মিষ্টি কথা বলে, মিষ্টি ব্যবহার করে। কিংবা যে কথা বেচে খায়। তোমার অত টাকাও নেই, তুমি কথা বেচেও খাও না, তোমার পক্ষে তিক্ততাই তো স্বাভাবিক। মিষ্টতা আজকালকার ছেলেমেয়েদের স্বভাব থেকে উবে যাচ্ছে। দু'দিন বাদে দেখবে রসগোল্লাও আর মিষ্টি লাগছে না। সন্দেশও তেতো। সব স্যাকারিন দিয়ে তৈরি। তখন সেইটেই হবে স্বাভাবিক।" লাহিড়ী সিগারেটে টান দেন।

"না, না, আমাকে এ সমস্যা সমাধান করতেই হবে। নইলে মরবার সময় মনে খেদ রয়ে যাবে। যম আমাকে এক বছর কি দু' বছর গ্রেস দিয়েছে। বিলেত গিয়েও যে সিদ্ধি পাব তা নয়। পেতে পারি আরো কয়েক বছর গ্রেস। বেশ বোঝা যাচ্ছে, পশ্চাদ্‌অপসরণই এই ধাঁধার জবাব। কিন্তু কী করে?" নিয়োগী নিবিড় চিন্তামগ্ন।

"তোমার ঈশ্বরবিশ্বাস কি ফিরে পেতে চাও?" লাহিড়ী কৌতূহলী হন।

"চাই বইকি। কিন্তু বাধছে কোথায়, জানো, মানুষকে ভগবান নিজের সাদৃশ্যে গড়েছেন। মানুষের চেহারা দেখে মনে হবে ভগবানের চেহারা। আজকের দিনে কার দিকে তাকালে ভগবানকে দেখতে পাব, বলতে পারো?" নিয়োগীর কূট প্রশ্ন।

"আয়নার দিকে তাকালে।" লাহিড়ীর কূট উত্তর।

"তুমিই জিতলে। এস, করমর্দন করি।" নিয়োগী উৎফুল্ল হন।

"আমার নয়, তোমারই জিৎ।" লাহিড়ীও করমর্দন করেন।

এর পরে যতবার দুই বন্ধুর দেখা হয় ততবার নিয়োগীকে আরো

স্নিগ্ধ, আরো মধুর দেখায়। ভিতরে ভিতরে বদলে যাচ্ছেন। অদৃশ্য এক রসায়নে।

"রোগ সারাবার জন্যে যোগ করছ নাকি?" লাহিড়ী উৎসুক হন।

"এ রোগ সারবার নয়, নিকি। আর যোগ কি গুরু ভিন্ন হয়?" নিয়োগী বলেন।

"তা হলে কি মিষ্টি হবার জন্যে মিষ্টিমুখ করছ?" সন্দেহ হয় তাঁর বন্ধুর।

"মিষ্টি তো কবে থেকে বারণ। চায়ে পর্যন্ত চিনি খাইনে।" মনে করিয়ে দেন তিনি।

"তা হলে রূপান্তরের কী মন্তর?" লাহিড়ী ভেবে উঠতে পারেন না।

"টু বি প্রেজেন্ট অ্যাণ্ড ইয়েট নট টু বি প্রেজেন্ট। উপস্থিত থেকেও উপস্থিত না থাকা। যেমন পদ্মপত্রে জল। কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু লিপ্ত হচ্ছিনে। যখন সরে পড়ব তখন কোনো খেদ থাকবে না। যমেরও অরুচি হবে না।" নিয়োগী বলতে বলতে হেসে ওঠেন।

লাহিড়ীর ভালো লাগে না। তিনি মাথা নাড়েন। "একটা ভুল শোধরাতে গিয়ে আর-একটা ভুল করছ, ভাই। তুমি যেমন মানুষ তুমি ইতিহাস থেকে সরে গেলে বাঁচবে না। ওটা তোমার দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে গেছে। এখন আর পেছনে ফেরার পথ নেই, চানু, তবে তুমি তোমার ঈশ্বরবিশ্বাস ফিরে পেয়েছ এতে আমি সুখী। ঈশ্বর কি ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ইচ্ছামতো কাজ করছেন না?" লাহিড়ী তর্ক করেন।

"কিন্তু মানুষ যে ইতিহাসের ভিতর দিয়ে কাজ করতে গেলে ধাক্কা খায়। তিক্ত-বিরক্ত হয়। মরবার সময় তার মুখে তিক্তস্বাদ লেগে থাকে। ভাই নিকি, সংসারের বন্ধন কাটানো শক্ত নয়। কিন্তু ইতিহাসের বন্ধন যে অচ্ছেদ্য। জানি আজকাল কেউ আমার

কাছে আসে না। তবু বিশ্বাস করি এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যখন আমাকেই কিছু করতে হবে। না করলে কর্তব্যহানি। না পারলে ইমপোটেন্স।” নিয়োগী নিচু গলায় বলেন।

তাঁর জন্মদিনে তাঁর পক্ষপাতীরা দল বেঁধে তাঁর ওখানে গিয়ে অভিনন্দন পাঠ করে শোনান। প্রার্থনা করেন তাঁর সুদীর্ঘ ও নীরোগ জীবন।

নিয়োগী তো রসিক পুরুষ। তিনি প্রীতিভাষণে বলেন, “অসংখ্য ধন্যবাদ।” তারপর একটু নাটকীয় বিরাম। “কিন্তু আপনাদের নয়, আমার নিজেকেই। জীবনটা দেখছি বন্য হংসীর পশ্চাদ্‌ধাবন করে বৃথা কাটেনি। তা বলে সুদীর্ঘ ও নীরোগ জীবন নিয়ে আমি করি কী? পশ্চাদ্‌অপসরণ! বিশ বছর বয়সের প্রত্যয়ে?”

সবাই একে একে বিদায় নিলে লাহিড়ী বলেন বন্ধুকে, “এই নাও তোমার জন্মদিনের উপহার। তোমার বন্ধুজায়ার স্বহস্তে বেক করা বার্থ-ডে কেক।”

“খাসা কেক!” মুখে না দিয়েই তারিফ করেন নিয়োগী। “অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু তাঁকে নয়, তোমাকে নয়, আমার নিজেকেই। ধন্য আমি! যাবার বেলা তিক্ত স্বাদ নয় মধুর স্বাদ মুখে নিয়ে যাচ্ছি।” কেকটা না কেটেই তিনি চাকরদের হাতে দেন।

“আস্ত কেকটাই বিলিয়ে দিলে!” অনুযোগ করেন লাহিড়ী।

“দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়। আগে তো গরিবদের পেট ভরাও, তারপর দেখবে ওরাও তোমাদের পেট ভরাবে।” এই হলো নিয়োগীর গীতাভাষ্য। তথা ইতিহাসভাষ্য।

চাকররা সত্যি সত্যি দুজনের সামনে দু ভাগ কেক সাজিয়ে রেখে যায়। লাহিড়ী তো বেশ অপ্রতিভ। বলেন, “তুমিই জিতলে।”

নামবার সময় নিচের তলার ভাড়াটের সঙ্গে দেখা। তাঁর মুখে শোনা গেল বন্ধুর আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। কাঙাল গরিবদের সাহায্য করতে করতে তহবিল নিঃশেষ। ওঁরা অভিনন্দনপত্রের সঙ্গে একটা টাকার তোড়াও যদি দিতেন!

মাস কয়েক পরে। এক হাতে চায়ের পেয়ালা আরেক হাতে খবরের কাগজ। সামনে রুটি টোস্ট। পাশের চেয়ারে জীবনসঙ্গিনী। নন্দনকাননে হঠাৎ সাপ দেখে লাহিড়ী লাফ দিয়ে ওঠেন। "সর্বনাশ হয়ে গেছে! হায় হায় হায়!"

দুজনে দুই হাত জোড় করে দু মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রার্থনা করেন। চিরন্তন পথিক, তোমার যাত্রা শুভ হোক।

আহারের পূর্বে প্রার্থনা

আহারের পূর্বে ক্ষণকাল প্রার্থনা করেন আমার বন্ধু। কিন্তু মুখ ফুটে নয় মনে মনে। কী বলেন তা তিনিই জানেন। অনেকবার লক্ষ করেছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিনি, সঙ্কোচ বোধ করেছি। এবার আমার কৌতূহল প্রবল হয়।

আইডিয়াটা কী? ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদ পাওয়া? প্রশ্ন করে সেইসঙ্গে উত্তরেরও আভাস দিই আমি।

'না, হে। এটা আমার গ্রেস বিফোর মীট। তাঁর কি অন্নের অভাব যে তাঁকে আমি অন্ন নিবেদন করব! আমারই অভাব। আমাকে তিনি দিয়েছেন। বদান্যতার জন্যে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বলছি, এই যে দুটি খেতে পাচ্ছি এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এই বা ক'জন পাচ্ছে? এই বা ক'দিন পাব?' বন্ধু আপ্লুত স্বরে উত্তর দেন।

'ক'জন পাচ্ছে, সেটা ঠিক। কিন্তু ক'দিন পাব, একথা বলছ কেন? তোমার কি সত্যি এমন টানাটানি!' আমি সসঙ্কোচে শুধাই।

'তা নয়, হে। শোন তা হলে সব কথা। ত্রিশ বছর আগের সেই যে মন্বন্তর তখন থেকেই আমার এ প্রার্থনা। এটা নতুন কিছু নয়। চোখের সামনে ত্রিশ লক্ষ মানুষ খেতে না পেয়ে মারা গেল। তাদের তালিকায় আমার নাম ছিল না, কিন্তু থাকতেও তো পারত। পরে একদিন থাকতেও তো পারে। সে রকম পরিস্থিতি কি রাজা বদল করলেই এড়ানো যায়? রাশিয়াও তো ছিল স্বাধীন দেশ। তা হলে কেন অভিজাত পুরাঙ্গনারা পথে পথে ঘুরে বেড়ান? বলেন, এই নাও হীরা নীলা চুনী পান্না। দাও এক টুকরো রুটি। আমার তো সোনা রুপোও নেই, আছে কিছু কাগজের মুদ্রা। যাদের মুঠিতে রুটি থাকবে তারা কি তাদের মুঠি খুলবে?' বন্ধু আবেগের সঙ্গে বলেন।

'ওসব বিপ্লবের জন্যে হয়েছিল। আমাদের এদেশে বিপ্লব হবে না, শিকদার। তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ।' আমি তাঁকে অভয় দিই।

'হয়তো তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু আসল কথাটা হলো এই যে একদিন এই দেশেরও খোরাকে টান পড়তে পারে। সেদিন প্রশ্ন উঠবে কারা আগে খাবে। যারা ফসল ফলায় তারা, না যারা তা কিনে নিয়ে আসে বা কেড়ে নিয়ে আসে তারা। কিনে নিয়ে আসা অত সহজ হবে না, ঘোষ। কেড়ে আনতে গেলে দেখবে চাষীরাই দলে ভারী। অগত্যা পথে নামতে হবে রাজার নন্দিনীদের। সোনাদানা ফেরি করতে হবে। শেকসপীয়ার কী লিখেছেন? মাই কিংডম ফর এ হর্স। একটা ঘোড়ার দাম একটা রাজ্যের চেয়েও বেশী। তেমনি এক সের চালের দাম এক ভরি সোনার চেয়েও বেশী। আমি যখন ভাতে হাত দিই তখন এই সত্যটি মনে রাখি।' আহারে মন দেন তিনি।

কথাটা আমি হেসে উড়িয়ে দিই। খেতে খেতে বলি, 'ওটা একটা সত্য নয়। সোনার দাম সর্বদেশেই সর্বকালের চালের চেয়ে বেশী।'

শিকদার আর কথা বাড়ান না। আহার সারা হলে আমরা দুই বন্ধু বসবার ঘরে গিয়ে পুরোনো দিনের গল্প করি। সাহেবী আমলের।

'ম্যাকআর্থারকে তোমার মনে আছে? তোমার আমার চেয়ে জুনিয়র। কখনো ওকে এক স্টেশনে পাইনি। তবে প্রায়ই শুনতুম ওর নাম। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। ওর সহকর্মীদের মুখে যা শুনেছি তাই তোমাকে বলছি। ম্যাকআর্থার ওর মহকুমার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে যা পায় তাই খায়। না পেলে খায় না। ও খ্রীস্টের অনুশাসন মেনে চলতে চেষ্টা করে। সঞ্চয় করে না। কালকের জন্যে ভাবে না। বিয়ে করেনি, করবেও না। দায়দায়িত্ব নেই। আত্মভোলা মানুষ।' শিকদার বলে যান।

'নাম শুনেছি, কিন্তু কই, এসব তো কখনো শুনিনি।' আমি আশ্চর্য হই।

'তা হলে শোন। ম্যাকআর্থার তার এক সহকর্মীকে বলে, ক্ষুধা কাকে বলে তা আমরা কেউ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিনি। দিনে এতবার খাই যে ভালো করে খিদে কখনো পায় না। খেলে এত কিছু খাই যে পেট খালি থাকে না। কিন্তু সত্যিকার ক্ষুধা একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। একটা এলিমেন্টাল অভিজ্ঞতা। যেন বাঘের মুখে পড়া। আমাদের জীবনে হয় না। যাদের জীবনে হয় তাদের শরিক হতে হয়। এ তোমার ধর্মীয় উপবাস নয়। সেটা স্বেচ্ছাকৃত সাধনার অঙ্গ। তোমার ঘরে ভাত আছে, অথচ তুমি ইচ্ছা করে লঙ্ঘন দিচ্ছ। কিন্তু গরিব মানুষের ক্ষুধা সে জিনিস নয়। বিশেষ করে তাদের শিশু-সন্তানের। আমাকে পাগল করে দেয় এ রকম ক্ষুধা।' শিকদার বর্ণনা করেন।

'লোকটা ভালো। তবে মাথায় ছিট ছিল।' আমি মন্তব্য করি।

'ওর ছিটের ছিটেফোঁটাও কর্তাদের মাথায় থাকলে মন্বন্তর এড়াতে পারা যেত। কিন্তু শোন সবটা। ওর ওই একটাই ছিট নয়। ও তো বিয়ে করেনি। বোধহয় মনে মনে শপথ নিয়েছে। পভার্টি আর চ্যাসটিটি এই দুই শপথ। বোধহয় আইরিশম্যান ও রোমানক্যাথলিক। পভার্টির সঙ্গে সঙ্গে চ্যাসটিটিরও পরীক্ষা চালায়। কিন্তু অবশেষে পাগল হয়ে যায়। ওকে ছুটি দিয়ে গোপনে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বছরখানেক বাদে সুস্থ হয়ে ফিরে আসে।' বিবরণ দেন শিকদার।

'বাঁচালে।' আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

'ওর একটা গাড়ি ছিল। স্ট্যাণ্ডার্ড টেন। সেটা ও দিয়ে যায় কারখানায় সারিয়ে বিক্রি করতে। আমার দরকার ছিল। কিনি আমি। সেইসূত্রে আমি ওর উত্তরাধিকারী। দেখিনি ওকে। তবু একটা টান বোধ করতুম। কিন্তু দেখা হয় না ইংরেজ আমলে। সে আমল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়রা কে কোথায় ছিটকে পড়ে। কেউ কেউ এ দেশেই রয়ে যায়, কিন্তু সরকারের বাইরে। কদাচিৎ নতুন সরকারের চাকরিতে। ম্যাকআর্থারের কী যে হলো জানিনে।

শুধু জানি যে গাড়িটা কাজ দিচ্ছে। তাই ওকে স্মরণ করি।' শিকদার বলতে থাকেন।

'তখন আমরা নতুন জামানার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যস্ত।' আমি কণ্ঠক্ষেপ করি।

'যুদ্ধের সময় কলকাতায় ইংরেজ কোয়েকারদের একটা সেবাকেন্দ্র ছিল, জানো। সেটা ওরা স্বাধীনতার পরেও কিছুকাল চালায়। ওদের ওখানে আমি মাঝে মাঝে যেতুম। জায়গাটা কেন্দ্রীয় বলে আমার সাহিত্যিক বন্ধুরাও জড়ো হতেন। একবার আমরা গ্যেটে দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান করি। সে সময় শুনি ম্যাকআর্থার সেই বাড়িতে অতিথি হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিই। বলি, আপনার গাড়িটার আমিই ওয়ারিশ। দেখতে চান তো নিচে চলুন দেখাব। তিনি শুনে আমোদ পান। বলেন, আমিও তো আরেকজনের ওয়ারিশ ছিলুম। বুঝতে পারি যে কারখানার মালিক আমাকে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বলে গছিয়েছে! আসলে থার্ড-হ্যাণ্ড।' শিকদার কৌতুক করলেও ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ।

'তোমার কিন্তু ওটার ওপর আসক্তি ছিল।' আমি ফোড়ন কাটি।

'সেই সময় শুনি যে ম্যাকআর্থার দেশে ফিরে না গিয়ে মিশনারীদের সঙ্গে সেবাকর্ম করছেন। নোয়াখালিতে না বরিশালে। সেইখানেই তার শেষ পোস্টিং। সবাই তাঁকে চেনে আর চায়। তবে দেশভাগের জন্যে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। কলকাতার সঙ্গে যোগ রাখতে না পারলে কোণঠাসা হয়ে পড়বেন। তিনি গান্ধীজীকে চিনতেন ও ভক্তি করতেন। ভেবেছিলেন গান্ধীজী সে অঞ্চলে ফিরে যাবেন। তখন একপ্রকার যোগ স্থাপন করতে পারা যাবে।' শিকদার বলে চলেন।

'সেই শেষ দেখা?' আমি জানতে চাই।

'না, পরে আরো একবার হয়েছিল। কলকাতায় নয়। শান্তিনিকেতনে। বারো তেরো বছর বাদে। সঙ্গে একজন ফরাসী-

ভাষিণী কানাডাবাসিনী মিশনারী মহিলা। শাড়ী পরিহিতা সমবয়সিনী। আমার গৃহণীর সঙ্গেও আলাপ করেন। আমাদের সঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজন। সেই দিনই শুনি যে তিনি আইরিশও নন, ক্যাথলিকও নন, কর্নিশ ও অ্যাংলিকান। সঙ্গিনী কিন্তু ক্যাথলিক। পথের সাথী ভিন্ন আর কিছু নন।' শিকদার বিশদ করেন।

'আর কিছু হলেই বা ক্ষতি কার? নারীকে পূর্ণতা দেয় পুরুষ, পুরুষকে পূর্ণতা দেয় নারী। উভয়কে পূর্ণতা দেয় সন্তান।' আমি বলে উঠি।

'সকলের বেলা ওই একই নিয়ম নয়, ঘোষ। আমিও এককালে তোমার মতোই ভাবতুম, কিন্তু এখন আমি সন্ন্যাসীদের দিকটাও দেখতে পাই। কতক পুরুষ আছে তারা স্বভাবসন্ন্যাসী। ম্যাকআর্থার তাদের একজন। যদিও প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে জর্জর। এবার ওঁর মুখে একটা নতুন কথা শোনা গেল। কর্নওয়ালের আদি অধিবাসীরা নাকি ফিনিসিয়ান। জলপথে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায়। ম্যাকআর্থার মনে করেন তিনিও ফিনিসিয়ান নাবিকদের বংশধর। তা নইলে এশিয়ার উপর এতখানি টান কেন? বাংলাদেশের মায়া কাটাতে পারছেন না কেন? চেহারাটাও সাধারণ ইংরেজের থেকে একটু স্বতন্ত্র।' শিকদার বলেন।

আমি চমৎকৃত হই। ফিনিসিয়া তো একালের সীরিয়া।

'এক ইংরেজের মুখে এই আমি প্রথম শুনি যে তাঁর শরীরে প্রাচ্য রক্ত আছে। যে রক্ত ইহুদী রক্ত নয়। আর সেইজন্যে তিনি এদেশকেই আপনার করে নিয়েছেন। তবে এদেশ তাঁকে ঠিক আপনার করে নিতে পারে নি। তাঁকে সেধে নিয়ে গিয়ে কলেজের প্রিন্সিপাল পদে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল যোগ্যতার প্রশ্নের চেয়ে বড়ো স্বদেশিয়ানার প্রশ্ন। তথা সাম্প্রদায়িকতার। তিনি পদত্যাগ করেন ও মিশনে গিয়ে বাস করেন। সেখানে খোলেন একটি কারিগরি শিক্ষালয়। যারা শিখতে আসে তারা ভদ্রঘরের ছেলে নয়। ওদের সঙ্গেই তাঁর বনে ভালো। ওরা

ইংরেজীও শেখে। জীবিকার যোগ্য হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ ইউরোপেও গেছে।' বন্ধু আমাকে শোনান।

ম্যাকআর্থারের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ে যায় আর একজনকে। ইভান্স। তিনি ওয়েলশ। তিনি চিরকুমার। উপার্জন যা করতেন তার সামান্যই নিজের জন্যে রাখতেন। কতক পাঠাতেন তাঁর মাকে। কতক বৃত্তিরূপে দিতেন এ দেশের অভাবগ্রস্ত ছাত্র ও ছাত্রীদের। তিনিই তাঁদের অভিভাবক। ভারত স্বাধীন হলে তিনিও অকালে অবসর নেন কিন্তু এদেশেই থেকে যান। শখের মাস্টারি করেন। এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে যান।

বলি, 'ইভান্সকে তোমার মনে আছে? আমাদের চেয়ে একটু সিনিয়র।'

'মনে আছে বইকি।' বন্ধু সায় দেন। 'ওঁর কাছে আমিও কিছু শিক্ষা করেছি। 'ওঁর শোবার ঘরে একদিন দেখি ক্যাম্পখাট। জানতে চাই, ক্যাম্পখাটে শোন কেন? বলেন, পাছে সফ্ট হয়ে পড়ি। সেই থেকে আমারও ক্যাম্পখাটে শোবার অভ্যাস। পরের গিন্নীরা এসে ঘরের গিন্নীকে শুধান, এ কী অঘটন! ক্যাম্পখাটে তো একজনই শুতে পারে। তখন আমাকে একটা ডবল সাইজ ক্যাম্প-খাট কিনে মুখরক্ষা করতে হয়।'

আমি হাসি। 'দুগ্ধফেননিভ শয্যা। পাশে প্রেয়সী নারী। আমার তো, ভাই, এ না হলে ঘুম হয় না। ইভান্স বোধহয় স্টোইক।'

'আমারও মনে হতো। আর আমিও ছিলুম তাই। যুধ্যমান জগতে বাস করে স্টোইক না হয়ে আর কী হতুম! পরে উপলব্ধি করি যে ভিতরে ভিতরে অসাড় হয়ে যাচ্ছি। অমন করে দার্শনিক হওয়া যায়, কবি হওয়া চলে না। কবির হৃদয় হবে বাল্মীকির হৃদয়। সামান্য ক্রৌঞ্চ পাখির জন্যও তার হৃদয় কাতর হবে, আবার সেইসঙ্গে জন্মাবে ক্রোধ। নিরীহ দুটি প্রাণীর সর্বাধিক আনন্দের মুহূর্তে তাদের একটিকে বধ করা নিষ্ঠুরতার চরম। আমার স্টোইক ভাবটা পরে

কেটে যায়। কিন্তু দুগ্ধফেননিভ শয্যা আর আমাকে আকৃষ্ট করে না। আমি কঠিন তক্তপোশই পছন্দ করি। ততদিনে আমি মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে। জীবনকে সহজ সরল করে আনতে চাই। যাতে সভ্যতার ব্যাধি আমাকে আক্রমণ না করে।' শিকদার এমনি করে তাঁর নিজের কথায় আসেন।

প্রেস বিফোর মীট থেকে আমরা অনেকদূরে সরে এসেছিলুম। ফিরে যাবার জন্যে আমি তাঁর চিন্তাস্রোতে বাধা দিই। 'নিদ্রার প্রসঙ্গ পরে। এখন আহারের প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন। আমাকে বুঝিয়ে দাও সভ্যতা আর কতকাল এই স্তরে পড়ে থাকবে যে দেশের অধিকাংশ মানুষকে অভুক্ত রেখে অল্পাংশ মানুষ উচ্চতম চিন্তার, মহত্তম কল্পনার, প্রগাঢ়তম রসের, গভীরতম আনন্দের, উদারতম জ্ঞানের দিব্যতম চেতনার, পরিপূর্ণতম জীবনের অধিকারী হবে। কেবল রুটি জুটলেই মানুষ বাঁচে না, তার উপর আরো অনেক কিছু জোটা চাই, কিন্তু যাদের রুটিই জুটল না তাদের আর সব জুটবে কী করে? কেমন করে আমি তাদের বোঝাই যে স্বাধীনতা পেয়েছ, ভোটাধিকার পেয়েছ, এখন তো রাজার জাত হয়ে জীবন সার্থক করেছ। স্থলসেনা জলসেনা আকাশসেনা ইস্পাত কারখানা আর পরমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র তো জুটেছে। গ্রেট পাওয়ার বলে গণ্য হতে কতক্ষণ!'

আমার বন্ধু আহত হয়ে বলেন, 'তোমার ওই প্রশ্নগুলো আমার মতো অর্ধসভ্য মানুষকে না করে সভ্যতার শীর্ষস্থানীয়দের করলে পারতে। আমি তো মোটা ভাত ছাড়া খাইনে, মোটা কাপড় ছাড়া পরিনে, জবাবদিহি চাও তো আমার কাছে কেন?'

আমি বলি, 'শুধু প্রার্থনা করে কোনো ফল নেই, শিকদার। তোমাকে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে চাষ করতে হবে, ফসল ফলাতে হবে, দেশটাকে খাদ্যপদার্থে ভরে দিতে হবে। তখন দেখবে কেউ অভুক্ত থাকবে না।'

'থাকবে, থাকবে। কারণ ক্রয়শক্তি তো সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে না।

সেটা কমতে কমতে কোথায় এসে ঠেকেছে দেখতে পাচ্ছ না?' বন্ধু অধৈর্য হন।

আমি তর্ক করতে যাচ্ছিলুম, বিজ্ঞানের অসাধ্য কী আছে? মানুষকে চন্দ্রলোকে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে বাণ সংবরণ করি। তার বদলে পরামর্শ চাই, 'তুমিই বল কী করলে সবাই খেতে পরতে পাবে। তারপর জ্ঞানচর্চা রূপচর্চা রসচর্চা করবে।'

'বা! আমি কি সর্বজ্ঞ নাকি! কতটুকুই বা বুঝি, কতটুকুই বা জানি! ক্ষুধার জ্বালা যতদিন না তোমরা শিক্ষিতরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পারছ ততদিন এর কি কোনো প্রতিকার আছে, ঘোষ? অভুক্তের তালিকায় যতদিন না তোমাদেরও নাম উঠছে, ততদিন এর সমাধান নেই।' তিনি বলেন বিষাদের সঙ্গে।

'আমাদের এক প্রতিবেশিনী সেদিন আমাকে বললেন, আমরা কি এর পর ক্যানিবাল হব? কথাটা শুনে আমি আঁতকে উঠলুম, শিকদার। অথচ তাঁরা ভালো খান, ভালো পরেন। উচ্চ মধ্যবিত্ত। গাড়ি আছে।' আমি সে কথাটা জানাই।

'কী সর্বনেশে কথা!' বন্ধু শিউরে ওঠেন। 'হোটেলগুলোতে এর পর থেকে কী মাংস খেতে দেবে, কে জানে। ওয়াক! ওয়াক! থুঃ! পেট থেকে ভাত উঠে আসছে হে। কী কথাই না শোনালে! সেদিন পরমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তোমাদের উচ্চতা বেড়ে গেছে। এর পর কী জানি কী মাংস খেয়ে তোমাদের নীচতা বেড়ে যাবে। কোথায় যেন পড়েছি ওর চেয়ে সুস্বাদু মাংস নাকি আর নেই। একবার খেতে শুরু করলে কে কাকে থামাবে! নীতিবোধ তো চুলোয় গেছে।'

আমারও পেটের ভাত উঠে আসছিল। কেন যে ওকথা বলতে গেলুম। কিন্তু বুভুক্ষা যে সমাজের কোন্ স্তর অবধি পৌঁছেছে সেটা জানা দরকার। আমরা একটা নির্বোধের স্বর্গে বাস করছি। ভাগাড় থেকে গোরু মোষের চর্বি নিয়ে তা দিয়ে তৈরী হচ্ছে কী?

না সরকারী ছাপ মারা ঘী। মিউনিসিপাল ছাপ মারা মাংস যে কিসের মাংস তা কে জোর করে বলবে? আমরা কি শকুন হতে চলেছি?

'হ্যাখ, ঘোষ, কত লোক কত কিছুর জন্যে প্রার্থনা করে। ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশং দেহি, দ্বিষো জহি। আমার প্রার্থনা অত কিছুর জন্যে নয়। ডুবেলা ডুটি খেতে পেলেই আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাতে যেন ভেজাল না থাকে। ঘী আমি আগেই ছেড়েছি। মাংসটাও দেখছি এর পর ছাড়তে হবে।' বিবর্ণ মুখে বলেন শিকদার।

'মানুষের উপর তোমার বিশ্বাস নেই?' আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলি।

'আছে বইকি। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।' বন্ধু স্বীকার করেন।

'তা হলে মাংসটাও ছাড়বে কেন? ছাড়লে প্রোটিন কম পড়বে। ডায়াবিটিসে ধরবে। তোমাকে ওকথা বলে ভুল করেছি। আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিতে চাই।'

'না, না, ভুল করনি, ঘোষ। বড়ো ঘরের মেয়েরাও কী ভাবছেন সেটা আমার জানা দরকার ছিল। মানুষকে নিয়েই তো আমার সাহিত্য। কত বড়ো বিপদে পড়লে মানুষ অমন কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে! পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতাও কত সহজে ও কত কম দিনের মধ্যে বর্বরতায় পরিণত হতে চলেছে লক্ষ করে আমি আবার অসাড় হয়ে যাব না তো? সভ্যতা মানে কি উপর চটক? সেটা তো রাবণের স্বর্ণালঙ্কারও ছিল। ওদের সমৃদ্ধির ও শক্তির অবধি ছিল না, কিন্তু ওরা মানুষ ধরে ধরে খেত। এরা ধরে ধরে খাচ্ছে না তা ঠিক, কিন্তু রক্ত চুষে খাচ্ছে। অথচ কেউ এদের ধরতে পারছে না। ধরলেও ছেড়ে দিচ্ছে। উকীলেরা ছাড়িয়ে নিচ্ছেন। যেন ছাড়াবার জন্যেই আইন।' বন্ধু জ্বলে ওঠেন।

'কী করা যায়, বল! নিঃসন্দেহ না হলে তো কাউকে দণ্ড দেওয়া

চলে না। ইংরেজরা আমাদের জন্যে যে উত্তরাধিকার রেখে গেছে এইটেই তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। এইটেই ওদের তাজমহল। পুলিশ যদি সততার সঙ্গে কাজ করে, সাক্ষীরা যদি সততার সঙ্গে সাক্ষ্য দেয় তা হলে আদালত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিঃসন্দেহ হতে পারেন। দোষটা আইনের নয়, চরিত্রের।' আমি তাঁকে ঠাণ্ডা করি।

'চরিত্র হয়তো একদিন শোধরাবে, কিন্তু ঘটনা ততদিন অপেক্ষা করবে না। অন্যান্য দেশেও অপেক্ষা করেনি। এর চেয়ে বেশী খুলে বলতে আমি পারব না, আমি নিজেই জানি নে কোনটা ঘটবে: কিন্তু মানুষের খাদ্য নিয়ে এই দস্যুবৃত্তি যেমন করে হোক দমন করতে হবে! তার মানে কী আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না। হয়তো এমন কিছু বলে বসব যা সত্যি সত্যি ফলে যাবে। তখন আমাকেই তুমি দোষ দেবে। যেন আমার জন্যেই ফলে গেল। জানো তো টলস্টয়ের ছেলে কী বলেছিল?' বন্ধু প্রশ্ন করেন।

'কী বলেছিল?' আমি জানতুম না।

'বলেছিল বিপ্লবটা তো বাবার দোষেই ঘটল। আমাদের সর্বনাশ হলো। টলস্টয়ের অপরাধ তিনি চল্লিশ বছর ধরে চেতাবনী দিয়েছিলেন যে, বিপ্লব আসছে, তাকে ঠেকাতে চাও তো এইসব করো আর ওইসব কোরো না। চুপ করে থাকলে কি তার ছেলে তাঁকে দোষ দিত? বিপ্লবে আর বিপ্লবের পরে যুদ্ধবিগ্রহে কত লোক মরেছে, তা তো জানো। ওঃ ভাবতে গেলে রক্ত হিম হয়ে যায়! যারা মরেনি তারা বন্দী হয়ে শ্রমিক শিবিরে বেগার খেটেছে। খাটতে খাটতে মারা গেছে। টলস্টয়ের কথা শুনলে এসব কি হতো? কিন্তু শুনল না তাঁর ঘরের লোক যারা তারাও। সেই দুঃখেই তো তাঁর প্রাণ গেল। মৃত্যুর পরে যখন তাঁর কথা ফলল তখন তাঁকেই দোষ দিল তাঁর ছেলে।' বন্ধু খেদোক্তি করেন।

'টলস্টয়ের বেলা যা হয়েছিল তোমার বেলা তা হবে না। কথাও ফলবে না। ছেলেও বলবে না। তোমার স্ত্রীকে তো আমি জানি,

তিনিও কখনো তোমাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে রেল স্টেশনে মরতে দেবেন না। তুমি প্রোফেট নও, তুমি প্রোফেসী করতে যেয়ো না। জীবনের সত্য সাহিত্য দিয়ে যেতে চাও তো তার জন্যে আমরা কান পেতে বসে থাকব, কিন্তু তোমার প্রোফেসী বা প্রেসক্রিপশনের জন্যে নয়। তুমি হয়তো জানো না, তাই বন্ধু হিসাবে আমার কর্তব্য তোমাকে জানানো যে, অনেকের মতে তুমি একটা বোর।' আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

'বোর! আমি একটা বোর।' শিকদার বুক চাপড়ান।

'তুমি একটা প্রিগ।' আমি আর একটু সাহস পেয়ে বলি। সেই সঙ্গে জুড়ে দিই, 'অবশ্য আমার মতে নয়। অনেকের মতে।'

'আমি একটা প্রিগ!' বন্ধু মাথায় হাত দিয়ে বসেন।

'তুমি একটা কিল-জয়।' আমি আরো এক পা এগিয়ে যাই।

'আমি একটা কিল-জয়! ও হোহো!' তিনি ঢলে পড়েন।

'অবশ্য অপরের মতে। আমি তো তোমার লেখা থেকে যথেষ্ট আনন্দ পাই। তা তুমি যতটুকু পারো আনন্দ দিয়ে যাও। গান্ধীয়ানা বা টলস্টয়িয়ানা বা মুরুব্বিয়ানা তোমার মানায় না। তুমি ঢের ছোট।' আমি আরো এক পা এগোই।

'আমি ঢের ছোট!' তিনি মুষড়ে পড়েন।

'আহা! এ কি আমি বলছি! আমি শুধু রিপোর্ট করছি। তুমি তো একালের বুদ্ধিজীবীদের আড্ডায় যাও না। কফি হাউসে বা চায়ের দোকানে আমাকে ওরা কেউ চেনে না। তাই সন্দেহ করে না যে তোমার বন্ধু।' আমি কৈফিয়ত দিই।

'তুমি আমাকে একটার পর একটা শক দিলে আজ। কতকাল লাগবে মনের শান্তি ফিরে পেতে! আমি যা স্পর্শকাতর!' বন্ধু ছটফট করেন।

আমার গৃহিণী সেদিন বাড়ি ছিলেন না। থাকলে আমাকে ওসব

কথা বলতে দিতেন না। সামাজিকতার নিয়ম মেনে চলতে হতো। অতিথি তো। হলেনই বা বন্ধু। অমন করে একজনকে তার মুখের উপর 'বোর' ইত্যাদি বলে আমি যা করেছি তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করি। দুঃখটা আন্তরিক।

'ভেবে দেখেছি তোমার উক্তিই যথার্থ। আমি স্পষ্টবাদিতা পছন্দ করি। তাই তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তুমি প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছ।' তিদি গদ্‌গদ স্বরে বলেন।

তখন প্রসঙ্গটা আমি পালটে দিই। পুরোনো দিনের কথা পাড়ি। অবিভক্ত বাংলার কর্নিশম্যান আর ওয়েলশম্যানের পর স্কটসম্যানের কাহিনী।

'ডানকানকে তোমার মনে পড়ে?' আমি শুধাই।

'কোন ডানকান? ও এম ডানকান না পি ডি ডানকান?' তিনি পাল্টা শুধান।

'ও এম। লোকে যাকে বলত পাগলা সাহেব। পাগলা নন, দিলখোলা বেপরোয়া মিশুক আমুদে রগচটা ক্ষমাশীল হন্তদন্ত। শুনেছি এককালে উনি নতুন ধরনের গোযানে চড়ে সফরে বেরোতেন। তাও সপরিবারে। নিউ মডেল গোযান দেখিনি, বেবী অস্টিন দেখেছি। ওটাও সর্বত্রগামী। তখনকার দিনে এমন রাস্তাঘাট ছিল না। সাহেবদের প্রায় সকলেরই ঘোড়া ছিল। বাঙালীদেরও অনেকের। ঘোড়া থাকলে প্রেস্টিজ থাকে। কিন্তু আসল কারণটা রাস্তার অভাব! যাক, ডানকানের সঙ্গে আমি পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি। ডাকবাংলায় থেকেছি। সরল অকপট অক্লান্ত পুরুষ। এত জোরে জোরে হাঁটেন যে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটতে আমার জান বেরিয়ে যায়। তবু পাল্লা দিতে ছাড়িনি।' আমি অতীতের রোমন্থন করি।

'ও এম ছিলেন আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সীনিয়র।' বন্ধু বললেন।

'আর অনেক বেশী লম্বা চওড়া। ঝুনো নারকেলের ভিতরে

ছিল নরম শাঁস। উপরে কড়া, ভিতরে দরদী। চাষীদের উপরে ছিল তাঁর বিশেষ দরদ। বলতেন এরা আমার স্কটল্যাণ্ডের চাষী। তেমনি পরিশ্রমী, তেমনি বুদ্ধিমান। এরাই বাংলাদেশের সম্পদ। তিনি যখন দেখেন যে ধান পাটের দাম পড়ে গেছে, চাষীদের হাতে নগদ টাকা নেই, তখন জমিদারদের আহ্বান করে তাঁদের নিয়ে সভা করেন। তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেন জেলার সব বড়ো বড়ো জমিদার। খাজনা আদায় বন্ধ রাখেন। না পারলে আধাআধি মকুব করেন। ব্যতিক্রম শুধু একজন। কে জানো? মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর বড় সাহেব। তিনি সভায় তো আসেনই না, ধমক দিয়ে চিঠি লেখেন যে জমিদার ও প্রজার মাঝখানে দাঁড়ানোর অধিকার কলেকটরের নেই। প্রজাদের তিনি খাজনা বন্ধের উস্কানি দিচ্ছেন। জমিদারদের সন্ত্রস্ত করছেন। নীলবিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি। কোম্পানীর বড়সাহেবকে অগত্যা লাটসাহেবের শরণ নিতে হবে। চিঠি পেয়ে ডানকান তো ভয়ে কাঠ। অ্যাণ্ডারসনকে কে না ডরায়! ডানকান আমাকে একবার বলেছিলেন, হি ইজ এ হোলি টেরর! বেচারা ডানকান! সাহেবের সঙ্গে সাহেবের দাবা খেলায় কলেকটর সাহেব চালমাৎ।' আমার গলা ধরে আসে সমবেদনায়।

'ডানকান একটা বুড়ো খোকা। কত ধানে কত চাল না জানলে ঐ রকমই হয়। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী ছিল নীলকর কোম্পানীদেরই উত্তরাধিকারী। বাংলার চাষীকে ওরা ক্ষমা করে নি।' বন্ধু বিষণ্ন স্বরে বলেন।

ডানকান তো হেরে গেলেন। তারপর কী হলো, শোন। ইউরোপীয় জমিদারদের দৃষ্টান্ত দেখে দেশীয় জমিদাররাও বেঁকে বসলেন। প্রজারা যে তিমিরে সেই তিমিরে। অন্ধকারে আলো দেখায় কৃষক প্রজা সংগঠন। নেতারা আমাকে বলেন ওটা অসাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক। সত্যি তাই। কিন্তু পরে তাঁদেরই একজনের ভাষায় তাঁদের নেতা বনে যান বাংলার র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। জয় হয়

মুসলিম লীগের। দেশ হয় তুচির। জমিদারি উঠে যায়। হায় হায় কতকালের সব বনেদী বংশ!' আমি আক্ষেপ করি।

'যাঁরা বাঁচতে জানে না তাদের বাচাবে কে!' বন্ধু করুণভাবে হাসেন। 'আমিও কি হেরে যাইনি? কিন্তু ডানকান বলো শিকদার বলো এরা যেটা করতে চেয়েছিলেন সেটা উপর থেকে উপকার। অথচ উপরওলাদের অমতে। সেটা বাই দ্য পীপল নয়, অফ দ্য পীপল নয়, ফর দ্য পীপল। অথচ গণপ্রতিনিধিদের ডিঙিয়ে! হা হা। হা হা! ত্রিশঙ্কু! ত্রিশঙ্কু!'

'আমি করি হায় হায়। আর উনি করেন হা হা!' এরপরে আমি আবার খেই ধরি আমার কাহিনীর। 'ডানকান যখন সফরে বেরোতেন তখন তাঁর সঙ্গে থাকত খানকয় বই। লিপিটা রোমান, ভাষাটা কিন্তু ইংরেজী বা ফরাসী নয়। কী তা হলে? গায়েলিক। হাইলাণ্ডের লোকভাষা। জানতুম না যে সে ভাষাতেও সাহিত্য আছে। তা নিয়ে ডানকানের সে কী গৌরববোধ! ডিনারের পর পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেতেন। ডাকবাংলায় তিনি আর আমি। শোনাতেন আমাকে কবেকার সব ব্যালাড বা চারণগাথা। একবার ভেবে ছ্যাখ, শিকদার। কোথায় স্কটল্যাণ্ডের লোকগাথা আর কোথায় বদলগাছীর ডাকবাংলা! সাহিত্যের কি দেশকাল আছে!'

'না। মানুষ সব দেশেই মানুষ; সব যুগেই মানুষ।' তিনি স্বীকার করেন।

পরের দিন ব্রেকফাস্টে বসে ডানকান ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলেন, 'সরি, ঘোষ, ডিমের সঙ্গে বেকন দিতে পারছিনে। পর্ক আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমার বাবুর্চিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান। শুওরের মাংস রাঁধতে ওর ঘেন্না করে। কেন বেচারার মনে কষ্ট দেওয়া! চাকর বলে কি মানুষ নয়! শুনে আমার এত ভালো লাগে! পর্ক আমিও খাইনে। তবে তার অন্য কারণ। ডানকানকে ধন্যবাদ দিই।' আমি এইখানেই থামি।

'মানুষের মুখ চেয়ে একে একে অনেক কিছুই ছাড়তে পারা যায়, ঘোষ। তা বলে একেবারে অভুক্ত থাকতে পারা যায় না। সেই জন্যেই তো আমার প্রার্থনা, এই যে দুটি খেতে পাচ্ছি এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এই বা ক'জন পাচ্ছে! আমিই বা ক'দিন পাব।' তিনি বিদায় নেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেন।

মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে

ওগো, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কার সঙ্গে, জানো? আমাদের আলমোড়ার আর্টিস্ট বন্ধুর সঙ্গে। তিনি এখনো ছবি আঁকেন আর সেসব ছবির প্রদর্শনী করে বেড়ান। কলকাতায় দিন কয়েকের জন্যে আসা। প্রদর্শনী করলে কোথায় করবেন, কেউ দেখতে আসবে কিনা, কেউ কিনতে চাইবে কিনা, খোঁজখবর নিয়ে ফিরে যাবেন। তারপর আবার আসবেন, যদি আশানুরূপ সাড়া পান।

বেশীর ভাগই হিমালয়ের দৃশ্য। তুষারশীর্ষ পর্বতশ্রেণী। বনজঙ্গল। পাগলা ঝোরা। পাকদণ্ডী। পাহাড়ী পুরুষ। পর্বতকন্যা পার্বতী। বুনো হরিণ বা কাঠবেড়ালী। মঠবাড়ি। মন্দির। গিরিগুহা। সাধুজী বা যোগী। আমাকে তাঁর স্কেচবুক দেখান আর আমার অভিমত জানতে চান।

গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে আমার একটা সেমিনার ছিল। দেখি তিনিও সেখানে উপস্থিত। কিন্তু অংশ নিতে নয়। আমার সঙ্গে আলাপটা ঝালিয়ে নিতে। বলেন, "চিনতে পারছেন?"

"চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু নামধাম মনে পড়ছে না।" আমি অপ্রস্তুত হই।

"ত্রিশ বছর পরে চিনতে পারাই আশ্চর্য। সিদ্ধেশ্বরনাথ আমার নাম। পদবীটা বাদ দিয়েছি। ধাম আলমোড়া। পেশা অঙ্কন ও চিত্রণ। আমার স্টুডিওতে সস্ত্রীক আপনার পায়ের ধুলো পড়েছিল, বাসাতেও শুভাগমন হয়েছিল।" তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

"আরে, আপনি! মিস্টার বোস।" আমি হাতে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিই।

"শুনুন, কানে কানে বলি। বাঙালী বলে পরিচয় দিলে এখন

আর সর্বত্র পূজ্যতে নয়। পদবীটা চেপে যাওয়াই সুবুদ্ধি। উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্কর, অশোককুমার যে পথে গেছেন, মহাজনো যেন গতঃ—" তিনি মুচকি হাসেন।

"আসুন না, আমাদের ওখানে পায়ের ধুলো পড়ুক।" আমি প্রস্তাব করি।

"মাফ করবেন, এযাত্রা নয়। আমাকে এবার চরকির মতো ঘুরতে হচ্ছে। কী ভাগ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি এঁদের গেস্টহাউসেই উঠেছি। আপনার যদি অধমের সঙ্গে এক পেয়ালা চা মর্জি হয় তা হলে আপনাকে জবর একটা খবর দিতে পারি। চলুন না আমার ঘরে।" এই বলে তিনি আমাকে কৌতূহলী করে তোলেন।

"জবর একটা খবর। তা হলে তো শুনতে হয়।" আমি রাজী হই।

"আগে সেমিনার সারা হোক। আমি এসে নিয়ে যাব।" তিনি অদৃশ্য হন।

ত্রিশ বছর আগে তরুণ শিল্পী সিদ্ধেশ্বরনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম তিনি আলমোড়া পছন্দ করলেন কী দেখে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "কৈলাস আর মানস সরোবর যতদিন না দর্শন করেছি ততদিন এইখানেই আমার প্রতীক্ষা।"

এবার তাঁর কক্ষে চা খেতে খেতে প্রশ্ন করি, "প্রতীক্ষা কি এখনো সার্থক হয়নি?"

"হবে কী করে? চৈনিকেরা যে সৈনিক পাঠিয়েছে। সুযোগ এসেছিল, হাতছাড়া হতে দিয়েছি এই ভেবে যে বয়সটা কৈলাস-যাত্রীর উপযুক্ত হয়নি। কৈলাস দর্শন করতে হলে আর সব কিছু দেখে শেষ করতে হয়।" তিনি জবাব দেন। এরপরে সেই জবর খবরটা শোনান। বলেন, "আপনার বন্ধু রজত নন্দীও বসে আছেন আমারই মতো প্রতীক্ষায়। আপনি কি জানেন যে তিনি এখন আলমোড়ায়?"

"না, জানতুম না তো। বছর সাতেক হলো ওর কোনো চিঠিপত্র পাইনি। শেষবার লিখেছিল ও ডেরাডুনে ডেরা বেঁধেছে।" আমি রজতের কথা ভাবি।

"ডেরাডুনে ছিলেন বটে কিছুকাল, কিন্তু ওটা তো সব জিনিসের কেন্দ্রস্থল নয়। সেইজন্যে তাঁকে আলমোড়ায় কুড়ে বাঁধতে হলো!" সিদ্ধেশ্বর বলেন।

"আলমোড়া কবে থেকে হলো সব জিনিসের কেন্দ্রস্থল? কেন, গভর্নর কি আজকাল নৈনিতালে যান না?" আমি বিস্মিত হই।

"ওঃ! তা হলে আপনি আসল খবরটাই রাখেন না।" তিনি দয়াপরবশ হয়ে বলেন, "রজতদার সঙ্গে এই ছ'সাত বছরে আমার বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। বাঙালী ওখানে যাঁরা যান তাঁরা তো বারোমাস ওঁর মতো বা আমার মতো কষ্ট করে বাস করেন না। নিকট প্রতিবেশী না হলেও আমরা প্রায়ই একসঙ্গে উঠি বসি চলাফেরা করি। তিনিই আমাকে আসল খবরটা জানতে দিয়েছেন।"

"আসল খবরটা তা হলে কী?" আমি কৌতূহল বোধ করি।

"ইংরেজীতে যাকে বলে সেণ্টার অফ্ থিংজ তাঁর ইচ্ছা সেইখানে থাকতে। আজীবন চেয়েছেন।" সিদ্ধেশ্বর বলেন।

"ওর মাথায় পোকা আছে। কলকাতায় পোস্টিং কত লোক কত তপস্যায় পায়। পালাবে। কলকাতা নাকি সেণ্টার অফ থিংজ নয়। দিল্লীতে ওকে বার বার ডাকে। যাবে না। দিল্লী নাকি সেণ্টার অফ থিংজ নয়। শেষটা কিনা আলমোড়া। আলমোড়া তো আমি গেছি। কী আছে ওখানে?" আমি বিরক্ত হয়ে বলি।

"দাদার ধারণা হিমালয় হচ্ছে সেণ্টার অফ থিংজ। হিমালয়ের মধ্যে আলমোড়া হলো আরো সেণ্ট্রাল।" ব্যাখ্যা করেন সিদ্ধেশ্বর।

"কোন অর্থে? ভৌগোলিক অর্থে নয় নিশ্চয়।" আমি তর্ক করি।

"না। আধ্যাত্মিক অর্থে। আলমোড়া থেকে যাত্রীরা কৈলাস

মানস সরোবরে রওনা হয়। আবহমানকাল থেকে। প্রকৃতপক্ষে আলমোড়াই হচ্ছে মহাপ্রস্থানের পথে। আর কৈলাসই হচ্ছে স্বর্গ। রজতদা বলেন উত্তরদিকে চেয়ে, সিদ্ধেশ্বর, তোমার কি কখনো মনে হয় না যে আমরা মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে? একদিন যাত্রা হবে শুরু। অবশ্য ওটা ওঁর রসিকতা। আমিও পরিহাস করে বলি, আপনি তো একটি ভুটিয়া কুকুরও কুড়িয়ে পেয়েছেন। স্বয়ং ধর্মরাজ আপনার অনুগামী হবেন।" সিদ্ধেশ্বর হাসেন।

আমার তো ধারণা ছিল হরিদ্বার হৃষীকেশের পথই মহাপ্রস্থানের পথ। পতিতপাবনী গঙ্গা যে পথ দিয়ে নেমে এসেছিলেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেই পথ বেয়ে উঠে গেছলেন। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল। আধ্যাত্মিকতার তো বিভিন্ন কেন্দ্র আছে। আলমোড়াও একটি কেন্দ্র। সেখানে অত ভিড় নেই। নির্জনে বসে সাধনা করা যায়। কিন্তু আমার বন্ধু রজত যেরকম মানুষ তার জীবনের পরিণতি তো ওরকম হবার কথা নয়।

আমাকে চিন্তামগ্ন দেখে সিদ্ধেশ্বর বলেন "রজতদাকে দেবার মতো কোনো বার্তা থাকলে আমি বহন করে নিয়ে যেতে পারি।"

"বার্তা?" আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। বলি, "মানস সরোবরে যাক আর কৈলাসেই যাক ওকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে পেতে চাই। মহাপ্রস্থানিকদের মতো হারাতে চাইনে। চৈনিকরা পথরোধ করে বসে আছে যতদিন ততদিন আমি নিশ্চিন্ত। তবে রজতকে তো জানি। দশ বছর অন্তর অন্তর ওর সেণ্টার অফ গ্রিংজ বদলায়। শুনেছেন বোধহয় ওর মুখে ওর ইতিকথা।"

"না তো। পূর্বাশ্রম সম্বন্ধে সাধুরা যেমন নীরব রজতদাও তেমনি। ভেক ধারণ না করলেও উনিও একজন সাধু। রামকৃষ্ণ কুটিরের স্বামীজীদের সঙ্গে প্রায়ই ওঁকে দেখি। আমি আর্টিস্ট মানুষ। আমার সাধনা ভিন্ন মার্গের। আমি তাঁর পূর্বজীবন সম্বন্ধে এইটুকুই জানি যে তিনি একজন বড়ো চাকুরে ছিলেন। কিন্তু সেটা শুধু পাথেয় সংগ্রহের জন্য। পথ আর পাথেয় তাঁর বেলা একাকার

হয়নি। যেমন আমার বেলা। তাই এত কষ্টও পাননি। আয়েসী অভ্যাস এখনো ছাড়তে পারছেন না। বাবুর্চি ও বেয়ারা না হলে তাঁর চলে না। কী করে যে কৈলাসযাত্রী হবেন! মহাভারতে কি লিখেছে যে পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁদের ভৃত্যরাও সহযাত্রী হয়েছিল ?" সিদ্ধেশ্বর কুট প্রশ্ন করেন।

ওরা দুজনে ওর চাকুরিজীবনের সাথী। এখনো রয়েছে শুনে খুশি হলুম আমি। জানতুম যে ওর স্ত্রীর সঙ্গে ওর বহুদিন থেকে ছাড়াছাড়ি। তিনি মুসলমান বাবুর্চির হাতে খাবেন না। রজতও ওর অনুগত ভৃত্যকে বিদায় দেবে না। একদিকে সংস্কার, আরেক দিকে নীতি। নীতির প্রশ্নে স্বামী অটল, সংস্কারের প্রশ্নে স্ত্রী। চাকুরিজীবনে দুজনের জন্যে দু'রকম বন্দোবস্ত ছিল। বাইরের লোককে সেটা জানতে দেওয়া হত না। পরে তিনি বড়ো ছেলের কাছে চলে যান। পাটনায়।

"শুভদা কি একবারও আসেন না ?" একটু অন্তরঙ্গ স্বরে শুধাই।

"না, ওঁর শীত সহ্য হয় না। আলমোড়ায় গ্রীষ্মকালেও ওঁর কাছে শীতকাল। রজতদা অবশ্য মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা করে আসেন।" সিদ্ধেশ্বর বলেন।

আমি উঠতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু শিল্পীর অনুরোধে স্কেচবুকের পাতা ওল্টাতে হলো। ছোট মাপের তৈরি ছবিও কয়েকখানি ছিল। বেশ পাকা হাত। আমি তারিফ করি। বলি "আপনি প্রদর্শনী করলে আমরাও দেখতে আসব।"

আমরা তিন বন্ধু যেদিন ভিকটোরিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে লণ্ডনের মাটিতে পা দিই সেদিন রজত গদ্‌গদ স্বরে বলে, "হাউ ওয়াণ্ডারফুল! উই আর নাউ অ্যাট দ্য সেণ্টার অফ থিংজ।" চোখে ওর পলক পড়ে না।

পরে আমি এই নিয়ে পরিহাস করলে ও বলে, "ছাখ, প্রভাকর,

প্যারিসেও তো কিছুক্ষণের জন্যে নামতে হয়েছিল। তখন তো আমার মনে উদয় হয়নি যে আমরা এখন সব জিনিসের কেন্দ্রস্থলে। প্যারিসের সঙ্গে আমার আত্মার আত্মীয়তা। লণ্ডনের সঙ্গে তেমন নয়। তবু এখানেই আমি অনুভব করি যে আধুনিক সভ্যতার সামগ্রিক দর্শন এই অবস্থান থেকেই পাওয়া যায়। আর সব অবস্থান একপেশে।"

একজনের অনুভূতির সঙ্গে আরেকজনের তর্ক করা শোভা পায় না। আমি ওর মন রাখা কথা বলি। "হ্যাঁ, একটি ছোটখাটো জগৎ।"

"যা বলেছ। এইখানেই বিশ্ব একনীড় হয়েছে। কে না আশ্রয় নিয়েছেন এখানে! ভলতেয়ার, মাৎসিনি, কার্লমার্কস, লেনিন, সান ইয়াৎ সেন। বিচিত্র উপলক্ষে এসেছেন রামমোহন, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, নওরোজী, গান্ধী। কত রকম আইডিয়া এইখান থেকে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম, ফেমিনিজম, লিবারলিজম।" রজত উচ্ছ্বসিত।

মার্কস লেনিনের মতো ব্রিটিশ মিউজিয়ামই ছিল ওর প্রধান আশ্রয়। সেইখানেই ওর জন্যে একটা আসন নির্দিষ্ট ছিল। অবশ্য সরকারীভাবে নয়। আসনে বসে একসঙ্গে কয়েকখানা বইয়ের নাম লিখে পরিচারকের হাতে দিত। সারাদিন অধ্যয়নে অতিবাহিত হতো। মাঝখানে আধ ঘণ্টার জন্যে বাইরে গিয়ে চেনা রেস্টোরাণ্টে এক কোর্সের লাঞ্চ সেরে আসত, কিন্তু চায়ের সময় চা খেতে যেত না।

"কেন্দ্রস্থলে বাস করে তা হলে তোমার লাভটা হলো কী? ঘুরে ফিরে দেখলে না তো সব জিনিস।" আমি একদিন বলি।

"তার জন্যে তো তুমিই রয়েছ। তোমার চোখে আমিও দেখছি। তুমি বর্ণনা কর, আমি শুনি। আমার সময় এত কম যে আমাকে বেছে বেছে দেখতে হবে, সব নির্বিচারে দেখতে পারব না।" রজত কৈফিয়ত দেয়।

তা বেছে বেছে ও যা দেখত তা দেখবার মতো। যা শুনত তা শোনবার মতো। এই যেমন আনা পাভলোভার নৃত্য। শালিয়াপিনের গান। ক্রাইসলারের বেহালা। বানার্ড শ ও বারট্রাণ্ড রাসেলের বক্তৃতা। সিবিল থর্নডাইক ও ইডিথ ইভান্সের অভিনয়। আর্ট গ্যালেরিতে বা রয়াল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী।

“না, অল-রাউণ্ড হবার অভিলাষ আমার নেই। লেওনার্দোর যুগে সেটা সম্ভব ছিল। এযুগে আর নয়। তা হলেও সমগ্র দর্শন আমার অন্বিষ্ট। আমি সমগ্র বিশ্বের নাগরিক।” রজত আমাকে শোনায়।

“আগে নিজের দেশ, তার পরে সমগ্র বিশ্ব। আগে ভারতের স্বাধীনতা তার পরে বিশ্বমানবের একতা।” আমার সাফ কথা।

“ভারতের স্বাধীনতা যদি আরো পঞ্চাশ বছর পরে হয় ততদিন কি আমি বেঁচে থাকব! এ জীবনে তা হলে করে গেলুম কী! মনে রেখো, প্রভাকর। একটা দেশ একশো বছর অপেক্ষা করতে পারে, একটি ব্যক্তি তা পারে না। দেশের ভার কালের উপর ছেড়ে দাও। নিজের ভার নিজের হাতে নাও। আজ তুমি আছো দশ বছর পরে নাও থাকতে পারো। এমন কিছু করে যাও যাতে তোমার আপনার তৃপ্তি।” রজত তার নিজের কথা বলে আমার বকলমে।

আমার মন তখন পড়ে আছে ভারতে। গান্ধীজীকে ঘিরে। ফি হপ্তায় ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’ পাই ও প্রত্যেকটি লাইন পড়ি। মাঝে মাঝে রজতকে পড়ে শোনাই। হ্যাঁ, আমরা এক বাসাতেই থাকতুম। পাশাপাশি দুখানা ঘরে।

“মীন্স সম্বন্ধে গান্ধীজীর কথাই শেষ কথা। আমি ওর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু এণ্ডস সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ গভীর। আমি কেবল ভারতের সন্তান নই, আমি আধুনিক যুগেরও সন্তান। দেশ আমার জননী, যুগ আমার জনক। আমি মধ্যযুগের

আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পারব না। প্রাচীন যুগের আবহাওয়ায় তো সঙ্গে সঙ্গে মারা যাব। স্বাধীন ভারত যদি প্রাচীন বা মধ্য-যুগের ভারত হয়, আমি ওর কোল থেকে সাত হাজার মাইল দূরে।"

রজত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

আমি হেসে বলি, 'অতখানি মাতৃভক্তি তোমার নেই। অকৃতজ্ঞ সন্তান!"

'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' সেও হাসে।

বছর দুই যেতে না যেতে যেমন আমার মন কেমন করতে লাগল তেমনি রজতেরও। মাতৃভূমির জন্যে। আত্মীয়স্বজনের জন্যে। ভালোবাসার জন্যে। রজত কিন্তু সেটাকে কৌশলে ঢাকা দেয়। বলে 'সিদ্ধ বাঁধাকপি আর সিদ্ধ ফুলকপি খেতে খেতে সিদ্ধপুরুষ হয়ে গেছি। মা-কাকিমাদের হাতে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন খেতে ইচ্ছে করছে।'

'ওঃ! এইজন্যেই এত দেশপ্রেম।' আমি মস্করা করি।

দেশে ফিরে আসার পর শুরু হয় ওর কর্মজীবন। মফঃস্বলের স্টেশনে বাবুর্চি ও বেয়ারা নিয়ে সংসারযাত্রা। অ্যাংলো-মোগলাই খানা। 'ওমা, কী ঘেন্না!" মা-কাকিমা শতহস্ত দূরে থাকেন। তাঁদের জন্যে অন্য ব্যবস্থা হয়, কখনো যদি কেউ বেড়াতে আসেন। ওঁরাই ওর বিয়ে দেন। স্ত্রী এসে বাবুর্চিকে বিদায় দেন, কিন্তু দু'দিন বাদে বুঝতে পারেন যে চাকরির যা নিয়ম। তখন আবার সেই বাবুর্চির প্রবেশ কিন্তু ঠাকুরের প্রস্থান নয়। হিন্দু মুসলিম সহ-অবস্থান। সদরে অন্দরে পার্টিশন। সতেরো বছর বাদে যা নিয়ে দেশ পার্টিশন হয়ে যায়।

আমার সঙ্গে ওর বছরে দু'বার দেখা হয়। বিভাগীয় পরীক্ষার সময়। বলে ওর সেন্টার অফ থিংজ সরে গেছে। কোথায়, সেকথা খুলে বলে না। কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেয়। আমি তো অবাক।

'ক্যাপিটালিজম থাকলেই তার ব্যাধি থাকে। কখনো যুদ্ধবিগ্রহ, কখনো মন্দা। যুদ্ধ শেষ হবার বারো বছর যেতে না যেতে মন্দা ঘনিয়ে এসেছে। মন্দার জন্যে দরকার আসুরিক চিকিৎসা, ফাসিজম।

তার থেকে আর একদফা যুদ্ধ। ইতিহাস চলবে বৃত্তাকারে যতদিন না মানুষ এই সংকটের মূলোৎপাটন করতে প্রস্তুত হয়।' রজত ভেবেচিন্তে বলে।

'চরকা আর খদ্দর?' আমি সংকেত করি।

'চরকা আর খদ্দর মানে ধনতান্ত্রিক বিবর্তনের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন। পশ্চিম রাজী হবে না এতে। একটি মানুষকেও তুমি রাজী করাতে পারবে না। জার্মানীর ষাট লক্ষ বেকারকেও না। তার চেয়ে ওরা ফাসিস্ট হবে। মারবে ও মরবে। তোমার একমাত্র ভরসা ভারতের মত দেশ। তবে ক্যাপিটালিজম এদেশেও অনেকদূর এগিয়েছে। সে কি স্বেচ্ছায় পেছিয়ে যাবে? তোমার স্বদেশের ক্যাপিটালিস্টরাও সুবোধ বালক নয়। বিদেশীরা হটে গেলে স্বদেশীরা তাদের ফাঁক ভরাবে।' রজতকে চিন্তান্বিত দেখায়।

'বেশ তো ক্ষতিটা কি! দেশের টাকা দেশে থাকবে। আমি মন্তব্য করি।

'থাকলই বা। মন্দা এড়াবে কী করে? যুদ্ধ ঠেকাবে কী করে? আমি তো, এখন দিশাহারা। পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন যদি সম্ভব হতো তাহলেও আমি ওতে রাজী হতুম না। আর সম্ভব নয়, প্রভাকর। সঙ্গতও নয়। নতুন করে শিং ভেঙে বাছুর হওয়া যেমন। আরো পড়তে হবে। আরো ভাবতে হবে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের অভাব আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। কিন্তু সেখানেও ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। বিয়ে করে বসে আছি। উনি আবার জন্মশাসনে বিশ্বাস করেন না।' রজত বলে ওর দুঃখের কাহিনী।

আমি কিন্তু দুঃখিত হইনে। বলি, 'স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেয়ো না। দু' তিনটির পরে দেখবে ওঁর ইচ্ছে থাকবে না।'

'ততদিনে আর আমার হাত-পা খোলা থাকবে না। সব জিনিসের কেন্দ্রস্থলে যাব কী করে? যদিও বুঝতে পারছ যে, লণ্ডন আর সেণ্টার অফ থিংজ নয়। এই মন্দায় ওর অবস্থা কাহিল

হয়েছে। বনেদী গণতান্ত্রিক দেশ বলে ফ্যাসিজমটা পরিহার করতে পারবে। কিন্তু যুদ্ধ ওর কপালে লেখা আছে।' রজত বলে ভারাক্রান্ত স্বরে।

'নাঃ। যুদ্ধ আর বাধবে না। লীগ অফ নেশনস রয়েছে যে!' আমি আশাবাদী।

'ওঃ! তোমার সেই লীগ অফ নেশনস ইউনিয়ন! মড্ কেমন আছে?' ও জানতে চায়।

'চুপ! চুপ! ভুলতে চেষ্টা করছি। জানি অসম্ভব।' আমি চুপি চুপি বলি।

'এর পরে বহুকাল ওর সঙ্গে দেখা হয় না। বদলীর পর বদলী। ওরও। আমারও। শেষে একদিন ঘটনাক্রমে এক ট্রেনে ভ্রমণ। ও আসছিল উত্তর থেকে। আমি পূর্ব থেকে। পোড়াদা জংশনে দেখা। কী চমৎকার করিডর ট্রেন ছিল আসাম মেল!'

কথায় কথায় জানা গেল ওর মনের উপর তখন ওয়েব দম্পতির বিরাট গ্রন্থ 'সোভিয়েট কমিউনিজম: এ নিউ সিভিলাইজেশন' কাজ করছে। লণ্ডনে থাকতেই ফেবিয়ানদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল। ও নিজেও একজন ফেবিয়ান। তাই ওর ধর্মগুরুদের গ্রন্থ ওকে রাশিয়ার পক্ষপাতী করেছে। সব জিনিসের কেন্দ্রস্থল এখন আর লণ্ডন নয়, মস্কো।

'ছেলেবেলায় শুনেছিলুম হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে। বড়ো হয়ে মনে হলো হোয়াট ব্রিটেন থিঙ্কস টুডে। এবার আমার ধারণা হোয়াট রাশিয়া থিঙ্কস টুডে। কিন্তু মোর ডানা নাই আমি আছি একঠাঁই সেকথা যে যাই পাসরি!' সে করুণ কণ্ঠে বলে।

'খবরদার রাশিয়ায় যেয়ো না। গেলে আর ফিরতে পারবে না। এরাও ফিরতে দেবে না, ওরাও ফিরতে দেবে না।' আমি জুজুর ভয় দেখাই।

'ওসব বাজে কথা!' ও হেসে উড়িয়ে দেয়। 'লণ্ডনে আমার খুঁটির জোর আছে। গেলে তো আমি এখান থেকে সরাসরি যাব

না। যাব লণ্ডন হয়ে ক্রিপস কিংবা কোল কিংবা লাস্কির পরিচয়পত্র নিয়ে। এদেশের ইংরেজরা আমাকে চেনে না। কিন্তু ওদেশে আমি অপরিচিত নই, প্রভাকর।'

ওকে হুঁশিয়ার করে দিই যে পুলিশ ওর উপরে নজর রেখেছে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হয়েছি ওর উপরওয়ালাদের উপর নির্দেশ, 'কীপ এন আই অন ইয়ং নাগু।'

'তুমিও যেমন! আমি কি এত বোকা যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশব! আমার আগ্রহটা এদেশে কী হচ্ছে তাতে নয়, মূল রাশিয়ায় কী হচ্ছে তাইতে। আর একখানা বই হাতে এসেছে। 'মস্কো ডায়ালগস'। মোস্ট ইন্টারেস্টিং। ঘটনা কিছু নয়, তত্ত্বই আসল। ডায়ালেকটিকস না জানলে তুমি অন্ধকারেই থাকবে। ইংরেজদের সঙ্গে ওইখানেই রাশিয়ানদের তফাত। রজত এমন করে বলে যেন রাশিয়ানরাই এককাঠি সরেশ।

আমি আর কথা বাড়াইনে। বুঝতে পারি ওকে এখন রাশিয়াতে পেয়েছে! শুধু ওকে কেন? ওয়েব দম্পতিকেও। রম্যাঁ রলাঁকেও। আঁদ্রে জিদকেও। হয়তো বা রবীন্দ্রনাথকেও। ইংরেজদেরও সে বোলবোলাও আর নেই। হিটলার ওদের ঢিট করবার জন্যে পাঁয়তারা কষছে। আমার সহানুভূতিটা কিন্তু ইংরেজদের দিকেই। যদিও আমি স্বরাজ চাই।

বেচারা রজত! একদিন ওকে দেখি বিষাদের প্রতিমূর্তি। কলকাতায় একটা বিয়েবাড়িতে দেখা। কানে কানে বলে, 'কথা আছে। যেয়ো না।'

'কী ব্যাপার!' নিরিবিলি পেয়ে জিজ্ঞাসা করি।

'বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ স্টালিন। আর কাউকে বাঁচতে দেবে না। বিলুপ্ত করে দেবে। প্রথমে ভেবেছিলুম ওটা প্রোপাগাণ্ডা। তা নয়। লণ্ডন থেকে কনফারমেশন পেয়েছি। এণ্ড জাস্টিফায়েস মীনস বলে কোনো সান্ত্বনা নেই, প্রভাকর। রেভোলিউশন জাস্টিফাই করা যায়। তা বলে রেন অফ টেরর কি আমি

কখনো জাস্টিফাই করতে পারি? অত বড়ো স্কেলে?' রজত কাতরায়।

'ফ্রান্সেও তো বিপ্লবের পরে রেন অফ টেরর হয়েছিল। দেশটা অত বড়ো নয় বলে অত বড়ো স্কেলে নয়। মরালিটির দিক থেকে জাস্টিফাই করা যায় না, কিন্তু ইতিহাসের নিয়ামক কি মরালিটি না নেসেসিটি?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করি।

ও জবাব দেয় না। তখন আমিই বলি, 'পৃথিবীতে একটিমাত্র দেশ আছে, যেখানে একজন মাত্র নেতা আছেন, যিনি যুদ্ধ আর বিপ্লবের একটা মৈতিক বিকল্প আছে কিনা তা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। এণ্ড জাস্টিফায়েস মীনস তাঁর নীতিবাক্য নয়। কিন্তু সব দেশের পলিটিসিয়ান ও মিলিটারিস্টদের ওটাই হলো খেলার নিয়ম। যুদ্ধের সময় ইংরেজরাও কি ন্যায়নীতি মেনে চলে?'

'তুমি যাই বলো না কেন, প্রভাকর, স্টালিনের দেশে বাস করতে আর আমি উৎসাহ বোধ করিনে। মস্কো এখন থেকে আমার সেন্টার অফ থিংজ নয়।' বেদনায় ওর কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আমি খুশি হয়ে বলি 'তোমার সেণ্টার অফ থিংজ তোমার নিজের দেশে। একবার দেশের দিকে দৃষ্টি ফেরাও দেখি।'

এর পর ওর সঙ্গে আবার আমার দেখা হয় বদলীর পথে কলকাতায়।

'মীনস নিয়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে কোনোদিন আমার মতভেদ ছিল না, তা তো জানো। এণ্ডস নিয়েই যা-কিছু পার্থক্য। আর সেটা বেশ গভীর। এখন উনিও কতকটা পথ আমার দিকে এগিয়েছেন, আমিও কতকটা পথ ওঁর দিকে এগিয়েছি। উনিও জাতপাত মানেন না, আমিও আধুনিক বলতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বুঝিনে। তাহলেও কিছুটা ফাঁক রয়ে গেছে দু'জনের মাঝখানে। সেইজন্যে আমি গান্ধীবাদী বা গান্ধীপন্থী বলে পরিচয় দিইনে। দূরে দূরেই থাকি, তবে ইতিমধ্যে একদিন দেখা করে এসেছি।' রজত বলে।

'এখন থেকে তোমার সেণ্টার অফ থিংজ তাহলে সেবাগ্রাম ?' আমি বলি।

'যেখানেই গান্ধীজী, সেখানেই সেণ্টার। সেণ্টার এখন একটি স্থান নয়, একটি পাত্র। ইতিহাসের হীরো। প্রোফেটও বলতে পারো।' রজত বলে প্রত্যয়ের সঙ্গে।

শুনে আনন্দ হয়। রজতের এই পরিবর্তনটা আমার মনোমত।

বেচারা রজত! আট বছর বাদে একদিন ওকে কাঁদতে হলো। কেঁদে কেঁদে বলে 'এ কী হলো, ঈশ্বর! এমন তো কথা ছিল না। হানাহানি কাটাকাটি ভাগাভাগি রাগারাগির মধ্যে হঠাৎ বিদায় হয় ইংরেজ। তেমনি হঠাৎ বিদায় নিলেন গান্ধীজী। এ কী হলো, প্রভাকর!'

আমি ওর দু' হাত ধরে বলি, 'উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া ভেঙে পড়িস না রে।'

'আমি ভেঙে পড়িনি, প্রভাকর। ভেঙে পড়েছে আমার সেণ্টার অফ থিংজ। এই নিয়ে বার বার তিনবার। এ বয়সে কোথায় পাই চতুর্থ একটা সেণ্টার। স্থানই বা কোন্‌টা। পাত্রই বা কোন্ জন! চোখে আঁধার দেখছি, ভাই।' দুচোখ মোছে রজত।

'ওঃ! এই কথা! কেন, দিল্লী আর জবাহরলাল? মহাত্মার অধিষ্ঠান রাজঘাট। জবাহরলাল তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী।' আমি প্রবোধ দিই।

রজত শান্ত হয়। কিন্তু কয়েক বছর বাদে আবার যখন দেখা হয় তখন মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝিয়েছিলে, প্রভাকর। দেশ স্বাধীন হয়েছে মানে গান্ধীজীর শাসন থেকে স্বাধীন হয়েছে। ত্রিশ বছর ধরে তিনি যত্ন করে যা শিখিয়েছিলেন তা বেবাক অগ্রাহ্য করেছে। এণ্ডস আর মীনস এ দুটোর একটাও কারো মনে দাগ রেখে যায় নি। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে হেন কর্ম নেই যা ওরা করবে না। আদর্শের জন্যে দুনিয়া এখন ভারতের দিকে তাকায় না। উল্টে ভারতই তাকায় একচোখে

আমেরিকার দিকে। আরেক চোখে রাশিয়ার দিকে। দরবারের ওমরাহ্ শ্রেণী এখন দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক সম্প্রদায় কথায় কথায় উড়ে যান বিষ্ণুলোকে। আরেক সম্প্রদায় কথায় কথায় উড়ে যান শিবলোকে। মন তাঁদের সব সময় উড়ুউড়ু। কর্তরা থীসিস আর অ্যান্টিথীসিস মিলিয়ে একটা সীনথেসিস তৈরি করেছেন। ডিকটোডেমোক্রাসী। আরো একটা তৈরি হতে চলেছে। ক্যাপি-টোসোশিয়ালিজম। সুকুমার রায় হলে বলতেন হাঁসজারু আর বকচ্ছপ। রাজনৈতিক সঙ্কটের দিন সামাল দেবে সিভিল সার্ভিস ও মিলিটারি। কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিন সামাল দেবে কে?'

. আমি বিলকুল বোকা বেনে যাই। বোকা আর বোবা! রজত বলে যায়, 'না, দিল্লী আমার সেণ্টার অফ থিংজ নয়। জবাহরলালজীকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু তিনিও নন আমার সেণ্টার। আমি এখন সম্পূর্ণ হতাশ আর ক্লান্ত আর ব্যর্থ। এমন ফ্রাসট্রেশন জীবনে অনুভব করিনি। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমি বানপ্রস্থ নিচ্ছি। পেনসনের টাকায় দুটো দুরকম বন্দোবস্ত পোষাবে না। বাবুর্চি আর বেয়ারা আমার পরম অনুগত ও পুরাতন ভৃত্য। অর্ধেক বেতনে ওরা রাজী। ওদের ছাড়িয়ে দেওয়া চলবে না। ঠাকুর চাকরকে ছাড়িয়ে দিলে গৃহলক্ষ্মী আমাকে ছেড়ে যাবেন। বড়ো ভাবনায় পড়েছি, ভাই।'

আমার ধারণা ছিল ওটা সাময়িক ছাড়াছাড়ি। কিন্তু মিস্টার বোসের কথা শুনে মনে হচ্ছে তা নয়। বেচারা রজত! তবু ভালো যে ও চতুর্থ একটা কেন্দ্রস্থল পেয়েছে ও শান্তিতে আছে।

গুপ্তকথা

'আহা! সৃষ্টিধর গুপ্ত লোকান্তরে গেলেন!' কাগজের আড়াল থেকে বলে ওঠেন বন্ধু।

'হ্যাঁ, বড়োই দুঃখের বিষয়।' আমি ও খবর আগেই পড়েছি।

'ভাগ্যবন্ত পুরুষ। ইংরেজ আমলের এম বি ই। আবার কংগ্রেস আমলের পদ্মশ্রী। এমন মণিকাঞ্চন যোগ ক'জনের বেলা হয়! করিতকর্মা ব্যক্তি। গুপ্ত জ্যাকসন অ্যাণ্ড শর্মা কোম্পানীর চেয়ারম্যান। অবিচুয়ারিতে ওঁর জীবনের সংক্ষিপ্তসার দিয়েছে, দেখেছ?' বন্ধু আমারই কাগজ আমাকে দেখতে দেন।

'দেখেছি। কিন্তু ওঁর জীবনের একটি অধ্যায় বাদ গেছে। সেটা লিখতে হলে আমাকেই লিখতে হয়।' এই বলে বন্ধুকে একটা চমক দিই।

'ওঃ! তুমি ওঁকে চিনতে। কই, কোনোদিন তো শুনিনি।' বন্ধু অনুযোগ করেন। সেইসঙ্গে অনুরোধ।

'শুনতে চাও তো শোন।' এই বলে আমি আরম্ভ করি। 'সৃষ্টিধরের ওটা প্রথম চাকরি। তার আগেই তাঁর বিয়ে হয়েছে। বিয়ে না করলে বিলেত যাবার সুযোগ পেতেন না। বৌ নিয়েই তিনি বলভদ্রপুর যান। বলভদ্রপুর ছিল তখনকার দিনের যুক্তপ্রদেশের এক বিখ্যাত তালুকা। মালিক মুসলমান। কিন্তু উপাধি রাজা। পরে বোধ হয় মহারাজা। যেমন সম্ভ্রান্ত তেমনি ভদ্র। তাঁর দেওয়ান ছিলেন কানওয়ার যশবন্ত সিং। তিনি রাজবংশীয়। তবে তাঁর মাতৃকুল বাঙালী খ্রীস্টান। বাঙালী বলে সৃষ্টিধরকে ও তার স্ত্রী নীলিমাকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন। হপ্তায় একদিন ওঁদের বাংলায় এসে সন্ধ্যাবেলাটা আড্ডা দিয়ে কাটাতেন। তাঁদের যাতে অর্থনাশ না হয় সেকথা ভেবে ভর্তি একবোতল স্কচ নিয়ে আসতেন। সেটা খুলে তিনজনের গ্লাসে

ঢালতেন। গ্লাস খালি হলে আবার ভরে দিতেন। বোতল খালি হলেই গা তুলতেন।'

'খাসা লোক তো!' বন্ধু তারিফ করেন।

'খানদানী লোক, বল। কানওয়ারনী থাকতেন মুসৌরিতে না নৈনিতালে সারা গ্রীষ্মকাল। শীতকালে নিচে নামলে ডিনার দিতেন। গুপ্তদের ডাকতেন। সৃষ্টিধর তো সুখেই ছিলেন ওদেশে কিন্তু স্বস্তিতে নয়। যে পথ দিয়ে তিনি অফিসে যেতেন তার দু'ধারে লোক জমে যেত তাঁকে দেখতে। তাঁর চেহারার জন্যে কি? হতেও পারে। চেহারা নিয়ে তাঁর একটু গর্ব ছিল। কালো? তা সে যতই কালো হোক, নিপুণ হাতের খোদাই নটবর মূর্তি। কিন্তু যা ভেবেছিলেন তা নয়। এক একটা শব্দ তাঁর কানে আসে। জিগ-স পাজলের মতো জুড়তে জুড়তে যা দাঁড়ায় তার মর্ম, কী আশ্চর্য জীব এই বাঙালী! এ নাকি রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়!' বলতে বলতে আমি হেসে ফেলি।

'এ্যাঁ! বল কী হে! সত্যি!' বন্ধু তো হাঁ।

'আহা, আমি কি বানিয়ে বলছি। যেমনটি শুনেছি তেমনটি শোনাচ্ছি। সৃষ্টিধর তো দারুণ শক পান। স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়াটাও আশ্চর্য ঘটনা। এ কী মল্লুক রে, বাবা! তিনি তাঁর কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ককে বিশ্বাস করে শুধান, ওরা কেন অমন কথা বলে? কেরানীটি ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, এদেশের স্বামীরা বাড়ির বাইরে রাস্তার উপর চারপাই পেতে শোয়। বৃষ্টি পড়লে বারান্দায় ওঠে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে অন্দরে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে শোয় না। সৃষ্টিধর তো তাজ্জব বনে যান। কোথায় এসেছি রে, বাবা! এখন এদের কাছে মুখ দেখাই কী করে? ওঁর ছিল টেনিস খেলার অভ্যাস। স্ত্রীকেও শিখিয়ে ছিলেন খেলতে। অন্য কোনো পার্টনার না জুটলে দু'জনাতে খেলতেন। কাছেই ক্লাব। পায়ে হেঁটে যেতেন দু'জনে। সেটা এমন কী দৃশ্য যা দেখতে পথের দুধারে লোক জমে যাবে! ওঁদের দিকে হাঁ করে তাকাবে! মাথা

নেড়ে বলবে, বঙ্গালী অওর বঙ্গালীন। রাত্রে এক বিছানায় শোয়। দু'জনের দু'জোড়া কান লাল হয়ে ওঠে। সৃষ্টিধরের ইচ্ছে করে সব ক'টাকে পিটিয়ে শায়েস্তা করতে। কিন্তু তা যদি করতে যান তবে চারদিকে ঢিঢি পড়ে যাবে যে ওঁরা স্বামী স্ত্রীতে রাত্রে এক বিছানায় শোন। নালিশ করা মানেও তো নিজের গালে নিজে চুনকালি মাখা। নীলিমা পায়ে হেঁটে যেতে নারাজ। মোটর তো নেই, টাঙ্গা ভাড়া করতে হয়। টাঙ্গায় চড়ে এমন ভাব দেখান যেন শুনতেই পান নি।' বলে আমি প্রাণপণে হাসি চাপি।

'সত্যি বলছ না গুল দিচ্ছ?' বন্ধু অবিশ্বাসের হাসি হাসেন।

'শোন সবটা। একদিন কানওয়ার সাহেব হুইস্কি খেতে খেতে প্রসঙ্গটা পাড়েন। বলেন, এখানকার লোকগুলো বাঙালীদের নামে যা তা কী সব রটাচ্ছে। হিংসুটে আর কাকে বলে? বাঙালীদের একটা সিভিলাইজিং মিশন আছে। ওরা কি চাকরি করতে আসে? ওরা আসে সভ্যতা বিস্তার করতে। ওদের মেয়েরা যে-রকম স্টাইলে শাড়ী পরে আর-সব মেয়ে সেই রকম স্টাইলে শাড়ী পরতে শেখে। সারা দেশকে ওরা সন্দেশ আর রসগোল্লা খেতে শেখাচ্ছে। বোমা ছুঁড়ে বিপ্লবও তো ওদেরই অবদান। এককথায় বাঙালী হলো ভারতবর্ষের ফ্রেঞ্চম্যান। আমি কি ভুলতে পারি যে আমার দাদামশাই ছিলেন বাঙালী? ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন সিভিলাইজিং মিশন নিয়ে! সেই বাঙালীর নামে এ কী ভিত্তিহীন রটনা! ছি ছি! কী লজ্জার কথা! তখন সৃষ্টিধর বলে, 'কথাটা তো মিথ্যে নয়, সার। তা বলে লজ্জার কথা কেন হবে?' কানওয়ার সাহেব লাল হয়ে বলেন, 'হবে না? শোওয়া মানে কি শুধু শোওয়া? না, না, একজন মহিলার সামনে আমি ওকথা উচ্চারণ করতে পারব না। আই বেগ ইওর পার্ডন, মিসেস গুপ্ত।' এই বলে তিনি হো-হো করে হেসে ওঠেন। আর নীলিমার মুখখানি কালিমায় ছেয়ে যায়। বেচারী উঠে দৌড় দেন। সৃষ্টিধর বেকায়দায় পড়ে হাত পা

কামড়ায়। কী ইতর এরা! ভেবেছে রোজ রাত্রে!' বলতে বলতে আমিও হেসে উঠি।

'হা হা হা হা! এসব তো আমার জানা ছিল না। হিন্দুস্থানীর সঙ্গে বাঙালীদের এইখানে এক মৌলিক পার্থক্য।' বন্ধু পরিহাস করেন।

'তারপর কানওয়ার সাহেব আশ্বাস দেন জনরব আপনি ক্রমে থেমে যাবে। মাই ডিয়ার গুপ্ত, ডোণ্ট টেক এনি নোটিস। মাস কয়েক বাদে তাই হলো। কিন্তু সৃষ্টিধরের গায়ের ঝাল কি মেটে! তিনি চান মুখের মতো জবাব দিতে। একদিন তাঁর হাতে পড়ে এক হিন্দী মাসিকপত্র। সেই সংখ্যায় ছিল একটি কাহিনী। তাতে স্ত্রী বলছেন স্বামীকে, 'আপনি'। আর স্বামী বলছেন স্ত্রীকে, 'তুই'। সৃষ্টিধর তো স্তম্ভিত! স্বামী আর স্ত্রী কি মাস্টার আর স্লেভ। এটা কি স্লেভ সোসাইটি! বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে স্লেভারি। পরের দিন কনফিডেনশিয়াল ক্লার্কের কাছে অনাবৃত করেন তাঁর অন্তর। কেরানীটি নরম মানুষ কিন্তু সেও গরম হয়ে ওঠে। বলে, হুজুর এমন এক জায়গায় ঘা দিয়েছেন যেখানে হিন্দু মুসলমান একদিল। হুজুরের ভালোর জন্যেই বান্দার আরজ, হুজুরকে হুঁশিয়ার হতে হবে। সৃষ্টিধর কিন্তু হুঁশিয়ার হন না। মুখের মতো জবাব খুঁজে পেয়েছেন। বলেন, কী বিচিত্র ব্যাপার। স্বামী বলে, স্ত্রীকে 'তুই'! আর স্ত্রী বলে স্বামীকে, 'আপনি!' জবাবটা মুখে মুখে প্লাবিত হতে হতে স্বয়ং রাজা সাহেবের কর্ণগোচর হয়। এরা নাকি গোলামের জাত। দরবার থেকে দেওয়ান সাহেবের উপর হুকুম দেওয়া হয় তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে।' আমি এইপর্যন্ত এসে একটু দম নিই।

'বল, বল, ঝুলিয়ে রেখো না।' বন্ধু অধীর হন।

'দেওয়ান সাহেব ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে সেলাম পাঠান। খাশ কামরায় বসে সরকারী প্রসঙ্গের মাঝখানে হঠাৎ বেসরকারী প্রসঙ্গটা তোলেন। ভালো কথা, গুপ্ত, তোমার নামে আবার এ কী কুৎসা

রটনা শুনছি ? তুমি কি বলেছ যে আমরা গোলামের জাত ? সৃষ্টিধর বিস্মিত হয়ে বলেন, সে কী! গোলামের জাত কবে বললুম ? আমি শুধু বলেছি, এটা কি গোলামের সমাজ! কানওয়ার সাহেব রেগে গিয়ে টেবিল চাপড়ে বলেন, ডিসগ্রেসফুল! তারপর হুকুম করেন, উইথড্র ইট, সৃষ্টিধর। মুখের মতো জবাবটা মুখে ফিরিয়ে নিয়ে গিলতে হলো। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বাংলায় ফিরে এসে স্ত্রীকে বলেন, এখানকার পাট গুটিয়ে নাও। আমি ইস্তফা দিতে চাই। তাঁর স্ত্রী তাঁকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করেন। সেদিন সন্ধ্যায় কানওয়ার সাহেব এসে দেখেন দুজনের মুখ অন্ধকার। তিনি আঁচতে পেরে বলেন, গুপ্ত, ওটা আমার লোকদেখানো রাগ। তুমি যে এদের মুখের মতো জবাব দিতে চেয়েছিলে সেটা কি আমি বুঝিনি ? বাঙালীর রক্ত আমার দেহেও কি নেই ? তোমার কিন্তু স্থান নির্বাচনে ভুল হয়েছিল। তুমি যদি তোমার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে পালটা দিতে তা হলে কেউ কিছু করতে পারত না। দিয়েছিলে ওদের জায়গায় বসে। ওরা কি তোমাকে অমনি ছেড়ে দিত ? চাকরি থেকে কিক আউট করত। সৃষ্টিধর বলে 'আমি ইস্তফা দিতে চাই, স্যার। নিজেকে ডিসগ্রেস করতে চাইনে।' কানওয়ার সাহেব ওর গেলাস ভরে দিতে দিতে বলেন, 'এস, হুইস্কির পাত্রে ডুবিয়ে দাও তোমার মনের ব্যথা। এহেন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেউ ইস্তফা দেয় ? দরবারকে আমি যে রিপোর্ট দিয়েছি তাতে লিখেছি অভিযোগটা ভিত্তিহীন।' আমি এবার একটু দম নিই।

বন্ধু বলেন, 'তা হলে ওইখানেই ইতি ?'

'সামান্য বাকী। জন্মদিনে রাজা সাহেব যে পার্টি দেন তাতে সৃষ্টিধরকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করা হয়। খানা পিনার পর একসময় রাজা সাহেব ওঁকে আর রাণী সাহেব ওঁর স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে বলেন, বাঙালীদের আমরা খুবই অ্যাডমায়ার করি। আশা করি আমাদের মধ্যেও অ্যাডমায়ার করার মতো কিছু আছে। বিপদে আপদে যখনি দরকার হবে তখনি যেন আমাদের জানানো হয়। বিপদ

আপদের জন্যে অপেক্ষা না করে সৃষ্টিধর ইতিমধ্যেই অন্য একটা চাকরির জন্যে চিঠি লিখেছিল। ওখানে কানওয়ার সাহেব ভিন্ন তাঁর আর-কোনো পৃষ্ঠপোষক নেই আর তিনিও বেশীদিন থাকবেন না। প্রদেশের গভর্নমেন্ট সার্ভিসে ফিরে যাবেন। অবশেষে বলভদ্রপুরে যবনিকা পতন। গুপ্ত সাহেবের বিদায়সভায় যথেষ্ট লোক হয়েছিল। মাতব্বররা একবাক্যে তাঁর গুণগান করেন। সেইসঙ্গে বাঙালীদের প্রশংসা। আশ্বাস দেন যে আজ বাঙালীরা যেটা করছে কাল আর-সকলে সেটা করবে। সৃষ্টিধর একখানি স্বাক্ষরিত থালা উপহার পান। সোনার জলে ধোওয়া রুপোর।

ঢাকায় চাকরি নিয়ে পরে আমার কাছে অনুতাপ করেন যে অমন সুখের চাকরি ছেড়ে আসার সত্যি কোনো দরকার ছিল না। হ্যাঁ, ঢাকাতেই আমাদের আলাপ।' আমি নতুন করে সূত্রপাত করি।

'না, সত্যি কোনো দরকার ছিল না।' বন্ধু রায় দেন।

'ঢাকায় তাঁকে দেখি বেশ মনমরা ও বিরক্ত। অত বড়ো শহরে কেউ তাঁকে পাত্তা দেয় না। ঢাকা ক্লাবে কোন কালা আদমীকেই বা ঢুকতে দেয়, বাবুর্চি খানসামা বাদে? তুমি কমিশনার হতে পারো, কলেকটর হতে পারো, জজ হতে পারো, নবাব বা রাজা হতে পারো, কিন্তু ক্লাবের মেম্বর হতে চাইলে সায়েবরা ব্ল্যাকবল করবে। কোথায় লাগে দক্ষিণ আফ্রিকা! বিলেতফেরতাদের আঁতে ঘা লাগে। বেচারার টেনিসটা মাটি। কোথাও খেলতে পারে না, যদি না প্রাইভেট বন্দোবস্ত হয়। ছিল তেমন এক বন্দোবস্ত। আমিও খেলতুম। আমরা ছিলুম একই নৌকায়। সেইসূত্রে আলাপ ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি। আমি ওঁকে আশ্বাস দিয়ে বলি, দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন আমরাই হব ক্লাবের কর্তা। ওরা মেম্বর হতে চাইলে আমরাই করব ব্ল্যাকবল। সৃষ্টিধর শুষ্ক কণ্ঠে বলেন, 'দেশ স্বাধীন হলে তো মদ্যপান বন্ধ হবে। ক্লাবে গেলে খালি নেম্বু পানী বা নারঙ্গী পানী খেতে দেবে।' আমি রসিয়ে রসিয়ে বলি।

'ঢাকায় কেউ বাড়ি বয়ে এসে মদ খান না? খাওয়ান না? তা হলে ওঁর সন্ধ্যাবেলাটা কাটে কী করে।' বন্ধু পরিহাস করেন।

'অতি কষ্টে। ঢাকায় তাঁকে সময়ে অসময়ে ডিউটিতে যেতে হতো। সন্ধ্যায়ও নিস্তার নেই। ফলে কাজের লোক বলে ওঁর নামডাক হয়। কিন্তু বলভদ্রপুরে যেমন হিন্দুস্থানী, ঢাকায় তেমনি ইউরোপীয়ান।' একদিন কথায় কথায় বলেন, 'কী আজব চিড়িয়া এই ইংরেজ। যেখানে এর হোম সেইখানেই এর মন। আর সাম্রাজ্যটা এর ওড়ার আকাশ। পাশাপাশি উড়তে উড়তে এদের সঙ্গে আমাদের কাজ কারবার। সম্পর্কটা পুরোপুরি বিজনেস রিলেশন। কী ইনহিউমান।' আমিও আফসোস করি।

'তা হলে পরে উনি এম বি ই হলেন কী করে।' বন্ধু জেরা করেন।

'বোধহয় কাজের লোক হিসাবে।' আমি অনুমান করি।

'ওহে শরদিন্দু, কোবরেজী ওষুধে কি অমনি ফল হয়, যদি সঙ্গে না থাকে অনুপান? তেমনি, কর্মদক্ষতায় কি অমনি ফল হয়, যদি সঙ্গে না থাকে সুরাপান? পান করতেও হয়, করাতেও হয়। সেকালে তো এইটেই ছিল ফলপ্রদ পদ্ধতি। একালে কি পালাবদল হয়েছে?' তিনি অর্থপূর্ণভাবে তাকান।

'কী জানি, ভাই অনিমেষ, আমি তো দীর্ঘকাল আউট অফ টাচ।' আমি হাসি।

"হুঁ, হুঁ। তুমি জানো সবই, কিন্তু বলবে না। একালের ওষুধের মাত্রা কমেছে। অনুপানের মাত্রা বেড়েছে। ইংরেজ নেই, এখন সব জায়গায় স্কচ।" তিনি পান্ করেন।

একটু পরে আমি আবার খেই ধরি। 'ঢাকায় একদিন আমি হঠাৎ বাসাছাড়া হই। কোথাও বাসান্তর খুঁজে পাইনে। সেই দুর্দিনে হাত বাড়িয়ে দেন গুপ্ত। তাঁর বাসার একখানা ঘর খালি করে দেন। তারপর যোগাড় করে দেন একটা বাসা। কিন্তু

অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে শেষ মুহূর্তে তুচ্ছ একটা কথা নিয়ে গৃহিণীতে গৃহিণীতে হয় আড়ি। কর্তারা যে যার গৃহিণীর পক্ষ নেন। ঘটে যায় চূড়ান্ত বিচ্ছেদ। আমি বদলী হয়ে যাই। গুপ্ত উন্নতি করতে করতে বিভিন্ন স্থান ঘুরতে ঘুরতে একদিন হন এম বি ই। আর ওঁর নামটি ইংরেজ আমলের শেষবারের খেতাবের তালিকায় লক্ষ করে পুলকিত হই আমি।'

'তার পর পদ্মশ্রীর কী ইতিহাস। না পদ্মিনী উপাখ্যান?' বন্ধু আবার পান্ করেন।

আমি বিশেষ কিছু জানলে তো বলব! যেটুকু শুনেছিলুম সেইটুকুই বলি। 'ইংরেজরা চলে গেলে তাদের ফার্মগুলো একে একে ভোল ফেরায়। দেশী পার্টনার নেই। কোনো কোনোটার নামটা বিদেশী, প্রাণটা স্বদেশী। তেমনি এক ফার্মের পার্টনার হন গুপ্ত। তখন নামান্তর হয় গুপ্ত অ্যাণ্ড জ্যাকসন। দিল্লী থেকে লাইসেন্স পারমিট সংগ্রহ করতে ও সেই বাবদ মুক্তহস্তে দান খয়রাত করতে পরে আবার একজন হিন্দুস্থানী পার্টনার প্রয়োজন হয়। ফের ভোল পাল্টিয়ে নয়া নামকরণ হয় গুপ্ত জ্যাকসন অ্যাণ্ড শর্মা।'

'মজাটা কোনখানে, বল তো?' আমি বলতে বলতে হাসি চাপি।

'মজা এর মধ্যে কোথায়? এ তো নিছক ব্যবসাদারি।' বন্ধু একটি বুদ্ধু।

'কী আশ্চর্য জীব এই বাঙালী! কী বিচিত্র প্রাণী এই হিন্দুস্থানী! আর কী আজব চিড়িয়া এই ইংরেজ! সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং বাং ইং। এই মন্ত্রের যিনি স্রষ্টা তিনি পদ্মশ্রী হবেন না তো হবেন কী? এম বি ই তো এযুগে বাতিল।' আমি থামি।

আমার পরম উপকারী বান্ধবের জন্যে আমার চোখে জল। মুখে হাসি মসকরা, মনে মনে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা।

আত্মীয় নন, কেউ নন, কোথায় বাড়ি তাও অজানা, ফী বছর একবার করে আসতেন আর রাজবাড়িতে হরিকথা শুনিয়ে যেতেন। বলবার ভঙ্গীটি ছিল অতি মনোরম। আর মানুষটিও তেমনি হৃদয়বান। বাবার সঙ্গে ছিল আত্মার সম্পর্ক। সেই জন্যে আমরা তাঁকে ডাকতুম জ্যাঠামশায়। সেটা তাঁরই ইচ্ছায়।

"না, না, মেসোমশাই না। মাসিমা কোথায় যে মেসোমশাই হব? তার চেয়ে বল জ্যাঠামশাই। সুশান্ত, তুমি তো রবিবাবুর ভক্ত শুনেছি। 'চতুরঙ্গ' পড়েছ নিশ্চয়ই। আমিই সেই জ্যাঠামশাই। সেই নাস্তিক জগমোহন।" প্রথম পরিচয়ে তিনি এই বলে সম্পর্কটার পত্তন করেন।

"কিন্তু, জ্যাঠামশাই, আপনি যে নাস্তিক নন, পরম বৈষ্ণব।" আমি বিস্মিত হয়ে প্রতিবাদ করি। "আপনার কপালে ও নাকে তিলক। মুখে হরিনাম।"

"তার মানে আমি এখন নেতি নেতি থেকে ইতি ইতিতে পৌঁছেছি। মানুষকে ভালোবাসতে বাসতে আর মানুষের ভালবাসা পেতে পেতে আমার প্রত্যয় হয়েছে যে, সব ভালোবাসাই একজনের ভালোবাসা আর সেই একজনকে যার যাতে রুচি সেই নামে ডাকলেই হলো। ঈশ্বর বা ভগবান বা গড বা আল্লা বা মনের মানুষ। প্রেমকে যদি স্বীকার করি তো প্রেমময়কেও স্বীকার করতে হয়। কী বল, বিরাজ?" এই বলে তিনি আমার বাবার দিকে তাকান।

"তা তুমি যে নাস্তিক ছিলে এটা তো আমি জানতুম না।" বাবা বলেন। "আর তোমার নাম তো জগমোহন নয়, মুকুন্দ।"

"জগমোহন বলার একটা অর্থ আছে। জানো তো তিনি একটি বিপন্ন বালিকাকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। পারলেন না যদিও

বাঁচাতে। অসাধারণ সৎসাহস ছিল তাঁর। লোকে নিন্দা করত দুর্নাম রটাত, তবুও তিনি অদম্য। আমিও সেইরকম একটা কিছু করতে চেষ্টা করেছি। পারি আর না পারি। পেরেছি বললে বাড়িয়ে বলা হবে, পারিনি বললে কমিয়ে বলা হবে। কিন্তু আজ নয়, পরে একদিন। শুধু মনে রেখো যে বৈষ্ণব আমি একদিনে হইনি। গোড়ায় ছিলুম সমাজকর্মী। সমাজ সংস্কারকও বলতে পারো!" এই বলে তিনি একটা আভাস দিয়ে রাখেন।

নানা কারণে তাঁর সঙ্গে পরে আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। যে সময় তিনি আসতেন সে সময় আমি ভিন্ন স্থানে। প্রথমটা কলেজে তারপরে বিলেতে। আরো পরে আমার কর্মস্থলে। তবে বাবার বা ভাইদের চিঠিতে তাঁর খবর পেতুম। ভারতময় তিনি ঘুরে বেড়াতেন। এক এক মাসে এক এক প্রদেশ। কোথাও বাঁধা আস্তানা ছিল না। বলতেন, "সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া!"

আবার যে তাঁর সঙ্গে দেখা এটা আমার গণনার মধ্যে ছিল না। ছুটি পেলে বাবার সঙ্গে দু'চারদিন কাটিয়ে আসি, কিন্তু কর্মস্থল থেকে দূর তো বড়ো কম নয়। আর ছুটিই বা আমাকে দিচ্ছে কে? সরকারী প্রশাসনের দায়িত্ব আমার উপরে। বাড়ি গেলে শুনি তিনি এসেছিলেন, আমার খোঁজ করেছিলেন। জানতেন আমি প্রেমে পড়ে ভিন দেশের মেয়ে বিয়ে করেছি। ভিন্ন ধর্মেরও বটে। সমর্থন করতেন। বলতেন, "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। সবই তো রাধাপ্রেম বা কৃষ্ণপ্রেম।"

হঠাৎ একদিন বজ্রপাত হয়। বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম পাই বাবা চলে গেছেন। ষাট বছর একটা বয়সই নয়। শরীরও বেশ শক্ত ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব হয়ে অবধি আমিষ ছেড়ে দিয়েছিলেন। অথচ মিষ্টান্নের আসক্তি কাটাতে পারেননি। ফলে ডায়াবিটিস। রথযাত্রার সময় পুরী গিয়ে রামদাস বাবাজীর সঙ্গে সমস্ত পথ কীর্তন করে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে স্বস্থানে ফিরতে না ফিরতেই রাজমাতার

আমন্ত্রণ ও রাজবাড়িতে গিয়ে কীর্তন ও প্রসাদ সেবা। পরিণামে সেই রাত্রেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি। ডাক্তারের মতে ডায়াবিটিক কোমা।

মনটা আমার বিষাদে ম্রিয়মাণ। শেষ বয়সে তাঁর কোনো কাজেই লাগলুম না। শেষ দেখাটাও হলো না। ছুটি নিয়ে বাড়ি গেলুম শ্রাদ্ধ করতে। সস্ত্রীক ও সপুত্রক। বাবার তো ভেদবুদ্ধি ছিল না। আমরা সবাই তাঁর কাছে সমান প্রিয়। আর থাকবেই বা কী করে? শুধু ধর্মে নয়, তিনি ছিলেন কর্মেও বৈষ্ণব। শুধু নামে রুচি নয়, জীবে দয়া বা ভালোবাসাও ছিল তাঁর সাধনার অঙ্গ। বাড়িতে ছিল খ্রীস্টান, মুসলমানের আনাগোনা।

বাবা নেই। শূন্য মন্দির। তারই মধ্যে শ্রাদ্ধের আয়োজন চলেছে। এমন সময় আমার দুই ভাই এসে পাশে বসে ও আমাকে শোকের উপরে শক দেয়। স্থানীয় ব্রাহ্মণরা সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছেন, কিন্তু একজনও নাকি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। তাঁরা কেউ এ শ্রাদ্ধে যোগ দেবেন না। বাবার অপরাধ তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করেননি। পুত্রবধূকে অস্বীকার করেননি। তাদের ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন। বউমার হাতে খেয়েছেন। প্রায়শ্চিত্ত করেননি। যে গৃহে এমন অপরাধ সে গৃহে ব্রাহ্মণভোজন!

আমি তো শুনে থ! এঁদের মধ্যে ছিলেন বাবার আজীবন বন্ধু অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। ওখানে এমন লোক ছিল না যে তাঁর কাছে কিছু না কিছু উপকার পায়নি। চাকরির উমেদারি, মামলার পরামর্শ, রাজার অনুগ্রহ এমনি কত রকম উপলক্ষে ওরা আসত আর বারান্দায় পড়ে থাকত। ভয় আর ভক্তি দুটোই করত। এখন ভয়ও গেছে, ভক্তিও গেছে।

কী করা যায়! দুনিয়ার নিয়মই এই। ব্রাহ্মণভোজনের আশা ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আর এক ফ্যাঁকড়া বেরোয়। কুল-পুরোহিত স্থানীয় ব্রাহ্মণ নন। তিনি অপেক্ষাকৃত উদার। তিনিও জ্যেষ্ঠপুত্রকে এককভাবে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করতে দেবেন না। তিন ভাই এক আসনে বসে একসঙ্গে মন্ত্রপাঠ ও পিণ্ডদান করবে। আমি

বুঝতে পারি যে তিনি সমালোচনা এড়াতে চান। তাঁরও তো সমাজ আছে।

মনটা আরো খারাপ হয়ে যায়। নিঃশব্দে পরিপাক করি সব অবমাননা। ভাইদেরও মনে দুঃখ। মেজভাই প্রশান্ত বলে, "শোন দাদা, ব্রাহ্মণরা আসবে না তো কী হয়েছে? মুসলমানরা তো আসবে।"

"মুসলমানরা?" আমি চমকে উঠি।

"হ্যাঁ, আমরা মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করেছি। বাবা চলে গেছেন শুনে ওরাই সকলের আগে আসে, শোক প্রকাশ করে। বলে এমন সুবিচার আর কারো কাছে পায়নি ও পাবে না। ওরা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে। তাই আমাদেরও কর্তব্য ওদের ডাকা।" সে অকুতোভয়।

ব্রাহ্মণভোজনের পরিবর্তে হবে মুসলিমভোজন। শুধু তাই নয় ভিতরের বারান্দায় বসে পঙ্‌ক্তিভোজন। আইডিয়াটা আমার নয় কিন্তু। আমি শুধু সায় দিয়েই ক্ষান্ত।

এই যখন পরিস্থিতি তখন আশমান থেকে জ্যাঠামশাইয়ের আবির্ভাব।

সমস্ত ব্যাপার শুনে তিনি মর্মাহত হন। বলেন, "আত্মার তৃপ্তির জন্যেই শ্রাদ্ধ। এতে তাঁর তৃপ্তি হবে। আর আমি তো রয়েছি। আমার ভোজনও তো ব্রাহ্মণভোজন।"

"কিন্তু, জ্যাঠামশাই, মুসলমানদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসা কি আপনার পক্ষে সমাজসম্মত হবে? অন্যান্য ব্রাহ্মণরা কী মনে করবেন?" আমি প্রশ্ন করি।

"তার জন্যে আমার মাথাব্যথা থাকলে কি আমি জগমোহন হতুম? কী না গেছে আমার মাথার উপর দিয়ে? তা তোমার মুসলমান অতিথিরাও কি এ বাড়ির বিধি মেনে নিরামিষ আহার করবেন?" জ্যাঠামশাই পালটা প্রশ্ন করেন।

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। বাবা থাকতে এ বাড়িতে মাছমাংস

চলত না। তাঁর শ্রাদ্ধের সময় চলবে, তা কি হয়!" আমি আশ্বাস দিই।

তিনি বলেন, "মুসলমানরা দিনে পাঁচবার উপাসনা করে। ওদের মতো ভক্ত আর কে? যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ভগবানের যারা প্রিয় আমারও তারা প্রিয়। তা ছাড়া আরো একটা কারণ আছে।"

আমি কৌতূহল প্রকাশ করি। "শুনতে পাই?"

"আমার পদবীটা গৌড়ের সুলতানদের দেওয়া। আমার পূর্বপুরুষ সে আমলে রূপ সনাতনের মতো উচ্চপদস্থ ছিলেন। পদবীটা বহন করব অথচ বিদ্বেষ পুষে রাখব, তাও জনকতক দুর্জনের বিরুদ্ধে নয়, কোটি কোটি নিরীহ জনের বিরুদ্ধে। ছি ছি! প্রেমই পরকে আপন করে। ঘৃণাই আপনকে পর করে দেয়। আমি ওদের সঙ্গে একসারিতে বসে প্রেমসে ভোজন করব। কিন্তু, তিনি জোর দিয়ে বলেন, "মানুষকে ভালোবাসি বলে জীবকে হিংসা করতে পারিনে।"

মুসলমানদেরও তাতে আপত্তি দেখা গেল না। বরং উৎসাহ লক্ষিত হলো। হিন্দুরা কেউ কখনো তাদের ডাকে না। এটাই প্রথম নিমন্ত্রণ। মিষ্টান্নেরও আধিক্য ছিল। জ্যাঠামশাই পরিহাস করে বলেন, "বিরাজের মতো আমিও শহীদ হব নাকি? ময়রাদের হাতে শহীদ।"

পঙ্‌ক্তিভোজনে তাঁরই ঠাঁই ছিল সকলের আগে। আমাকে তিনি টেনে নিয়ে পাশে বসান। পরিবেশিকাদের মধ্যে ছিলেন বাড়ির বড়ো বউমা। সবাই তাতে খুশি। খেতে খেতে জ্যাঠামশাই হাঁক দেন, "প্রেমসে বোলো বিরাজবাবুকী জয়।" অমনি সবাই জয়ধ্বনি করে ওঠে।

"দেখছ তো, কেমন প্রেমের সঙ্গে ওরা খাচ্ছে!" মুসলমানদের লক্ষ করে তিনি বলেন। "এ কি তোমার প্রাণহীন ব্রাহ্মণভোজন!"

জানতেন আমার মনে হুল ফুটে রয়েছে। আমি ভুলতে

পারছিনে যে আমার দোষে আমার বাবার শ্রাদ্ধ শাস্ত্রমতে পণ্ড হয়েছে। আমাকে ওইভাবে সান্ত্বনা দেন। পিতৃশোকের সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু অকৃতজ্ঞতার নয়। বাবা ওঁদের জন্যে কী না করেছিলেন! অন্তত ভদ্রতার খাতিরে ওঁরা একবার দেখা দিয়ে যেতে পারতেন।

"সুশান্ত, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ।" ভোজনের পর তিনি আমাকে বলেন, "তোমাকে যারা ক্ষমা করেনি তুমি তাদের ক্ষমা করবে। সমাজ চিরদিন এমন অনড়, এমন নির্বোধ থাকবে না। তোমরাই হবে এর নেতা। তোমাদের দৃষ্টান্ত আরো দশজন অনুসরণ করবে। তুমি সমাজত্যাগ করনি। সমাজও তোমাকে ত্যাগ করেনি। তোমাকে যারা ত্যাগ করেছে তারা নিজেরাই ত্যক্ত হয়েছে।"

জ্যাঠামশাই কখন কোথায় থাকেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। পরে তাঁর সঙ্গে আবার কবে কোথায় দেখা হবে কে জানে। আমি আমার মহকুমার প্রশাসনে ফিরে যাই ও কাজকর্মের জালে জড়িয়ে পড়ি। নদীগুলোতে তখন জলোচ্ছ্বাস। দেখতে দেখতে প্লাবন। লোকের যেমন কন্যাদায় আমার তেমনি বন্যাদায়।

তারই মাঝখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্যত্র যান। তাঁর শূন্য স্থান আমাকেই পূরণ করতে হয়। কেবল মহকুমার বন্যাদায় নয়, জেলারও বন্যাদায়। আমার তো স্থির হয়ে বসারও উপায় নেই। লোকে সাক্ষাৎ করতে আসে। আমি অনুপস্থিত।

একদিন কুঠির আপিস কামরায় বসে কাজ করছি, চাপরাশি এসে বলে, "হুজুরের সঙ্গে মোলাকাত করতে একজন বাবাজী বার বার এসেছেন, বার বার ঘুরে গেছেন। হুজুরের কি আজ মর্জি হবে!"

বাবাজীদের জন্যে আমার সময় কোথায়! তবে বার বার ঘুরে গেছেন শুনে এক মিনিট সময় দিতে রাজী হই।

"আরে, এ কী। আপনি! জ্যাঠামশাই!" আমি যেমন অবাক

তেমনি অপ্রতিভ। "আপনিই বার বার ফিরে গেছেন!" আমি তাঁকে প্রণাম করি।

"থাক, থাক। ও কী! আমি তো জ্যাঠামশাই রূপে আসিনি। এলে ফিরে যেতুম কেন? বউমা তো রয়েছেন।" তিনি গম্ভীরভাবে বলেন, "এসেছি উপযাচক রূপে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সকাশে। তবে এক মিনিট শুনে ভয় পাচ্ছি।"

"চলুন, আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাই। আপনার বউমার সঙ্গে গল্প করবেন। ততক্ষণ আমি আমার হাতের কাজটা সেরে নিই।" এই বলে তাঁকে আটক করি।

এর পরে অবসরমতো তাঁর আর্জিটাতে কান দিই। তিনি সংক্ষেপ করেননি, কিন্তু আমাকে সংক্ষেপে বলতে হচ্ছে। তাঁর প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান সমাজকর্মী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদী। অথচ মানুষ সম্বন্ধে আদর্শবাদী। মানুষের দুঃখ দেখলে সাধ্যমতো দূর করতেন। একদিন তিনি খবর পান যে একটি বিধবা মেয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। কারণ সমাজ তার আবার বিয়ে দেবে না। বিবাহটা জরুরী, কেননা সে অন্তঃসত্ত্বা। তিনি প্রথমে চেষ্টা করেন তার বিয়ে দিতে। কিন্তু যে ছেলেটা তাকে কথা দিয়েছিল সে ইতিমধ্যে সুবোধ ছেলে হয়েছে। বাপ মার অমতে কী করে বিয়ে করবে!

একজনের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে অপর একজনকে বিবাহ করতে কন্যাটির নিজেরই অমত ছিল। শচীশের মতো আদর্শবাদী পাত্রও জ্যাঠামশাইয়ের হাতে ছিল না। তিনি ভেবে দেখলেন তাঁর প্রথম কর্তব্য বিদ্যাসাগরের মতো বিধবার বিবাহদান নয়, তার ও তার সন্তানের প্রাণরক্ষা। এমন একটি স্থানে তাকে রাখতে হবে যেখানে তার সন্তান হবে ও যতদিন প্রয়োজন ততদিন তারা থাকবে। দেশে বিধবাদের জন্যে আশ্রম আছে, কিন্তু অন্তঃসত্ত্বাদের জন্যে নেই। দেশে বিবাহিতাদের জন্যে ম্যাটার্নিটি হোম আছে, কিন্তু অবিবাহিতাদের জন্যে নেই। জ্যাঠামশাই নেতৃস্থানীয়দের দুয়ারে

দুয়ারে ধরনা দেন। তাঁরা বড়ো জোর অর্থ সাহায্য করবেন। দায়িত্ব নিতে নারাজ।

তখন তাঁকেই উদ্যোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হলো মাতৃসদন। যে কোনো নারী সেখানে গিয়ে সন্তানের মুখ দেখতে পারবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না সে বিবাহিতা, না অবিবাহিতা, সধবা না বিধবা। সুরবালাই হলো তার প্রথম আশ্রমিকা। সে সুশিক্ষিতা, সদ্‌বংশীয়া ব্রাহ্মণকন্যা। বিড়ম্বিতা না হলে সচ্চরিত্রাও বলতে পারা যেত। জ্যাঠামশাই তো মনে করেন সে চরিত্রবতী। প্রেম থেকেই তার এ বিপদ। প্রেম কি অন্যায়? আর সন্তানও তো নারীমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা। চমৎকার একটি শিশু যদি জন্মায় তবে সে হয়তো হবে আর একজন কর্ণ। মহাভারতের বীর।

কিন্তু তাকে ভাসিয়ে দেওয়া চলবে না। জ্যাঠামশাই তাকে যেমন করে হোক পালন করবেন। সে যে ভগবানের দান। ভগবান? তিনি কি ভগবান মানতে প্রস্তুত? একটু একটু করে তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসীতে পরিণত হন। এর মূলে সেই অভাগিনী সুরবালা। মাতৃসদনে সেই প্রথম আশ্রমিকা ও তার কন্যাসন্তানই প্রথম আশ্রমশিশু। তাদের জন্যে তিনি অন্য ব্যবস্থা করতে চান, কিন্তু পারেন না। সুরবালা ওর মেয়েকে ছাড়বে না। ছাড়লে বাঁচবে না। মেয়েও কি বাঁচবে? জ্যাঠামশাই ওর ট্রেনিংএর বন্দোবস্ত করেন। ওই হয় মেট্রন। এতদিনে ওই হয়েছে মালিক। ওর হাতে শত শত কুমারী ও বিধবা মা হয়েছে। বাইরে থেকেও কল্‌ পায়।

এই কিছুদিন আগে ওর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বেশ ভালো বিয়ে। সমাজ যে খুব একটা উদার হয়েছে তা নয়। ছেলেরা মার্সিনারি হয়েছে। তাদের বাপেরাও টাকার অঙ্ক দেখে বিচার করে। কুলমর্যাদা দেখে নয়। তা হলে সমস্যাটা এখন কোথায়? কেনই বা জ্যাঠামশাই এখন সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে হাকিমের সকাশে উপস্থিত? সমাজঘটিত ব্যাপারে হাকিমই বা হস্তক্ষেপ করবেন কেন?

"শোন, সুশান্ত" জ্যাঠামশাই চিন্তাকুলভাবে বলেন, "একটা

সমস্যার সমাধান আমরা পেয়েছি, কিন্তু আরেকটার পাইনি। অন্তঃসত্ত্বা হলে অভাগিনীরা কোথায় গিয়ে মা হবে তার একটা সদুত্তর পাওয়া গেছে। আগেকার দিনে বাধ্য হয়ে ভ্রূণহত্যা করত কিংবা তীর্থ করতে গিয়ে পথে ঘাটে সন্তান বিসর্জন দিত। তুমি যদি আমাদের মাতৃসদনে যাও তো দেখবে বাপ মা মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, একমাসের জন্যে দিয়ে যাচ্ছেন, পরে এসে নিয়ে যাবেন। কিন্তু—"

"কিন্তু?" আমি জানতে উৎসুক হই।

"কিন্তু শিশুকে নিয়ে যাবেন না। শিশুটি যেন তাঁদের কেউ নয়। বেচারী মা! সে কি তার সন্তানকে ফেলে যেতে চায়? কিন্তু যেতে বাধ্য। না গেলে মা-বাপের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ। যেমন সুরবালার বেলা হয়েছে। সে যদি কুমারী হয়ে থাকে মা-বাপ তার সুপাত্রে বিয়ে দেবেন। কেউ টেরও পাবে না সে একটি কুন্তী। আর যদি বিধবা হয়ে থাকে তা হলেও তার একটা চাকরি জুটে যেতে পারে। কেউ খোঁজও নেবে না সে একটি মন্দোদরী। শিশুকে ছাড়ব না এমন দুর্জয় পণ আমরা উনিশ বিশ বছরে দুটি তিনটির বেশী দেখিনি। সদনেই তারা রয়ে গেছে। সাধারণত এই দেখি যে মায়েরা চলে যায়. কাঁদতে কাঁদতে। আর ফিরে আসে না। শিশুরা থেকে যায় আমাদের ভাবিয়ে তুলতে। আমাদের কোথায় এত সম্বল যে সব ক'টিকেই আশ্রয় দিয়ে মানুষ করি!" জ্যাঠামশাই আমাকেও ভাবিয়ে তোলেন।

"তা হলে উপায়?" আমি হদিস পাইনে।

"দ্যাখ, সুশান্ত, তোমার খুব খারাপ লাগবে শুনতে। আমরা প্রত্যেকটি হিন্দু অনাথাশ্রমের দ্বারস্থ হয়েছি। জায়গা থাকলেও কেউ জায়গা দেবে না। জানতে চাইবে বাপের নাম কী? কোন জাত? মুসলমানের বাচ্চা নয় তো? বল, এখন কী উত্তর দিই? আমাদের নিয়ম হলো বাপের নাম জিজ্ঞাসা না করা। করলে হয়তো একটা মিথ্যা উত্তর দিয়ে একজন নির্দোষ পুরুষকে জড়াবে। সেকালে

অবশ্য নির্ভয়ে বলতে পারা যেত পিতার নাম ইন্দ্র বা পবন বা ধর্ম। লোকে বিশ্বাস করত। সে যুগ কি আর আছে? শুনছি স্বরাজের পর রামরাজত্ব ফিরে আসবে। তা হলে তো বাঁচা যায়। বার্থ রেজিস্টারে লেখাব বাপের নাম বিশ্বামিত্র মায়ের নাম মেনকা। এখন তার জো নেই। মায়ের নাম খালি রাখা চলে না, মেয়েরা ভর্তি হবার সময় যে নাম লেখায় সেই নাম লেখা হয়। বাপের নাম অজ্ঞাত।" জ্যাঠামশাই বলেন।

"কিন্তু জ্যাঠামশাই," আমি আশ্চর্য হই, "সমস্যাটা তো আজকের নয়, আদ্যিকালের। সমাজ কি এ নিয়ে আগে কখনো ভাবেনি? কোনো সমাধান খুঁজে পায়নি?"

"তা যদি বল, বৈষ্ণবরা এর একটা কিনারা করেছেন। তোমার হাতের কাছেই তো এর উদাহরণ রয়েছে।" জ্যাঠামশাই বলেন, "বামুনের ঘরের একটি বিধবা পালিয়ে গিয়ে এক চাষীর ঘর করে। তাদের একটি মেয়ে হয়। চাষী মারা যায়। শরিকরা ওদের তাড়িয়ে দেয়। আশ্রয় দেন তোমার বাবা। এক বৈষ্ণবের কন্যাকে মালা বদল করে বিয়ে করেছিল এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তাদের একটি ছেলে হয়। ব্রাহ্মণ কোথায় চলে যায়। বৈষ্ণবী তার ছেলেটিকে নিয়ে নিরাশ্রয় হয়। তখন তাদেরও আশ্রয় দেন তোমার বাবা। ব্রাহ্মণীর কন্যা আর বৈষ্ণবীর পুত্র এদের যখন বিয়ের বয়স হয় তখন কথা ওঠে, এদের বিয়ে হবে কোন্ সমাজে ও কোন্ মতে? তখন তোমার বাবা ওদের দুজনকে বৈষ্ণব দীক্ষা দিয়ে বৈষ্ণব করে নেন ও বৈষ্ণব মতে বিয়ে দেন। জীবিকারও একটা ব্যবস্থা করে দেন তিনি। বোষ্টম সমাজ মেনে নেয়।"

"এই তো কেমন চমৎকার সমাধান!" আমি গদ্গদ স্বরে বলি। "এ দৃষ্টান্ত আপনারাও কি অনুসরণ করতে পারতেন না, জ্যাঠামশায়?"

"কিন্তু আমাদের মাতৃসদন তো সেভাবে কাজ করতে পারে না। ফেলে চলে যাওয়া শিশুদের আশ্রয় দিয়ে বিবাহযোগ্য করতে

কতকাল লাগে ভেবে ছাখ। ততকাল কে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করবে? পরে জীবিকাই বা জুটিয়ে দেবে কে? তার জন্তে চাই বিরাট সংগঠন। মিশনারীদের মতো জনবল, ধনবল ও কর্ম-বৈচিত্র্য কি আর কারো আছে? সেইজন্তেই আমরা মিশনারীদের শরণ নিই ফেলে যাওয়া শিশুদের ওদের হাতে সঁপে দিই। দিয়ে নিশ্চিন্ত হই যে, কেউ বেশ্যালয়ে চালান যাবে না, কেউ ভিখিরীদের দলে বিকলাঙ্গ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে না। এখন আবার উলটে শুনতে হচ্ছে যে, আমরা হিন্দুর সন্তানকে খ্রীস্টানদের কাছে বিক্রি করছি। মা ধরণী, দ্বিধা হও! সুরবালাকে তখনি আমি সতর্ক করে দিয়েছিলুম যে, মেয়ের বিয়েতে যেন বেশী খরচ না করে। কানে তোলেনি ওকথা। মেয়েকে অসবর্ণ পাত্রে দেবে না, চড়া পণ দিয়ে ব্রাহ্মণ পাত্র কিনবে। মোটা প্রণামী দিয়ে কলকাতা থেকে ব্রাহ্মণদের আনাবে। স্থানীয়রা তো অপবাদ রটাবেই। সুরো এখন জেদ ধরেছে আমার প্রতিষ্ঠান আমাকে দিয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে মাধুকরী করবে। এ বয়সে আমি আর ও দায়িত্ব বইতে পারিনে। শুনেছি তুমি নাকি একটা ম্যাটার্নিটি হোম স্থাপন করেছ। এটার ভারও তুমিই নাও।" তিনি অনুরোধ করেন।

"না, জ্যাঠামশাই," আমি সমবেদনার সঙ্গে বলি, "প্রশ্নটা তো ম্যাটার্নিটির নয়, প্যাটার্নিটির। আমার হাতে, মানে সরকারের হাতে, তুলে দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন, কিন্তু পিতৃপরিচয়হীন সন্তানদের নিয়ে সরকার কী করতে পারেন? বাপের নাম না জানালে ইস্কুলে ভর্তি করবে না, করতে গেলে অন্যান্য অভিভাবকরা অসহযোগ করবেন। আর একপ্রস্থ ইস্কুল খুলতে হবে। পরে আবার বাপের নাম না জানালে চাকরিতে ভর্তি করবে না। ভর্তি করলে অন্যান্য চাকুরেরা অসহযোগ করবেন। আর এক প্রস্থ চাকরি সৃষ্টি করতে হবে। যার মা-বাপের ঠিক নেই তার বিয়েও হবে না। ছেলেরা না হয় চিরকুমার হবে, কিন্তু মেয়েরা কি বর চাইবে না, ঘর চাইবে না, মা হতে চাইবে না?

সরকার কী করে এসব ব্যবস্থা করবেন, যদি সমাজ অসহযোগ করে?”

“তার মানে যাট মন ঘি পুড়বে, রাধা নাচবে। আমি চোখে দেখে যেতে পারব না।” তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, “তা হলে এইটুকু অন্তত তুমি করো। একবারটি নবদ্বীপ গিয়ে মাতৃসদনটা পরিদর্শন করে এস। পরিদর্শনের বইতে তোমার মন্তব্যের গুরুত্ব অশেষ। তুমি যদি দয়া করে একছত্র লেখ যে সদনের নামে অমন অপবাদ অযথা তাতেই নিন্দুকদের মুখ বন্ধ হবে।”

নবদ্বীপে টুরে যাবার প্রোগ্রাম তৈরি ছিল। তাতে মাতৃসদনটাও জুড়ে দেওয়া গেল। কিন্তু কী লিখব না লিখব সেটা আমার ডিসক্রেশন। বাড়িতে আমি সুশান্ত, কিন্তু বাইরে আমি এ জেলার প্রশাসক। কারো দ্বারা প্রভাবিত হইনে। জ্যাঠামশাইকে প্রতিশ্রুতি দিই যে পরিদর্শন করব, কিন্তু কী লিখব না লিখব তার অঙ্গীকার দিতে পারিনে।

তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, “অনেক আগেই আমি আমার কীর্তির মায়া কাটিয়েছি, কিন্তু সেই যে একটা কথা আছে কমলীকে ছাড়তে চাইলেও কমলী নেহি ছোড়তি। আমারও হয়েছে সেই দশা। সদনটা যেদিন উঠে যাবে সেইদিন আমি মুক্ত হব, কিন্তু কত শিশু পথে ঘাটে জন্মাবে ও বেঁচে থাকলে অমানুষ হবে সে কথা ভেবে নিরস্ত হই।”

“না, না, উঠে যাবে কেন? মিশনারীদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেই হলো।” আমি তাঁকে ভরসা দিই।

“না, বাবা। মিশনারীরা হাত গুটিয়ে নিলে আমাকেও হাত গুটিয়ে নিতে হবে। শিশুদের ওরা দীক্ষিতই করুক আর নাই করুক ভালোবাসে, আদরযত্ন করে, গোপালের মতো অন্নভোগ দেয়, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে, জীবিকা জোটায়, বিবাহ দেয়, সমাজে মাথা তুলে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াতে সাহায্য করে। কোন্‌টা শ্রেয়? হিন্দু হয়ে অমানুষ না খ্রীস্টান হয়ে মানুষ? খ্রীস্টানও তো

তাঁরই ভক্ত। যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। তাঁর প্রিয় হলে আমারও-প্রিয়।" এই বলে তিনি বিদায় নেন।

ভেবেছিলুম নবদ্বীপে আবার দেখা হবে। শুনলুম 'গুরুদেব' ভাগলপুরে না কোথায় হরিকথা শোনাতে গেছেন। সারা বছরই তো নানান জায়গায় এই করে বেড়ান। যেখানে যা পান সদনের জন্যে পাঠিয়ে দেন। বহতা নদী, রমতা সাধু। অনিকেত।

সুরবালা দেবীর ম্যানেজমেণ্ট সুনিপুণ। মানুষটি পরিণতবয়সী ও পরিপক্ক। তবে কেমন যেন শুকিয়ে গেছেন। ঝুনো নারকেল। উনিশ কুড়ি বছর ধরে পোড় খেলে যা হয়। বলেন, "যাদের শিশু তারা যদি জলে ভাসিয়ে দিয়ে যায় আর আমরা যদি কর্ণের মতো পালন করতে না পারি তবে যারা পারবে তাদের হাতে তুলে দেওয়া কি অন্যায়? সবাই জানে, সবাই বোঝে, সবাই মানে মিশনারী বিনে গতি নেই। তবু যা নয় তাই রটাবে। এই যে এতকাল আমি দিবারাত্র পরিশ্রম করছি, শত শত শিশু আমার হাতে হয়েছে, প্রসূতিরাও নিরাপদে ফিরে গেছে এর দরুন আমার কি কোনো পারিশ্রমিক নেই? পুরস্কার নেই? আমার সঞ্চয়ের টাকায় আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, পরের টাকায় দিইনি। দাদা, আপনি হিসেবের খাতাগুলো দেখুন না দয়া করে।"

হ্যাঁ, মোটা টাকা দক্ষিণা দিয়ে গেছেন কলিকাতার মুখার্জি, ব্যানার্জি, ঘোষ, বোস, সেনগুপ্ত, দাসগুপ্ত প্রভৃতি মাননীয় ভদ্রলোকগণ। তার একাংশ অবশ্যই সুরবালা দেবীর পাওনা। উনিশ কুড়ি বছরে উনিশ কুড়ি হাজার টাকা এমন কিছু বেশী নয়। আমি বলি, "হিসেবের খাতা নিখুঁত। কিন্তু, দিদি, এঁরা কেমনতর মানুষ! কন্যাদের জন্যে এন্তার টাকা খরচ, কিন্তু দৌহিত্র দৌহিত্রীদের বেলা কানাকড়িও না! আশ্রয় না পেলে তাদের কেউ বা হবে বেশ্যা, কেউ বা হবে বাঁদি, কেউ বা হবে ভিক্ষুকের পাল্লায় পড়ে অন্ধ কি খঞ্জ কি নুলো। আপন রক্তমাংসের উপর লেশমাত্র মায়ামমতা নেই! নিরীহ অসহায়ের প্রতি মানবোচিত করুণা নেই! বিদেশ

থেকে মিশনারী আসবে, তারাই নেবে দায়! যত অনর্থের মূল ওই যে সব পুরুষ, যাদের নাম লিখেছেন 'অজ্ঞাত' ওরাও কি মানুষ না পাথর না পিশাচ! পৃথিবীতে যাদের এনেছে তাদের জন্যে বিন্দুমাত্র বেদনাবোধ নেই! আর মায়েরাই বা কেমন!"

এর পরে আমি বাচ্চাদের দেখতে চাই। সন্তান জন্মালেই টেলিগ্রাম যায়, অভিভাবক এসে প্রসূতিকে নিয়ে যান, মিশনারী এসে শিশুকে। সেদিন ছিল একটিমাত্র শিশু। কন্যাসন্তান। তাকে কোলে নিয়ে আদর করি। প্রকৃতি তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোথাও দেগে দেয়নি যে, অবৈধ। ওটা সমাজেরই লিখন। সমাজ ইচ্ছা করলে 'অ' অক্ষরটা মুছে ফেলতে পারে। সেইটেই হবে সত্যিকার সমাধান।

পুরানো পাপী

সেবার এক আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে চিন্ময় চৌধুরীর বরাত খুলে যায়। দিল্লীর হরেক দূতাবাস থেকে সান্ধ্য নিমন্ত্রণ। কোন কোনদিন একাধিক। চেনা অচেনা শতখানেক নরনারীর ভিড়। এক একজনের এক হাতে একটি সুধাপাত্র। তাতে নানা রং-এর পানীয়। আর একহাতে রকমারি চাট। অতিথিরা এক একঠাঁই এক একটি মণ্ডলী রচনা করে দণ্ডায়মান।

চিন্ময় তো হংসো মধ্যে বকো যথা। তার এক হাতে এক গ্লাস আপেল জুস বা পাইনেপল জুস। আর এক হাতে কাজুবাদাম। তার মণ্ডলীটি ছোটখাট হলেও অস্পৃশ্য নয়। ফরাসী দূতাবাসের ককটেল পার্টিতে কী নিয়ে সেদিন কথা হচ্ছিল মনে পড়ে না। চিন্ময় চেয়ে দেখে কে একজন সুধাপাত্রধারী নিজের মণ্ডলী ছেড়ে তার মণ্ডলীতে ভিড়ে গেছেন ও কথা কেড়ে নিয়ে বিষয়টার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন। তাঁর মতে সাহিত্য একটা বিচ্ছিন্ন কক্ষ নয়, শিল্পের সঙ্গে সাহিত্যের এমন নিবিড় সম্বন্ধ যে শিল্পে যখন যে ইজম চলতি হয় সাহিত্যেও তখন সেই ইজম চলতি। অন্তত ফরাসীদের বেলা এই তো নিয়ম। তিনি চিন্ময়কে সাক্ষী মানেন।

তারপর হঠাৎ তার সঙ্গে গ্লাস ঠোকাঠুকি করে বলেন, 'চিনতে পারছেন? সেই পুরানো পাপী। পারলেন না? প্যারিসের সেই রাশিয়ান রেস্তোরাঁ? বাঙালীরা যেখানে রোজ সন্ধ্যাবেলা জমায়েৎ হতো? উত্তম গুপ্ত, প্রণব ভটচার্য, পান্না চক্রবর্তী, অবনী নাগ, সব ভুলে গেছেন। তা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। কবেকার কথা! সাতাশ সালের না আটাশ সালের আমারই স্মরণ নেই।'

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চিন্ময় আঁধারে ঢিল ছোঁড়ে। 'আপনি' কি শিল্পী সর্বেশ রায়?'

'সর্বেশ নয়, সর্বাণীশ। ওরা তামাশা করে বলত সর্বনাশ রায়।

আপনি তো চিন্ময় চৌধুরী। আমার ঠিক মনে আছে। জানতুম একদিন কোথাও না কোথাও পুনর্দর্শন হবে। এতদিন যে হয় নি। তার কারণ আমি তার পরেও আরো বার বছর প্যারিসে থেকে আমার টেকনিকটা পারফেকট করি। ইচ্ছে তো ছিল আরো কয়েক বছর থাকতে ও আরো নাম করতে। দেশে যখন ফিরতুম তখন বিদেশবিখ্যাত হয়ে ফিরতুম। কিন্তু প্যারিসের পতন আসন্ন দেখে পদব্রজে প্রস্থান করি। অনেক ঘুরে ফিরে বম্বেতে অবতরণ। সেইখানেই একটা চাকরি জুটে যায়। কাজ কম, অবসর বেশী। তাই বম্বের মায়া কাটাতে পারি নে। কলকাতায় তো আপনারা ঘোর জাতীয়তাবাদী, মডার্ন আর্টকে মনে করেন বিজাতীয় আর্ট। সম্প্রতি হাওয়া একটু ঘুরেছে। তখনকার দিনে কলকাতায় গেলে আমাকে মন্বন্তরে মরতে হতো। শুধু আমাকে নয় আমার মাদামকেও। না, ফরাসিনী নন, বাঙালীর মেয়ে, বম্বেতেই আলাপ। যাক, চলে যাচ্ছে একরকম। বাট নাথিং লাইক প্যারিস।'

চিন্ময়ের একটু একটু করে সেকালের স্মৃতি ফিরে আসে। এঁকে মিস্টার রায় বললে ইনি বিরক্ত হতেন। বলতে হতো মসিয়ে রোয়া। প্রথম পরিচয়ের পূর্বে সাতটি বছর ইনি প্যারিসের বাসিন্দা। চেহারাটাও বাঙালীর পক্ষে অসাধারণ ফরসা। ইহুদী বলে ভ্রম হয়। চলাচল হাবভাব দস্তুরমত ফরাসী।

'পুলকিত হলুম, মসিয়ে রোয়া। এদেশেও নাথিং লাইক বম্বে। আপনি ঠিক জায়গাতেই আছেন। আমি যদি শিল্পী হতুম তা হলে আমারও কর্মস্থল হতো বম্বে।' চিন্ময় তাঁকে সান্ত্বনা দেয়। জানে যে প্যারিস থেকে বিদায়ের সান্ত্বনা নেই।

'তা হলে শোন, ভাই চৌধুরী। চুপি চুপি বলি তোমাকে। দিল্লীতে চলে আসার তালে আছি। নিখরচায় বিলিতী ড্রিঙ্কস যদি চাও তবে নাথিং লাইক ডেলহি। চাণক্যপুরীর দূতাবাসগুলো বিনা শুল্কে দামী দামী মাল আনায়। পালা করে পার্টি দেয়। সকলের মন এইখানে বাঁধা। কাদের তুমি মীট করতে চাও? যার নাম

করবে তাকেই তুমি হাতের কাছে পাবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে কার্ড দেখিয়ে চাপরাশি পুলিশবেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করতে হবে না। আমার প্রধান খদ্দের তো দূতাবাসের সাহেব মেমরাই। তাঁদের দেখাদেখি দিল্লীর একালের আমীর ওমরাহ্। যাদের টাকা আছে তাদের রুচি নেই। যাদের রুচি আছে তাদের টাকা নেই। কী করে আমি আমাদের জগৎ শেঠদের বোঝাব যে আমি হচ্ছি প্যারিসের রোয়া। ওদেশে আমার নামে বই বেরিয়েছে। যে সিরিজে পিকাসো, ব্রাক, মোদিলিয়ানির নামে বই সেই সিরিজে রোয়ার নামেও বই। ভাবতে পারে এরা? আহা, কতকাল পরে নিজের নামটা নিজের কানে শুনতে পেয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। ধন্যবাদ তোমাকে, চৌধুরী। আমিও পুলকিত যে সেদিনকার সেই তালপাতার সেপাই আজ একজন গণ্যমান্য সাহিত্যিক। আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে যাকে ডাক পড়ে। কোথায় তলিয়ে গেছে আর সবাই। ভেসে আছি তুমি আর আমি। তা তুমি কি জুস ছাড়া আর কিছুই পান কর না? এরা কিন্তু খাঁটি শ্যাম্পেন দেয়। তিনি তৃতীয়বার পানপাত্র ভরেন।

প্রথম পরিচয়ের দিন মসিয়ে রোয়া চিন্ময়কে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, 'শুনে সুখী হলুম আপনি একজন কবি। জানতে পারি কি আপনার প্রেরণার উৎস কী? কী পান করে আপনি উদ্দীপনা বা উন্মাদনা বোধ করেন? অ্যাবসিন্থ?'

চিন্ময় তো চিত্তির। উত্তর দিয়েছিল, ঘোলের শরবত, ডাবের জল, দুধ মেশানো চা, কফি মেশানো দুধ। এই আমার দৌড়। প্যারিসে এসে শোকোলা খেয়ে মধুর রসের কবিতা লিখছি।'

'কোনটাতে একফোঁটা অ্যালকোহল নেই। তা হলেই হয়েছে আপনার কবি হওয়া। কবিতা লিখলেই কবি হয় না। কবি হতে হলে ওমর খায়য়ামের ধারা ধরতে হয়। তবে সাকী বলতে এখানে সখী বুঝতে হবে। ইরানের সাকীরা ছিল কিশোরী নয়, কিশোর।' মসিয়ে রোয়া চিন্ময়কে কবি হবার কৌশল বলেছিলেন।

তারপর নিজের বহুমূল্য সময় নষ্ট করে প্যারিসের মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারিগুলো ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। কারণ শিল্পের সঙ্গে কাব্যের একটা সহজাত সম্বন্ধ আছে। এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মডার্ন আর্ট বস্তুটা কী। আর কী নয়। ছাই পাশ আঁকলেই মডার্ন হওয়া যায় না। তাই যদি হতো তবে শিশুমাত্রই মডার্ন আঁকিয়ে। তাঁর নিজের স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে নিজের কাজও দেখিয়েছিলেন। আফসোস করে বলেছিলেন এসব ছবি এত মডার্ন যে খুব কম লোকেই এর মর্ম বোঝে। তাই বিক্রি হচ্ছে না। দেশের জমিদারি থেকে মাসো-হারা আসে। নইলে প্যারিসের পাট তুলে দিতে হয়।

তাঁর তো শত্রুর অভাব ছিল না। সকলেই স্বজাতীয়। ওঁরা চিন্ময়কে হুঁশিয়ার করে দিতেন। 'কেন মশাই কুসঙ্গে মিশছেন? দেখছেন না আমরা কেমন ওঁকে এড়িয়ে চলি। আমাদের মজিয়েছে। শেষে একদিন আপনাকেও মজাবে।'

চিন্ময় ভয় পেয়েছিল। 'আমাকে! মজাবেন!'

'তা হলে আরো খোলসা করতে হয়। এক একটা বেআইনী অপারেশনে কত খরচ হয়, জানেন? এত টাকা জোটাবে কী করে? মাসোহারার তো একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। আপনাকেই বলবে, চৌধুরী ভাই, কিছু টাকা দিতে পারো? সামনের মাসেই শোধ করে দেব। সামনের মাস গিয়ে সামনের বছর। তখন আবার টাকার টানাটানি। কেন? সেইজন্যে।' ওঁরা রসিয়ে রসিয়ে বলতেন।

তামাশা করে নয়, এই সব দেখেশুনে ওঁরা তাঁর নাম রেখেছিলেন সর্বনাশ রায়। আগুন যেমন পতঙ্গের সর্বনাশ করে তিনিও নাকি তেমনি তাঁর মডেলের সর্বনাশ করতেন। তা সত্ত্বেও তাঁর মডেল হতে উৎসুক তরুণীর অভাব হতো না। তিনি পরম সমাদরে তাদের প্রতিকৃতি চিত্রণ করতেন। তারাও বিশ্বাস করত যে তারা অমর হয়ে বিরাজ করবে। প্যারিসের প্রখ্যাত শিল্পীরা কত নাম-না-জানা নারীকে অমর করে দিয়েছেন। তাঁরা না আঁকলে কেই বা তাদের

মনে রাখত। অমরত্বের জন্যে অবশ্য কিছু মূল্য দিতে হয়। যেখানে দু' পক্ষই সম্মত সেখানে অনিষ্ট কোথায়? মাঝখান থেকে লাভ হয়ে গেল শিল্পীর ও শিল্পরসিকের।

কিন্তু ব্যাপারটা তো দু' পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব ঘটে যে! ওইখানেই প্রকৃতির জিত। তাকে তার জয় থেকে বঞ্চিত করতে গেলে সেও কি প্রতিশোধ নেবে না? শিল্পীরা তা হলে বিয়ে করেন না কেন? বিয়ে করলে তো আর বেআইনী অপারেশনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিয়ে করলে কি বোহেমিয়ান জীবন যাপন করা চলে? শিল্পীর পক্ষে বোহেমিয়ান জীবনই স্বধর্ম। অন্তত যতদিন যৌবন থাকে। যৌবনের আগুন জ্বলে। আগুন জ্বলতে থাকলে পতঙ্গও পুড়তে থাকবে, কিন্তু নিবে গেলে যে আর্টের সর্বনাশ। আগুন যখন নিবে আসবে, আর্টের মহত্তর কীর্তিগুলো নিঃশেষ হয়ে আসবে, তখনি আসবে বিবাহের সুসময়।

উন্নতকায় গৌরবর্ণ সদ্বংশীয় সুপুরুষ। তাঁর সন্তান হবে না তো হবে কার? প্রকৃতিই করেছে তার জন্যে ষড়যন্ত্র। কিন্তু মানুষের বিকৃত বুদ্ধি তাকে বাধা দিচ্ছে। এর ফল কখনো ভালো হতে পারে না. কদাপি ভালো হতে পারে না। চিন্ময় ছিল এর বেলা রম্যা রঁলার শিষ্য। তাঁর তৎকালীন উপন্যাস 'মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা' সে পড়েছিল। প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকার দরুন প্রেমিকার বিবাহ হয়ে ওঠে না। কিন্তু সে সমাজের ভয়ে ভীত না হয়ে প্রেমের নির্দেশে তার সন্তানের জন্ম দেয়। অমনি করে প্রেম পায় পূর্ণতা। তারপর নেমে আসে লোকনিন্দা, লাঞ্ছনা গঞ্জনা, সমাজের শাসন, কতরকম বিপত্তি। তবু সে আঁকড়ে ধরে থাকে তার পুত্রকে। তিল তিল করে তাকে গড়ে তোলে। প্রকৃতির জয় হয়, জয় হয় মনুষ্যত্বের।

সর্বাণীশ রায় ছিলেন চিন্ময়ের চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। কথাটা পাড়তে তার সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল। একদিন দুজনায় মিলে কাফেতে বসে আড্ডা দিতে দিতে কেমন করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'মসিয়ে স্নোয়া, আপনি তো একজন স্রষ্টা। সৃষ্টি সম্পূর্ণ হোক এটাই তো আপনার অন্তরের কামনা। কিন্তু সৃষ্টি যদি মাঝপথে অসম্পূর্ণ থেকে যায়? কেউ যদি আপনার ক্যানভাস কাঁচি দিয়ে কেটে দেয়?'

'তাকে খুন করব।' তিনি গর্জে উঠেছিলেন।

'তা হলেই ভেবে দেখুন, প্রকৃতির সৃষ্টি কুঁড়িতে ছিঁড়ে ফেলা কত বড়ো অন্যায়। প্রকৃতি কি ক্ষমা করবে।' আবেগের সঙ্গে বলেছিল চিন্ময়।

'অমন ধাঁধার মতো করে বলছ কেন, ভাই। সোজা কথায় বল।' তিনি ওকে কখন একসময় 'তুমি' বলতে শুরু করেছিলেন।

যা শুনেছিল চিন্ময় তাই শোনায় একটু মোলায়েম করে। কিন্তু হাজার মোলায়েম করলে কী হবে, কথাটা তো রূঢ়। শক খেয়ে তিনি টলে পড়েছিলেন।

'তুমি আমাকে কী ভেবেছ, জানিনে। কিন্তু তোমার কাছে আমি আত্মরক্ষা করব না, ভাই চৌধুরী। হ্যাঁ, সত্যি। আই প্লীড গিলটি। আমার জবাবদিহি এই যে সবরকম সতর্কতা সত্ত্বেও অ্যাকসিডেণ্ট ঘটে। অ্যাকসিডেণ্ট ইজ অ্যাকসিডেণ্ট। তখন চিকিৎসকের শরণ নিতে হয়। বেআইনী? হ্যাঁ, বেআইনী। কিন্তু কতদিন বেআইনী থাকবে? সভ্য সমাজকে একদিন না একদিন মনস্থির করতে হবে। আপাতত একটা মিথ্যা সাফাই দিতে হচ্ছে। রোগিণীর প্রাণ বিপন্ন। পুলিস যদি এটা মেনে নেয় তা হলে আর বেআইনী নয়। তা খরচ তো কিছু হবেই।' তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন।

চিন্ময় লণ্ডন থেকে এসেছিল। সে জানত সেখানে কী হয়। আদালতে গিয়ে নোট করেছিল পুলিসের পাকা ঘুঁটি ডাক্তার আসামীর কাউন্সেল সার হেনরি কার্টিস-বেনেট কেমন করে কাঁচিয়ে দিলেন। রোগিণীর প্রাণ বিপন্ন প্রমাণ করতে পারলেই হলো। ডাক্তারের কর্তব্য রোগিণীর প্রাণরক্ষা। নীতিরক্ষা তো যাজকের কাজ।

বলতে বলতে গরম হয়ে উঠেছিলেন মসিয়ে রোয়া। 'যারা আমার নিন্দায় পঞ্চমুখ তারা কী করে, বলব? তারা রেড লাইট এলাকায় রাত কাটায়। সেখানেও অ্যাকসিডেন্ট ঘটে কি না সে খবরে তাদের কী! সে দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে হয় না। কাজেই তারা এক একজন অনারেবল ম্যান। ভাই চৌধুরী, আমি কি ওদের মতো ভালগার হতে পারি? আমি যে রাজা সর্বাধীশ রায়ের প্রপৌত্র! আমরা আর কারো সঙ্গে শেয়ার করিনে। বাইজীরাই আমাদের আলয়ে আসেন। আমরা ওঁদের আলয়ে যাইনে। বিদেশেও সেই তেজ বজায় রেখেছি।'

॥ দুই ॥

প্যারিসের পর দিল্লীতে পুনর্দর্শন। মিনিট পনেরোর আলাপ। হাতে হাতে মিলিয়ে মসিয়ে রোয়া বলেন, 'দিল্লীর চাকরিটা যদি আকাশকুসুম না হয় তা হলে মাঝে মাঝে আবার আমাদের দেখা হবে, চৌধুরী। একটা না একটা সম্মেলন বা সেমিনার তো লেগেই আছে।'

কিন্তু বছর তিন-চার আর কোনো যোগাযোগ ঘটে না। না দিল্লীতে, না বম্বেতে, না কলকাতায়। শেষে একদিন শান্তিনিকেতনে পুনরায় দর্শন।

রতনকুঠিতে চিন্ময়ের কী একটা কাজ ছিল। হঠাৎ সর্বাণীশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ। 'আরে আপনি! মসিয়ে রোয়া।'

'চৌধুরী না?' তিনি তাঁর ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন. 'মিস্টার চৌধুরী। মাদাম রোয়া!'

প্রায় অর্ধেকবয়সী এক তন্বী রূপসীর স্বামী প্রায় পক্ককেশ এক ভগ্নদেহ পুরুষ। রাজযোটক নয়। দু'চার কথার পর রোয়া বলেন, 'সেবার দিল্লীতে আপনার মুখেই শুনেছিলুম আপনি শান্তিনিকেতনে ডেরা বেঁধেছেন। কথাটা আমার মনে ছিল। তাই আপনার সন্ধানেই বেরোব ভাবছিলুম। নর্মদা, তুমি তৈরি?'

এরপর চিন্ময়ের ডেরায় গিয়ে মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় পর্ব। চারজনে মিলে বাগানে গিয়ে বসেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

'কবে এলেন তা তো আমাকে জানতে দিলেন না, মসিয়ে রোয়া। ডিনারের আয়োজন করতুম। আর পাঁচজনকে ডাকতুম।' চিন্ময় অনুযোগ করে।

'কালকেই হোক না?' মিসেস চৌধুরী প্রস্তাব করেন।

'আমরা যে কাল সকালেই ফিরে যাচ্ছি।' মাদাম রোয়া জবাব দেন।

'একদিনের জন্যেই আসা। আজ সকালের ট্রেনেই পৌঁছেছি। ওসব ফর্মালিটির কী দরকার, ভাই চৌধুরী? কতকাল পরে দেখা! প্রাণ জুড়িয়ে গেল তোমার মুখে রোয়া নামটি শুনে। মনে পড়ে গেল প্যারিসের সেই দিনগুলির কথা। তখন তোমার গাইড ছিলুম আমি। আর আমার ফিলজফার ছিলে তুমি। ফ্রেণ্ড ছিলুম দুজনে দুজনার। সেসব দিন কি আর ফিরে পাব!' রোয়া চোখ বুজে ধ্যান করেন।

'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ!' চিন্ময় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

রোয়া এবার বলেন কেন শান্তিনিকেতনে এসেছেন। সেই দিল্লীর লাড্ডুটা আরেকজনের ভাগ্যে জোটে। একালে যাদের মুরুব্বির জোর তারা জমিদারের ছেলে নয়, সওদাগরের জামাই বা পলিটিসিয়ানের নেফিউ। রোয়া তাঁর ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'ভাগ্যিস ব্রিটিশ আমলে দেশে ফিরেছিলুম। মন্ত্রীরা তখন জেলে। গভর্নরস রুল। লাটসাহেবকে ছবি উপহার দিই। ছবি দেখে তিনি তন্ময়। সঙ্গে সঙ্গে চাকরির অফার। নাৎসীদের থাবা থেকে রেফিউজী, এই যথেষ্ট সুপারিশ। আমার নামে বই বেরিয়েছে এই যথেষ্ট যোগ্যতা। আর রাজা সর্বাধীশ রায়ের প্রপৌত্র এই যথেষ্ট রেফারেন্স। লাটসাহেবের কলমের এক খোঁচায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

'আপনি বম্বেতে থাকেন জানলে বছর দশেক আগেই দেখা

করতুম। সেখানে যেতে হয়েছিল ছেলেকে জাহাজে তুলে দিতে। চিন্ময় আক্ষেপ করে।

'সেটা তোমার দোষ নয়, চৌধুরী। মডার্ন আর্ট এদেশে কেউ জানে না, কেউ বোঝে না, কেউ চায় না। নয়তো আমি নিজ বাসভূমে পরবাসী হতুম না। সচিত্র পত্রিকায় আমার ছবি ছাপে না। দৈনিক পত্রিকায় আমার নাম বেরোয় না। বহুদিন একা একা সংগ্রাম করেছি। ক্রমে ক্রমে লোকের রুচি বদলেছে। জাতীয়তাবাদের মোহ কেটেছে। এপথে আরো অনেকে এসেছেন। অথচ আমি নিজে এখন আউট অফ ডেট। কারণ প্যারিসের সঙ্গে আউট অফ টাচ। আর্টের সাধনা নিঃসঙ্গ মানুষের একক সাধনা নয়। পাখিদের মতো আমাদেরও একসঙ্গে থাকা চাই। পরস্পরের উপর নজর রাখতে হয়। কে কেমন আঁকছে। আমারও তো সংশোধন আবশ্যক। মডার্নের আরো মডার্ন আছে। আমি বুঝতে পারি যে শেষে ফিরে এসে আমি পেছিয়ে পড়ছি। আমি নিরুপায়। এখন চাকরিটারও মেয়াদ ফুরিয়ে যাচ্ছে। চটপট একটা আস্তানা যোগাড় করতে হবে। তারই খোঁজে বেরিয়েছি। নর্মদা তো রবীন্দ্রনাথ বলতে অজ্ঞান। তার চিরদিনের সাধ শান্তিনিকেতনে বাস। আজ তাই সারাদিন টহল দিয়েছি সাইট দেখতে নয়, সাইট দেখাতে।' তিনি বুঝিয়ে দেন দৃশ্য নয়, জমি।

'সাইট পছন্দ হয়েছে?' মিসেস চৌধুরী শুধান।

'আমি তো মনে করি শান্তিনিকেতনের প্রতি ধূলিকণাই পবিত্র। যেখানে কবিগুরুর শ্রীচরণের পরশ।' মাদাম রোয়া ভক্তিতে গদ্‌গদ।

'তা হলে আর কী! বম্বে ছেড়ে চলে আসুন। আপাতত একটা ডেরা ঠিক করে দিচ্ছি। সেইখানে থেকে মনের মতো বাড়ি বানাবেন। নিজের পছন্দমতো স্টুডিও।'

'গুরুদেবেরও তো ইচ্ছা ছিল যে শিল্পীরা গুণীরা সাহিত্যিকরা দলে দলে এখানে এসে বসবাস করেন। গড়ে ওঠে একটি উপনিবেশ।' উৎসাহ দেয় চিন্ময়।

মসিয়ে রোয়া ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন। 'স্ট্রেঞ্জ ক্রীচার্স! এতজনের সঙ্গে দেখা হলো, একজনও শোনেনি যে রোয়া বলে কোনো শিল্পী আছেন। প্যারিস থেকে যাঁর নামে বই বেরিয়েছে; এক রামকিঙ্করই আমাকে চিনলেন। নিজে মডার্ন আর্টিস্ট কিনা। শুধু ওই একজনের খাতিরেই তো এই অজ্ঞদের রাজ্যে অজ্ঞাতবাস করতে পারিনে। হ্যাঁ, থাকতেন যদি টেগোর। উনি আমাকে ঠিক ধরে রাখতেন। প্যারিসে কি ওঁর সঙ্গে কম দহরম মহরম করেছি! রাজা সর্বাধীশের প্রপৌত্র শুনে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।'

আমি দুঃখিত হয়ে বলি, 'তা হলে আপনি প্যারিসেই ফিরে যান না কেন? এই পোড়া দেশে আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে কজন আর কোথায়?'

এর উত্তরে তিনি গম্ভীর হয়ে যান, বলেন, 'বছর দুই আগে প্যারিস ঘুরে এসেছি। বিলকুল বদলে গেছে। কোথায় সেইসব স্টুডিও! কোথায় সেইসব কাফে! কোথায় সেইসব রেস্তোরাঁ! কোথায় সেইসব হোটেল! আমার সেকালের বন্ধু বা পরিচিতরা কেউ ফৌত হয়েছে, কেউ ছড়িয়ে পড়েছে। যে দু' চারজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তাঁরা আরো মডার্ন হয়েছেন। তাঁদের তুলনায় আমি আউট অফ ডেট। একালের শিল্পীরা আমার নামই শোনেনি। আমার নামের বইখানাও আর ছাপে না। একালের সমজদারদের কাছে আত্মপরিচয় দিতে লজ্জা হয়। তাঁরা সাফ বলে দেন, আপনাদের যুগ গেছে। যেখানেই যাই সেখানেই মনে হয় আমি যেন যুদ্ধপূর্ব যুগের এক ভূত। চেহারাটাও ভূতের মতো হয়েছে। প্রাণটা জুড়িয়ে গেল যখন আমারই মতো এক ভূত আমাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, মসিয়ে রোয়া। এতদিন ছিলে কোথায়? তারও জীবন দুর্বহ। সব জিনিস আগুন। অথচ কত সস্তা ছিল যুদ্ধের আগে।'

চিন্ময় চুপ করে শুনে যায়। কথা বাড়ায় না। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ

করেন মিসেস চৌধুরী। মাদামকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাদের ছেলেমেয়ে ক'টি ?'

উত্তর পান, 'আমরা, ভাই, নিঃসন্তান।'

রোয়ার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। তিনি চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'চৌধুরী, চল তোমার বাগান ঘুরে দেখি। ওঁরা মেয়েলি গল্প জুড়ে দিয়েছেন। পুরুষদের শোনার কী দরকার।'

মহিলাদের শ্রবণসীমার বাইরে গিয়ে তিনি বলেন, 'মেয়েদের মুখে আর কোন প্রশ্ন নেই! ছেলেমেয়ে ক'টি। তোমার উনি না জেনে কতবড়ো আঘাত দিলেন আমার প্রাণে! যখনি যেখানেই এমনতর প্রশ্ন শুনি, শুনে আমার মন শুধু নয়, আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। নর্মদা তার উত্তরে যা বলেছে তাও না জেনে বলা। সে নিজে অবশ্য নিঃসন্তান, তা বলে আমি তো ঠিক নিঃসন্তান নই। আমার সন্তানদের যদি আমি জন্মাতে দিতুম তা হলে ওদের সংখ্যা হতো দুই। না, না, যত রটে তত বটে নয়। বহু নারীর সংসর্গে এসেছি, কিন্তু সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে মাত্র দুটিবার।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, মসিয়ে রোয়া।' চিন্ময় বলে আর্দ্র স্বরে।

'ধন্যবাদ, ভাই চৌধুরী। এই বা ক'জন করে! তা হলে শোন, তোমাকেও আমি বিশ্বাস করে বলি, ভগবান আমার কাছে যাদের পাঠিয়েছিলেন সেই দুই দেবদূত স্বর্গে ফিরে গিয়ে তাঁকে হয়তো জানিয়েছে যে, আমি ছেলেমেয়ে ভালোবাসিনে। তাই ভগবান আমাকে এ জন্মে আর ছেলেমেয়ে দিলেন না। দিলে কত খুশি হতুম! পরের ছেলেমেয়েদের আমি কত ভালোবাসি! নিজের ছেলেমেয়েদের ভালোবাসতুম না? কিন্তু না চাইতে যাদের পাওয়া যায় ফিরিয়ে দিয়ে শত চাইলেও তাদের পাওয়া যায় না। ছেলেমেয়ে হচ্ছে বিধাতার দান। আমরাই সৃষ্টি করি, এ ধারণা সম্পূর্ণ অলীক। যখন চাইব তখন হবে এটা নির্বোধের দুরাশা।

বেচারী নর্মদা! ও তো ছেলেমেয়ের জন্যে কাঙাল। আহা, ওকে কী বলে সান্ত্বনা দিই! আমার কর্মফল আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে। তা বলে ওকে ভোগ করতে হবে কেন? অনেকবার ভেবেছি ওকে ছেড়ে দিই। ও আবার বিয়ে করুক। মা হোক। কিন্তু আমার পূর্ব ইতিহাস শোনাতে সাহস পাইনে। হিন্দুর মেয়ে, ও তো পাগল হয়ে যাবেই, আমাকেও পাগল করে ছাড়বে। দোহাই তোমার, চৌধুরী, তুমি যেন তোমার মিসেসকে আমার পূর্ব কাহিনী বলতে যেয়ো না। কে জানে তিনি হয়তো একদিন আমার মাদামের কানে তুলবেন, যদি আবার কোথাও কোনোদিন দেখা হয়। শান্তিনিকেতনে না থাকার এটাও একটা কারণ। জানি এ অপরাধের মার্জনা নেই।' তিনি কাতর কণ্ঠে বলেন।

এরপরে যা ঘটে তা অভাবনীয়।

'এই আমি আমার দুই কান মলছি। এই আমি আমার নাক মলছি। অমন কর্ম আর কোনো জন্মে করব না।' তিনি সত্যি সত্যি নিজের হাতে নিজের নাক কান মলেন।

চিন্ময় তাঁর হাত চেপে ধরে। বলে, 'ক্ষমা আছে। ক্ষমা আছে।'

বৃহন্নলা

সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনার পর কে যেন প্রশ্ন করেছিল, সীতা মেয়ে না পুরুষ? তেমনি এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল সেদিন আমাদের ঘরোয়া আড্ডায়। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সেই বৈঠকে আমরা ছিলুম বারোজন নরনারী।

নারীপ্রগতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এবার জলযোগের আয়োজন, এমন সময় রসভঙ্গ করেন আমাদের বর্ষীয়ান বন্ধু শিশিরদা।

'তোমরা যে নারীদের জন্যে ভেবে আকুল হচ্ছ, আগে ডিফাইন কর তো, নারী বলতে কী বোঝায়? কাকে বোঝায়?'

সকলেই স্তম্ভিত। মহিলারা বিক্ষুব্ধ। আলোচনার সেইখানে ইতি। যিনি বলছিলেন তাঁর মুখের কথা মুখেই রয়ে যায়। কথা কেড়ে নেন শিশিরদা।

'আহা, এতে উত্তেজিত হবার কী আছে! আমি কি ইঙ্গিত করেছি যে স্ল্যাক পরে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা মেয়েছেলে নয়? কিংবা হিপিদের মত যারা চুল ছেড়ে দেয় তারা বেটাছেলে নয়? শোন, তোমাদের আমি এক এক করে তিনটি প্রশ্ন করছি। যদি একবাক্যে প্রত্যেকটির যথার্থ উত্তর দিতে পারো তবে আমিই বোকা বনে যাব। নয়তো বোকা বনবে তোমাদের একাংশ।' এই বলে তিনি সকলের কৌতূহল জাগিয়ে দেন।

তারপর শুনিয়ে যান এক এক করে তাঁর তিনটি প্রশ্ন। বার বার পুনরুক্তি করেন।

নবদ্বীপের বিশাখা সখী কি নারী? পার্বত্য চট্টগ্রামের মঙ্ রাজা নানুমা কি পুরুষ? প্রতাপগড়ের মুরলী দাস কি বৃহন্নলা?

এ খেলার নিয়ম হচ্ছে এক কথায় উত্তর দিতে হবে। হ্যাঁ কিংবা

না। তৃতীয় কোন উত্তর নেই। থাকলে বিধাতার জানা। উত্তরের নিচে নাম লিখতে হবে না।

এর পরে আমরা কাগজ পেনসিল নিয়ে বসে যাই ও উত্তর লিখে শিশিরদার হাতে গুঁজে দিই। কিন্তু কাউকে জানতে দিইনে কে কী লিখেছি।

শিশিরদা ঘোষণা করেন, 'প্রথম প্রশ্ন ছিল, বিশাখা সখী কি নারী? ছ'জন লিখেছেন, হ্যাঁ। পাঁচজন লিখেছেন, না। বাকী একজন লিখেছেন, অ্যাঁ! নপুংসক! এ উত্তর বাতিল। এটা ফেয়ার গেম নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, মঙ্ রাজা নান্মুমা কি পুরুষ? সাতজন লিখেছেন, হ্যাঁ। চারজন লিখেছেন, না। বাকী একজন আবার সেই—নপুংসক! এটা মানহানিকর। ক্ষমাপ্রার্থনা চাই। এই বলে তিনি একে একে প্রত্যেকের দিকে তাকান। কেউ ধরাছোঁয়া দিলে তো?

তারপর তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, প্রতাপগড়ের মুরলী দাস কি বৃহন্নলা? এর উত্তরে চারজন লিখেছেন, হ্যাঁ। সাতজন লিখেছেন, না। হা ভগবান! বাকী একজন ফের সেই কথা—নপুংসক! যাকে নিয়ে সারা শহর তোলপাড়, আদালত গুলজার, সে হলো কিনা নপুংসক!' শিশিরদা মাথায় হাত দিয়ে বসেন।

আমরা তখন তাঁকে হাতে পায়ে ধরে সাধি—'উত্তরগুলো ঠিক হয়েছে কি না বলুন না দয়া করে।'

'ঠিক হবে কী করে? সব ক'টাই পরস্পরবিরোধী। ভোটের ওপর ছেড়ে দিলে বিশাখা সখী হন নারী। যা আদৌ সত্য নয়। মঙ্ রাজা নান্মুমা হন পুরুষ। যা শুধু কাগজে কলমে। আর মুরলী দাস হয় না বৃহন্নলা। তা হলে সে কী? নারী? এই নিয়ে অনর্থ বোধ যায় আমার ছেলেবেলায়। পারিবারিক শান্তিরক্ষার খাতিরে মামলাটা ধামাচাপা দেওয়া হয়। ডাক্তারি পরীক্ষায় যদি ধরা পড়ে ও পুরুষ তা হলেও ফ্যাসাদ। যদি বোঝা যায় যে সে নারী তা হলেও ফ্যাসাদ। হয় স্ত্রীর নামে কলঙ্ক লাগে, নয় স্বামীর গায়ে

চুনকালি পড়ে। সে এক সেনসেশনাল কেস।' এই বলে শিশিরদা মুখ টিপে হাসেন।

তখন আমরা সকলেই তাঁকে চেপে ধরি—'বলতেই হবে আপনাকে। শুধু ওই একটা নয়, তিনটে গল্পই। দাদা, এ তো বড় রঙ্গ, দাদা, এ তো বড় রঙ্গ। তিন গল্প বলতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।'

জলযোগের আয়োজন ছিল। দেখতে দেখতে চা এসে পড়ল।

শিশিরদা বলেন, 'তিনটে গল্প জানলে তো তিনটেই শোনাব? প্রথম দুটো ছুঁয়ে যাব। তিনেরটাই আসল।'

এর পরে কথারম্ভ। শিশিরদার জবানীতেই বলা। নিচে তার ধারাবিবরণী।

॥ দুই ॥

আমার বাবা আমাকে লিখেছিলেন, 'তুমি যদি কর্মোপলক্ষে নবদ্বীপে যাও তা হলে একবার বিশাখা সখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আমার তিনি বিশাখা দিদি।' কিছুদিন পরে একদিন নবদ্বীপ যাত্রার সুযোগ পাই। সেখানে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে বিশাখাকুঞ্জে হাজির হই। বিশাখা সখী আমাকে ভিতরে ডেকে পাঠান। বাপের বয়সী হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পুরুষ দেখে হকচকিয়ে যাই। পরনে শাড়ি, মুখে ঘোমটা। ঘোমটার আড়ালে প্রকাণ্ড এক নথ। কথা বলেন মেয়েলি ঢঙে নথ নাড়া দিয়ে। হাবভাব অবিকল মেয়েদের মতো। তেমনি কটাক্ষপাত। শ্রীরাধার অষ্টসহচরীদের বয়স তো কখনো বাড়ে না। ষাট ছাড়িয়ে গেলেও ষোড়শী। ওদিকে ক্ষৌরকর্ম সত্ত্বেও দাড়ি গোঁফ ফুটে বেরোচ্ছে। বিশাখা সখী তাঁর সাধনার খাতিরে শুধু যে নারীবেশ ধারণ করেছেন তাই নয়, কায়মনোবাক্যে নারী হয়ে গেছেন বা হতে চেয়েছেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনে পুরুষ ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। একে ওকে তাকে ডাক দিয়ে হুকুম যখন করেন তখন পুরোদস্তুর মঠাধীশ। কথাবার্তাও বিষয়ী লোকের মতো। আমার সঙ্গে আধ্যাত্মিক নয়, আধিভৌতিক প্রসঙ্গেই আলাপ।

আমার পরিচয় আমি একজন রাজকর্মচারী। পরে আমি অনুসন্ধান করে জেনেছিলুম যে বিশাখা সখী লোক ভালো। তাঁর বিরুদ্ধে কারো কোন অভিযোগ নেই। বৈষ্ণবদের মতে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। তিনি বৈষ্ণবী।

আমার যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল সেটা এই যে তিনি পুরুষ হয়েও আর সকলের দিদি। আমার তো সম্পর্কে পিসি। আমার কাণ্ডজ্ঞান না থাকলে হয়তো ডেকে বসতুম, পিসি। না, তাঁকে দিদি বলেও ডাকিনি। সখী বলেও না! পরে উল্লেখ করার সময় কী বলেছিলুম মনে পড়ে না। ভদ্রলোক না ভদ্রমহিলা? ইংরেজীতে টুর ডায়েরী লিখতে গিয়ে হী লিখেছিলুম না শী?

এই একই সমস্যায় পড়ি পার্বত্য চট্টগ্রামের মঙ্‌ ট্রাইবের রাজার সঙ্গে মোলাকাত করতে গিয়ে। না, তিনি রাণী নন। রাজার উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি রাজা। যদিও তিনি পুরুষই নন। সর্বতোভাবে নারী। পরনে বর্মী মহিলাদের মত লুঙ্গী ও ব্লাউস। মহামুনি মেলায় তিনি যোগ দিতে এসেছেন শুনে আমরা স্বামী-স্ত্রী গিয়ে সৌজন্য প্রদর্শন করি। বৌদ্ধদের সেই বিখ্যাত মেলা যেখানে অনুষ্ঠিত হয় সেটা তাঁর নিজের এলাকায় পড়ে না। তাই রাজবেশ ধারণ করেননি। সাদাসিধে পোশাকেই আমাদের রিসিভ করেন। একটা মাচার ওপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। সেখানেই অস্থায়ী ডেরা। পরিকরদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার রাজোচিত। বেশ বোঝা যায় অথরিটি আছে। নারী বলে কেউ তাঁকে রাজার চেয়ে হীন মনে করতে সাহস পায় না। রাজত্বের বেলা তিনি পুরুষ। তাঁর যদি কোন সাধনা থাকে তবে সেটা নারী হবার নয়, পুরুষ হবার। অথচ তিনি তাঁর গৃহজীবনে জায়া ও জননী। আমরা তাঁকে সেইরূপেই দেখি। সেদিন তিনি আমাদের সহজভাবে দেখা দেন। বুঝতে পারি তিনি নারী ভিন্ন আর কিছু নন। ফিরে এসে টুর ডায়েরিতে কী লিখি তা কি মনে আছে? হী না শী?

এই যে পর পর দুটি অভিজ্ঞতার কাহিনী ছুঁয়ে গেলুম এ দুটি

অপেক্ষাকৃত সরল। নবদ্বীপের সবাই জানত যে বিশাখা সখী নারী নন, পুরুষ। কারো মনে কোন সংশয় ছিল না। তেমনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের সবাই জানত যে মঙ্ রাজা নামুমা পুরুষ নন, নারী। যেমন মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ছিলেন পুরুষবেশে নারী। কারো মনে কোন সংশয় ছিল না। আমিও নিঃসংশয়।

কিন্তু সে-কথা কি বলতে পারি মুরলী দাসের বেলা? তখন আমি খুবই ছেলেমানুষ। বয়স কত হবে! দশ কি এগারো। কে যে নারী কে যে পুরুষ মুখ দেখে বা বুক দেখে চেনার বয়স সেটা নয়। দুখী বলে একটি মেয়ে আমাদের খেলার সাথী ছিল। সে কিন্তু সব সময় পরে থাকত ছেলেদের মত ধুতি। আমরা ওকে ভিন্ন ভাবতুম না। একদিন শোনা গেল দুখীকে আর ছেলেদের সঙ্গে খেলতে দেওয়া হবে না। যদিও সে দারুণ পুরুষালী। পরে ওর বিয়ে হয়ে যায়।

মুরলী যে কবে কোন্ সুদূর থেকে এসে অবতীর্ণ হয় তা আমার স্মরণ নেই। তবে এইটুকু মনে আছে সে প্রতাপগড়ের অধিবাসী নয়। শহরের বাবুদের একটা অ্যামেচার থিয়েটার দল ছিল। তাতে মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় যারা করত তারা কেউ মেয়ে নয়। রং পাউডার মেখে এক একটি সং সাজত। গুঁফোরাও গোঁফ কামাত না, শাড়ি পরে সেটার আঁচল দিয়ে গোঁফ ঢাকত। হঠাৎ মুরলীকে পেয়ে দলের লোক স্বর্গ হাতে পায়। ওর বয়স হয়েছে, অথচ গোঁফ দাড়ি গজায়নি। ওকে সব সময় বুক ঢেকে রাখতে দেখা যেত। বুকটা বেশ উঁচু হয়ে থাকত। পুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করত না মুরলী। থিয়েটারের সময় ওর নারীবেশ। অন্য সময় পুরুষবেশ। পশ্চিমাদের মত পিরাণ ও চুড়িদার পায়জামা। মাথায় একরাশ বাবরী চুল। সেকালে ওটাই ছিল ফ্যাশন।

থিয়েটার তো রোজ রাত্রে হয় না। মেয়েদের জন্যে পৃথক বন্দোবস্ত না থাকায় ভদ্রঘরের মহিলারা যেতে পারেন না। তখন তাঁদের জন্যে তাঁদের নিজেদের বাড়ির আঙিনায় দুটো একটা দৃশ্য

অভিনয় করে দেখানো হয়। মুরলী তাতে থাকবেই। নয়তো নাচবে গাইবে কে? অমনি করে ওখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে মুরলীর জন্যে অনেকগুলি দরজা খুলে যায়। অন্দরেও তার প্রবেশ অবারিত। তার বয়স তখন কতই বা! আঠারো উনিশ। বাড়ির ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে সেও ভিতরে গিয়ে আসন পেতে খায়, আসরে বসে গায়। সাধাসাধি করলে পকেট থেকে ঘুঙুর বার করে। নাচে।

আমার ঠাকুমা ক্রমে ক্রমে ওর মুখ থেকে ওর মনের কথা টেনে বার করেন। ওর পড়াশুনায় তেমন মন নেই যেমন নাচ গানে। সেইজন্যে পড়াশুনা বেশীদূর এগোয়নি। বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলে। উপার্জনের ধান্দায় শহরে শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথাও এক বছর, কোথাও ছ'মাস। এখানে যদি একটা চাকরি জুটে যায় তো বরাবরের মত থেকে যাবে।

ঠাকুমা একদিন বাবাকে বলেন, এত লোকের চাকরি হয়, মুরলীর হয় না? ও কি সব কাজের অযোগ্য! বাবা উত্তর দেন, ও যে লেখাপড়া শেখেনি, লেখাপড়ার কাজ কি ওকে দিয়ে হবে? পিয়ন চাপরাশি দপ্তরীর কাজ দিতে পারি, কিন্তু তা হলে ও কি বাবুদের সঙ্গে বাবুয়ানা করতে পারবে? ও যে কোথাকার লোক, কী জাত, কোন্ বংশ, কার ছেলে সবই তো অজানা। না, আমি ওকে আশা দিতে পারব না। আর কোথাও চেষ্টা করতে বল। ঠাকুমা মনে দুঃখ পান। আহা, বেচারা কোথায়ই বা যাবে! লেখাপড়া যখন জানে না তখন যেখানেই যাক একই উত্তর শুনবে। ওকে আবার ইস্কুলেই দেওয়া উচিত, কিন্তু এত বয়সে সেখানেও কেউ নেবে না।

শেষে ওকে কপিস্ট বা নকলনবিশের কাজ দেওয়া হয়। রোজ আপিসে গিয়ে এত পৃষ্ঠা লেখে। এত সিকে পায়। তখনকার দিনে একজন নিম্নপদস্থ কেরানীর সমান আয়। সমাজেও সমান মর্যাদা। মুরলী তো বর্তে যায়। টিকে থাকলে ভার্নাকুলার ডিপার্টমেন্টে কেরানীর পদও ভাগ্যে জুটত। কিন্তু একদিন আপিসের সেরেস্তাদার

ওকে ডেকে শাসিয়ে দেন যে আপিসে বসে আপিসের টাইমে গান করা চলবে না। মুরলীর কৈফিয়ত গান তো সে আর পাঁচজনের উপরোধে গেয়েছে। নিজের থেকে গায়নি। সেটা তিনি সরাসরি অগ্রাহ্য করেন, যদিও সেটা সত্য। তখন মুরলী তাঁর মুখের উপর শুনিয়ে দেয়, সার, আমি অফিসারও নই, কেরানীও নই, চাপরাশি বা পিয়নও নই। আমার কোন মাইনেও নেই, চেয়ারও নেই, বেঞ্চিও নেই। আমি গাছতলায় মাদুর পেতে বসে দলিল নকল করি। দিনের শেষে এক টাকা কি পাঁচসিকে পাই। পান সিগারেট যারা বেচে তারাও আরো বেশী রোজগার করে। আগে আমাকে একটা পায়া দিন, তারপরে পায়া কেড়ে নেবার ভয় দেখাবেন। আমিও ভয় পাব। আমি একটা নগণ্য আরশুলা। আরশুলা আবার পাখি! তার আবার বন্ধনের ভয়! চাইনে আমি এ বন্ধন। এই বলে সে বেরিয়ে যায়। সেরেস্তাদার চুপ।

মুরলীর যারা শুভানুধ্যায়ী তারা ওকে বোঝান যে উপরওয়ালার কথা মাথা পেতে না নিলে চাকরি করা চলে না। তা সে যে চাকরি হোক। মুরলী অবুঝ। সে বলে, গান করতে বললে আমি গান করি। আপিসও জানিনে, টাইমও জানিনে। গান করতে বললে আবার করব। না করে থাকতে পারব না। গানই আমার প্রাণ।

তখন এক ভদ্রলোক ওকে নিজের বৈঠকখানার একপাশে একটি ঘরে আশ্রয় দেন। সেখান থেকে ও গান শিখিয়ে বেড়ায়। বাবুকেও হারমোনিয়াম বাজাতে শেখায়। সন্ধ্যাবেলা যে আসর বসে তাতে ওকে নাচতে বললে ও নাচে। অন্দর থেকে খাবার আর জলখাবার আসে। গৃহিণীর স্বহস্তের পাক। মুরলীর মতো ভাগ্যবান কে? কিন্তু বাবুর একটু পানদোষ ছিল। সন্ধ্যাবেলা গানের সঙ্গে সঙ্গে পানও চলত। হয়তো কিছু বেলেল্লাপনাও ছিল তার আনুষঙ্গিক। বলতে ভুলে গেছি যে নাচ গানের সময় মুরলীকে নারীবেশ ধারণ করতে হত। কেবল এই বাড়িতে নয়, সব বাড়িতেই। আমাদের বাড়িতেও আমি ওর মোহিনী মূর্তি দেখেছি। পুরুষ বেশটা ওর ছিল ঘোরাঘুরির

বেশ। নাচ গানের বেশ নয়। নাট্যের বেশ নয়। এমনও হতে পারে যে দিনের বেলা ও পুরুষ, রাতের বেলা নারী। আমি তখন নেহাত ছেলেমানুষ। মানুষ চেনা আমার সাধ্য নয়।

মাস কয়েক বাদে কানাঘুষা শোনা গেল মুরলীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? ও তো ভবঘুরে। কিন্তু একই কালে আর একজনও নিখোঁজ। তিনি অভিরামবাবুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। কেমন মুখরোচক গুজব! দুই আর দুই মিলিয়ে চার হয়। লোকের মুখে হাত চাপা দেওয়া যায় না। কেউ বলে ভদ্রমহিলা মুরলীর সঙ্গে ইলোপ করেছেন। কেউ বলে মুরলী কি পুরুষমানুষ যে ওর পৌরুষ দেখে কোন মেয়েমানুষ ভুলবে? আছে এর পেছনে কোন গভীর রহস্য।

এতে মুরলীরও সম্মানহানি হয়। যারা ওর পক্ষপাতী তারা বলেন মুরলী কি তেমনি ছেলে যে ও রকম দুষ্কর্ম করবে! নাচ গান বাজনা নিয়ে থাকে। সেটা তো খারাপ কিছু নয়। এর উত্তরে প্রতিপক্ষ থেকে বলা হয়, ও যে বেটাছেলেই নয়। বেটাছেলে হলে দুষ্কর্মের প্রশ্ন উঠত। না হলে তো সে প্রশ্নই ওঠে না। অভিরামবাবুর স্ত্রীর কলঙ্ক ক্ষালন করতে গিয়ে তাঁরা পরোক্ষে ওর আশ্রয়দাতা অভিরাম বাবুকেই দোষ দেন। অথচ কারো হাতে কোন প্রমাণ নেই। সমস্ত ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য। মুরলী মেয়ে না পুরুষ?

অভিরামবাবু প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারেননি যে তাঁর স্ত্রী ইলোপ করেছেন, তাও মুরলীর সঙ্গে। অসম্ভব বলে তিনি সেই সম্ভাবনাটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু সমাজের দশজনের কাছে মুখরক্ষার খাতিরে তাঁকে পুলিসের শরণ নিতে হল। তাও প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। পুলিসের লোক সত্যি সত্যি একদিন ধরে নিয়ে আসে দুজনকে। দুজনেরই নারীবেশ। আদালতে নয়, হাকিমের খাস কামরায় নিয়ে গিয়ে হাজির করে দেয় ওদের। অভিরামবাবুর স্ত্রী বলেন তিনি সব কথা খুলে জানাতে রাজী, কিন্তু কেবলমাত্র হাকিমের সম্মুখে। তখন খাস কামরা থেকে আর সবাইকে

সরিয়ে দেওয়া হয়, মুরলীকেও। হাকিম লিখতে শুরু করলে ভদ্রমহিলা তাঁকে বারণ করেন। তিনি কলম থামান। কাজেই বয়ানের কোন রেকর্ড থাকে না। বয়ানের মর্ম: অভিরামবাবুর স্ত্রী স্বামীর মতিগতি দেখে ক্রমে ক্রমে উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠেন। মুরলীর সঙ্গে শোওয়া-বসা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে শুনে তাঁর সন্দেহ জন্মায় যে মুরলী হয়তো পুরুষের বেশে নারী। তাই যদি হয়ে থাকে তবে মুরলী যেমন তাঁর স্বামীকে সুখী করতে পারবে তিনি কি তেমন পারবেন? নাচ গান বাজনা এর কোনটাই তিনি জানেন না। শিখতে চাইলে মুরলীর কাছেই শিখতে হয়। চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কর্তা বিমুখ। ঘরের বৌকে নাচ গান বাজনা শিখতে দিলে সে কি আর বৌ হয়ে থাকবে? সে হবে বাইজী। কী ঘেন্না! এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে বিরোধ বেধে যায়। তখন তিনি একদিন কাউকে না জানিয়ে রাত থাকতে পুরী যাবার জন্যে রওনা হন। অবাক হন যখন বেশ কিছুদূর গিয়ে আবিষ্কার করেন যে তাঁর অনুসরণ করছে আর কেউ নয়, মুরলী। তার রাতের বেলার নারী-সাজ সে ছাড়েনি। দিনের বেলার পুরুষ-সাজ পরেনি। পায়ে হেঁটে তাঁরা রেলস্টেশনে যান, সেখানে পুরীর ট্রেন ধরেন। পুরীর এক ধর্মশালায় পুলিস গিয়ে তাঁদের পাকড়ায়।

হাকিম অভিরামবাবুকে ডেকে পাঠান। সোজাসুজি প্রশ্ন করেন, মুরলীকে যদি ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয় তা হলে যা দাঁড়াবে তার জন্যে কি তিনি প্রস্তুত? ভদ্রলোক আর্তনাদ করে ওঠেন—না, না, ধর্মাবতার, অমন কাজটি করবেন না। আমার স্ত্রীকে আমি ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর করে রাখব। মুরলীকে আপনি ছেড়ে দিন। ও যেন এ তল্লাট ছেড়ে বরাবরের মত চলে যায়। পাথেয় যা লাগবে আমি যোগাব।

হাকিম ভেবে দেখেন ওর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। পারিবারিক শান্তি ওইভাবেই ফিরে আসতে পারে। ডাক্তার যদি বলেন যে মুরলী নারী নয় পুরুষ তা হলে অসতী বলে ভদ্রমহিলার কলঙ্ক রটবে। স্বামীর কী! আবার বিয়ে করবেন। আর যদি পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে মুরলী পুরুষ নয় নারী তা হলে ভদ্রলোকের মাথা কাটা যাবে।

পুলিস যদি চার্জ শীট দেয় প্রধান সাক্ষী তো হবেন অভিরামবাবুর স্ত্রী। তাঁর উক্তি সত্য হলে মুরলীর কী অপরাধ? আর মিথ্যা হলে মিথ্যাবাদিনীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে কি? আর অভিরামবাবু যদি সাক্ষী দিতে দাঁড়ান কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে না তো? আদালত সত্য উদ্ধার করতে চান, কিন্তু সত্য যেখানে সাপ সেখানে একটা ধামা এনে চাপা দেওয়াই নিরাপদ নয় কি? নইলে পরিবারটা উৎসন্ন যাবে। মুরলীর এমন কী ক্ষতি হবে!

ছোট শহর। একটা সেনসেশনাল কেসের জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব। কিন্তু কেস আর হল কোথায়! বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। পুলিস দিল ফাইনাল রিপোর্ট। মুরলী পেল ছাড়া। পেয়ে নিরুদ্দেশ। অভিরামবাবুর স্ত্রী হলেন কলঙ্কমুক্ত। অভিরামবাবু রইলেন অনিন্দিত। কিন্তু শুরু হয়ে গেল রাস্তায় ঘাটে বৈঠকখানায় অন্দরে বাদ প্রতিবাদ। একপক্ষ বলে, পরের বৌঝিকে বার করে নিয়ে যাবে, তার কোন শাস্তি হবে না? অপরপক্ষ বলে, ফুসলানির মামলায় যার শাস্তি হয় সে নারী নয়, পুরুষ। মুরলী কি পুরুষ? একপক্ষ বলে, বেশ তো, ডাক্তারের কাছে পাঠালেই হত। অপরপক্ষ বলে, ডাক্তার যদি রিপোর্ট দিত মুরলী নারী, তা হলে সাজানো মামলার জন্যে অভিরামবাবুর হত শ্রীঘর। একপক্ষ বলে, যদি রিপোর্ট দিত মুরলী পুরুষ তা হলে? অপরপক্ষ বলে, তা হলে অভিরাম হতেন রামায়ণের রাম। সীতাকে কখনো ঘরে নিতেন না। ধর্মশালা তো অশোকবন নয়। একপক্ষ বলে, অন্যায়কে ধামাচাপা দেওয়াটাও অন্যায়। অপরপক্ষ বলে, অন্যায় তো মুরলীর উপরেই হয়েছে। স্বামীস্ত্রী দুজনেই তাকে দুইভাবে ব্যবহার করেছেন।

আমাদের সংসারে আমার ঠাকুমার মতই চূড়ান্ত। তিনি বলেন, ও ছিল মহাভারতের বৃহন্নলা। কোন এক অজ্ঞাত কারণে অজ্ঞাতবাস করছিল। অর্জুনও তো নৃত্যগীত শেখাতেন। কলিযুগের উত্তরা হচ্ছে অভিরামের বৌ চপলা। তৃতীয় পক্ষ বলে ভারী অভিমানী।

হারমোনিয়াম বাজাতে চেয়েছিল। বাজাতে দিল না বলেই তো এ বিভ্রাট।

এই মহাভারতীয় ব্যাখ্যা আমাদের পাশের বাড়ির মাসিমাদের হাসির খোরাক। তাঁরা বলেন, সব সময় বুকে কাপড় বেঁধে রাখে কোন্ বেটাছেলে? লুকিয়ে থাকে দিব্যি গোলগাল দুটি ডালিম। আর চাউনিটিও ডাইনীর মতো। মা গো, মা! কী কাণ্ড! মুনিদেরও মন টলে। অভিরামবাবু তো তুচ্ছ প্রাণী। তা বলে গৃহত্যাগও তো ভালো নয়। কেন যে ও কর্ম করতে গেল বৌটা। ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত।

হয়তো মাসিমাদের অনুমান ভুল। কিন্তু তাই যদি হবে তো প্রকাশ্য দিবালোকে কেউ কোনদিন মুরলীকে পুকুরে বা কুয়োতলায় নাইতে দেখেনি কেন?

॥ তিন ॥

কথা সাঙ্গ হলে মণ্টুদা হেসে বলেন, 'এটা কিন্তু গল্প নয়। গুল্প।'

তা শুনে শশধর তেড়ে আসেন—'কেন? এ রকম তো আজকাল হামেশা ঘটছে। এই তো সেদিন রাজশাহীর একটি কলেজ বয় অপারেশনের পর কলেজ গার্ল বনে যায়। তার পরে ওর এক সহপাঠীর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ে না, সাদী।'

'পয়েন্ট সেটা নয়।' তর্ক করেন মণ্টুদা। 'মুরলীকে নারী বানাবার জন্যে খোদার উপর খোদকারীর দরকার ছিল না। সে নারী হয়েই জন্মেছিল। নিরাপদে চলাফেরার জন্যে জীবিকার সন্ধানের জন্যে ওকে সাজতে হয়েছিল পুরুষ। এই তো সেদিন কাগজে পড়লুম কে একজন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় সারাজীবন পুরুষের দলে পুরুষরূপে খেলে গেল, ধরা পড়ল মৃত্যুর পরে সে নারী। হ্যাঁ, এ রকমও মাঝে মাঝে হয়।'

অনুপম তর্কে যোগ দেন। 'তাই যদি হয় এটা তবে গুল্প হতে যাবে কেন?'

'হবে এইজন্যে যে, নারীকে হাজার মোহনরূপে সাজালেও আর একটি নারী স্বামী ও সংসার ছেড়ে তার সঙ্গে ইলোপ করবে না।' মণ্টুদা সবজান্তার মতো বলেন।

তা শুনে বাণীদি ফোঁস করে ওঠেন। 'ইলোপ করা বলতে কী বোঝায়? আমি যদি আমার স্বামীর ওপর রাগ করে হাওড়া স্টেশনে যাই আর আপনি যদি আমাকে ফিরিয়ে আনতে আমার পিছু পিছু যান তা হলে সেটাও কি হবে ইলোপমেণ্ট?'

'হুঁ! পুরীর ধর্মশালায় একত্রবাস কিসের ইঙ্গিত!' মণ্টুদার শ্লেষ।

· মিসেস দত্ত জ্বলে ওঠেন।—'বাণী আর আমি যদি দার্জিলিং মেলে দার্জিলিং যাই আর একই বোর্ডিং হাউসে একই ঘরে সীট পাই তা হলে তুমি কি বলবে আমরা ইলোপ করেছি!'

মণ্টুদা সবিনয়ে বলেন, 'কিন্তু বৌদি, আপনি যে নিঃসন্দেহে নারী।'

দত্তসাহেব ফোড়ন দেন, 'কিন্তু আমি যদি বলি যে আমি নিঃসন্দেহ নই?'

সঙ্গে সঙ্গে বেধে যায় ফ্রী ফাইট। মারামারি নয়। চেঁচামেচি। কান্নাকাটি। মুরলী নারী না পুরুষ থেকে মণ্টুদা পুরুষ না নারী, বাণীদি নারী না পুরুষ ইত্যাদি বিষম বিষম প্রশ্ন। সকলেই সকলের দিকে সন্দেহের চোখে তাকান। দত্তসাহেব উস্কে দেন।

পরিস্থিতিটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে শিশিরদা শান্তিজল ছিটান। —'ভেবে দেখছি আমার ঠাকুমার কথাই ঠিক। মুরলী ছিল মহাভারতের বৃহন্নলা। যুগটা কিন্তু দ্বাপর নয়, কলি। তাই উত্তরা করল তার অনুসরণ। মনে রেখ, অর্জুন ছিলেন অজ্ঞাতবাস কালে উর্বশীর অভিশাপে পুরুষত্বহীন। ধর্মশালায় অজ্ঞাতবাসও তার আওতায় আসে। উত্তরা নিরাপদ।'

তখন আমাদের সকলের মুখে হাসি ফিরে আসে।

আমার ছোট মেয়ে তোতা আমাকে বকুনি দেয়। 'বাবা, তুমিও কি ওর মতো এক চোখ কানা? আরেক চোখে ছানি? এই ছাখ কেমন টেরাবাঁকা সেলাই করেছে। হা হা হা। এই জুতো পায়ে দিয়ে তুমি বেরোবে?'

বড় মেয়ে মিতা বলে, 'শুনবেন, জ্যাঠামশায়, বাবার কাণ্ড। নতুন জুতো কিনে দিলে বাবা তুলে রাখবেন, পরবেন না। ওই পুরানো জুতো আমরা কতবার ফেলে দিয়েছি। উনি কুড়িয়ে এনে পরবেন। মাহাঙ্গুকে দিয়ে সারাবেন। ওই তো কাজের ছিরি। ওই পুরানো জুতো সারাতে যত খরচা হয়েছে তা দিয়ে দু' জোড়া নতুন জুতো কেনা যায়।'

জ্যাঠামশায় অর্থাৎ আমার বন্ধু লেনিন হেসে বলেন, 'ওকে গান্ধীবাদে পেয়েছে। ওই বুর্জোয়া বিভ্রান্তি থেকে ওকে মুক্ত করতে না পারলে নতুন জুতো কি ও কোনো দিন পায়ে দেবে? নতুন সমাজও তেমনি আকাশে তোলা থাকবে। মাটিতে নামবে না। এই তালি দেওয়া সমাজের গায়ে তালির পর তালি পড়বে।'

তোতা-মিতার মা ততক্ষণ ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন। জুতোর দিকে নজর পড়ায় তিনি মুচকি হেসে বলেন, 'মাহাঙ্গুর কীর্তি জাদুঘরে রাখবার মতো। গৃহস্থের সংসারে মানায় না। জানেন, দিদি, মাহাঙ্গু হচ্ছে একটি হিন্দুস্থানী মুচি। এক চোখ কানা। আর এক চোখে ছানি। কাজ পায় না, উনিই যোগান। যোগাবেন কী করে, যদি পুরানো জুতো পায়ে না দেন, যদি সে জুতো সাতদিন অন্তর সারাতে না হয়। আর সব মুচি যার জন্যে আট আনা পায় মাহাঙ্গু পায় তার জন্যে এক টাকা। কারণ তার সময় লেগেছে দুগুণ। উনি বলেন, দোষটা তো ওর নয়। ও ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করেনি। কাজেই ওটা ওর নায্য পাওনা। আমি যদি বলি

যে ওটা আমাদের ন্যায্য দেনা নয় তা হলে উনি রাস্‌কিনের দোহাই দেবেন।'

'রাসকিন ওটা পান যীশুর কাছ থেকে। আর গান্ধীজী ওটা পান রাসকিনের কাছ থেকে। আর অনাদি ওটা পেয়েছে গান্ধীজীর কাছ থেকে। দু হাজার বছরের পুরানো মতবাদ। খাপ খাবে কেন নয়া দুনিয়ার গায়ে? বা পায়ে?' ক্রুপস্কায়া হেসে উড়িয়ে দেন।

আমি আপনভোলা অন্যমনস্ক মানুষ। লেখার কাজ নিয়ে যখন ব্যাপৃত থাকি তখন কেউ আমার ধ্যানভঙ্গ করলে আমি বিষম রাগ করি। রুইদাসরা—আমি ওদের মুচি বলিনে, ওটা অপমানকর—আমাকে জ্বালায়। কেবল একজন বাদে। সে ওই মাহাঙ্গু! আমি ঘরে বসে কাজ করছি, বারান্দা খালি, সে বারান্দায় পা দিতেও সাহস পায় না, পাছে আমার বাড়ী অশুচি হয়। যদিও আমি ওকে অভয় দিয়েছি যে আমরা কেউ জাত মানিনে তবু ও তো মানে। মানে বলেই গাছতলায় ওর ঝোলাটি কাঁধ থেকে নামায় ও কখন আমার সময় হবে তার জন্যে নীরবে অপেক্ষা করে। একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর এক সময় আমার কানে আসে। 'মাহাঙ্গু।'

'ওঃ! মাহাঙ্গু? আচ্ছা, হাম আতেহেঁ। বলে আমি আরো পাঁচ সাত মিনিট ওকে খাড়া রাখি। তারপর দু' তিন জোড়া জুতো বার করে দিই। পালিশের কাজ। দরকার হলে সারানোর কাজ। ফী বারেই ও একটা না একটা মেরামতির কাজ খুঁজে পাবেই। শুকতলা ক্ষয়ে গেছে। সেলাই খুলে গেছে। চামড়া ফেটে গেছে। এমনি সব বৈকল্য ওর কানা চোখে ধরা না পড়ুক ছানি-পড়া চোখ এড়ায় না। আমি বলি, আচ্ছা, বানাও। ও তখন অখণ্ড মনোযোগে বানায়। আমিও ফিরে এসে আমার বানানোর কাজে অখণ্ড মনোযোগ দিই।

আমারই মতো ওর কাঁচাপাকা চুল। তবে আমাকে ওর মতো সারাদিন কাজের ধান্দায় টহল দিয়ে ঘুরতে হয় না। সারা অঙ্গে খরা বর্ষা শীত পোহাতে হয় না। খাবার যথাকালে আমার মুখের

সামনে পৌঁছয়। আমার যা অভাব তা সময়ের অভাব। আর ও বেচারার সময় যেন ফুরোতেই চায় না। কাজ কোথায়? কে দিচ্ছে? দিলে তো তখুনি বিদায় দিয়ে দেবে। ধরিয়ে দেবে দু আনা কি চার আনা। তাতে কি অত বড়ো সংসারের পেট ভরে? আমার সঙ্গে ওর একটা অলিখিত বন্দোবস্ত। ও যত ইচ্ছা সময় নেবে। কাজ সারা হলেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাকে ডাকবে না। জানালা দিয়ে তাকালে পরে নজরে পড়বে কয়েক জোড়া জুতো বারান্দায় তোলা। একটি মানুষ গাছতলায় দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। নিচে মাটির উপরে পাতা একটা লোহার ফর্মা। চামড়া, পেরেক ইত্যাদি টুকিটাকি। কয়েক কৌটো বুট পুলিশ। একটা পুরানো ময়লা ঝোলা, মোটা ক্যানভাসের কি চটের।

'ক্যা মাহাঙ্গু? কাম খতম?' আমি বাইরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি।

'হুজুর।' বলে ও একটি শব্দে উত্তর দেয়।

আমি অত খুঁটিয়ে দেখি নে সেলাইটা সিধে না বাঁকা, শুকতলাটা পুরো মাপের না খাটো, তালিটা নতুন চামড়ার না পুরানো চামড়ার। আমার অত সময় কোথায়? আর মাহাঙ্গু লোকটা অক্ষম হতে পারে, অসাধু নয়। ওর যেটুকু বিদ্যে তাতে ওর চেয়ে ভালো আশা করা যায় না। ও তো শহরের বা কারখানার কারিগর নয়। বেহারের মুঙ্গের বা ভাগলপুরের দেহাতী চর্মকার। এখন নিবাস বোলপুর।

সময়ের দাম কাকে বলে ও জানে না। আমি জানি। তাই ওকে আমি আমার হিসাবমতো পারিশ্রমিক দিই। সেটা হয়তো অন্যের তুলনায় বেশী। কিন্তু এটাও কি ঠিক নয় যে ও আমাকে অবাধে লিখতে দিয়েছে, মাঝখানে ব্যাঘাত ঘটিয়ে আমার লেখা মাটি করেনি, যেটা কমবয়সী রুইদাসরা অবুঝের মতো করে। ওরা আসে ঘোড়ায় চড়ে। চড়াও হয় যখন তখন। আমি ওদের সাফ বলে দিই যে মাহাঙ্গু থাকতে আর কেউ আমার পছন্দ নয়।

মাহাঙ্গুকে ওরা দেখতে পারে না। ওর বিরুদ্ধে যা তা বলে। আমি ভাগিয়ে দিই।

কিন্তু ছিল এর পেছনে আরও একটা কথা। সেটা একটা তত্ত্ব। আমি বিশ্বাস করি যে মাহাঙ্গুর জীবনই আদর্শ জীবন। ও কাউকে শোষণ করে না। কারো কাছে বিবেক বাঁধা দেয় না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন আনে দিন খায়। কাল কী খাবে তা চিন্তা করে না। যীশুখ্রীস্ট যেমনটি চেয়েছিলেন। আর গান্ধীজী যেমনটি চান। যীশু যাদের বলেছেন সব শেষের জন মাহাঙ্গু হচ্ছে তাদেরই একজন। তারা কাজ করতে চাইলেও কাজ পায় না, পায় বেলাশেষে। তবু তারাও পাবে সকলের সমান মজুরি। দৈনিক আয় হবে সকলের সমান। কেউ যদি কানা হয়ে থাকে বসে থাকাটা তার ইচ্ছার অভাব নয়, তার ক্ষমতার অভাব। তার দরুন তার রোজগারের কমতি যেন না হয়। দিনের শেষে যেন হয় সব শ্রমিকের সারাদিনের রোজগারের সমান।

রাসকিনের 'আনটু দিস লাস্ট' পড়ে গান্ধীজীর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি তার অনুবাদের নাম রাখেন 'সর্বোদয়'। তা না রেখে রাখা উচিত ছিল 'সব শেষের জন'। কেননা জোর দেওয়া হচ্ছে সমাজের দুর্বলতম অংশের উপরে, যার মেহনত করতে রাজী অথচ মেহনতের সুযোগ যাদের কম কিংবা তার বিনিময়ে প্রাপ্তি যাদের যথেষ্ট নয়। মাহাঙ্গু একটা প্রতীক। কিংবা একজন প্রতিনিধি। আমি চেষ্টা করছি ওকে অন্যান্য রুইদাসের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাতে। নইলে ও হেরে যাবে। না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

আমার কৈফিয়ত শুনে বৌদি বলেন, 'এটা কিন্তু ঠিক নয় যে মাহাঙ্গু সেলাই টেরাবাঁকা করেও সমান মজুরি পাবে। আজকাল এমন মিস্ত্রী তুমি ক'জন পাবে যে ইচ্ছে করে কামাই করে না, দেরিতে আসে না, ফাঁকি দেয় না? অক্ষম বলে মাহাঙ্গুকে তুমি ছাড় দিতে পারো কিন্তু ফাঁকিবাজরাও অক্ষম বলে তোমার দাক্ষিণ্যের সুযোগ নেবে, অনাদি। মাহাঙ্গুকে তুমি বাঁচাতে চাও বাঁচাও। কিন্তু

ওটা তোমার ব্যক্তিগত নীতি। সমষ্টিগত নীতি অত নরম হলে চলবে না।'

দাদা তার লেনিন-মার্কা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'হিন্দু সমাজ যাদের পায়ের তলায় রেখেছে আর বুর্জোয়া শ্রেণী যাদের রক্ত চুষে ফুলছে তাদের সমস্যা কি ওভাবে মিটতে পারে কখনো? করুণাসাগর বিদ্যাসাগর হয়ে তুমি কয়েকজনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারো। কিন্তু কয়েক কোটিকে বাঁচাতে পারবে কী করে? আর সেই কয়েকজনকেই বা সমাজে তুলতে পারবে কি শুধু হরিজন আখ্যা দিয়ে? চেয়ে দ্যাখ সাঁওতালদেরও কর্মাভাব ও অন্নাভাব কিন্তু হিন্দু সমাজের নিচের তলা না হয়ে ওরা ওদের সমাজেরই একমাত্র তলা। তাই আর কারো কাছে ওদের মাথা হেঁট নয়। ওই যে সাঁওতাল মেঝেন তোমাদের রান্নাঘরেও ঢোকে ও যদি মাহাঙ্গুর বৌ হতো তাহলে কি ওর অত সাহস হতো?'

মাহাঙ্গু তখনো বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। আমি ওকে ডেকে বলি, 'সিলহাই সিধা নেহি হুয়া। খোলকে ফির ভি বনাও।'

আমার হিন্দী শুনে সবাই হেসে ওঠে। মাহাঙ্গুর মাথা আরো হেঁট হয়। ও যে ঠিকমতো সেলাই করতেও পারে না এটা ওর পক্ষে লজ্জার কথা।

আমি আমার ছেলেবেলায় ফিরে যাই। তখনকার দিনে আমাদের শহরের মুচিরাই আমাদের জুতোর মাপ নিয়ে যেত আর তাই দেখে নতুন জুতো বানিয়ে দিত। খুব যে আরাম হতো পরে তা নয় তবু জিনিসটা খাঁটি স্বদেশী বলে বাবার কাছে পেতো সমাদর। কারো কারো মতে প্রশ্রয়। পরে অবশ্য চীনাবাড়ির তৈরি জুতোও পরেছি। খুব আরামের। কিন্তু ইদানীং কারখানায় তৈরি জুতোই পরি। দুঃখ হয় এ কথা ভেবে যে দেশের কারিগর শ্রেণীটাই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শুধু মেরামতি করেই তো কারিগর হওয়া যায় না। কিংবা শুধু জুতো পালিশ করে। কারিগরকে শ্রমিক বানিয়ে কি উন্নতি হয় না অবনতি? ঘোড়া পিটিয়ে গাধা?

আমাদের দুই বন্ধুর চিন্তা একদা একই খাতে বইত। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে বরেনদা ঝুঁকেছেন শিল্পবিপ্লবের দিকে, পরের ধাপ সমাজবিপ্লবের দিকে। আর নিভাদিকেও ভজিয়েছেন যে রুশদেশে টলস্টয় যা পারলেন না লেনিন তা পারলেন। অতএব ভারতকেও টলস্টয় মার্গ বা গান্ধী মার্গ ত্যাগ করে লেনিন মার্গ বরণ করতে হবে। তবে ওরা কেউ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেননি। ওঁরা যে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের যোদ্ধা। অযোদ্ধাদের সঙ্গে ওদের মিলতে বাধা। এখনো ওঁরা জবাহরলালের সঙ্গেই আছেন। একদিন ওঁকেও লাল করবেন এই আশায়।

'আমি করুণাসাগরও নই, বিদ্যাসাগরও নই, তবে আমি নিজে একজন কারিগর বলে কারিগর শ্রেণীটাকে ভালোবাসি। তাই শিল্পবিপ্লবকে মনে করি পরধর্ম। আর সমাজবিপ্লবকে ভয়াবহ। তোমার সঙ্গে মিল হবে কী করে, বরেনদা? আমরা যে দিন দিন দূরে চলে যাচ্ছি পরস্পরের কাছ থেকে।' আমি আক্ষেপ করি।

'তুমি যদি শিল্পবিপ্লব রুখতে না পেরে থাক তবে সমাজবিপ্লবকেও রুখতে পারবে না, অনাদি। এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে? তোমার ওই মাহাঙ্গুরের জন্যে আমার মাথায় অন্য পরিকল্পনা আছে। ওকে আর ওর মতো সবাইকে রিক্রুট করে আমরা একটা লেবার আর্মি গঠন করব। তেমনি চাষীদের নিয়ে একটা ল্যাণ্ড আর্মি। দেশে সবশুদ্ধ তিনটে আর্মি থাকবে। একটা তো সৈনিকদের আর্মি। আর একটা শ্রমিকদের। আরও একটা কৃষকদের। কোনোটাতেই জাতপাত মানা হবে না। কে যে বামুন কে যে মেথর তা চেনবার উপায় থাকবে না। ইউনিফর্মের আড়ালে পৈতে রাখলেও রাখতে পারো, টুপির আড়ালে টিকি। কিন্তু সবাইকে সব কাজে হাত লাগাতে হবে, যখন যেটা দরকার। শুচি অশুচির প্রশ্ন তুললেই জেল। জেলে গেলে সকলেই সমান। কয়েদীর পোশাক পরে মেথরের কাজও করতে হবে বামুনের ছেলেকে। আর রান্নার ভার থাকবে মুসলমানের উপরে। পরিবেশনের ভার খ্রীস্টানদের উপরে। অনশন করলে

সেটাও হবে একটা অপরাধ। সকলে যা খাবে তুমিও তাই খাবে। তবে গোরু শুওরের বাছবিচার থাকবে। কিন্তু ওটাও যুদ্ধকালে নয়। যুদ্ধে বার বার হেরে ওটুকু যদি আমরা শিখে না থাকি তো আবার পরাধীন হব। যে এতে বাধা দেবে তাকে কোর্ট মার্শাল করে বিশ্বাসঘাতকের যে শাস্তি সেই শাস্তি দেওয়া হবে। হাসছ যে?' দাদা বৌদিকে শাসান।

'যুদ্ধকালেও আমি গোমাংস খাব না, তোমার জন্যে রাঁধতেও পারব না, কমরেড। আমার কপালে আছে ফায়ারিং স্কোয়াড। আর তোমার কপালে বিপত্নীক দশা। সাময়িকভাবে অবশ্য।' বৌদি তামাশা করেন।

ওদিকে মাহাঙ্গুর উপর কড়া নজর রেখেছিল তোতা। সে এসে খবর দেয় যে সেলাই এইবার সিধে হয়েছে। আমি যাই, ওর পাওনা চুকিয়ে দিই। দুবার সেলাই করেছে বলে ও কিছু উপরি প্রত্যাশা করেছিল। দোষটা তো ওর নয়, চোখের। আমি ওর প্রত্যাশা পূরণ করি। ও সেলাম ঠুকে ঝোলাটি কাঁধে তুলে নেয়।

উপরি পাওনার খবরটা জানাজানি হয়ে যায়। মিতা বলে 'আমি জানতুম। ভুল করলেও মজুরি কাটা যায় না, বরং মজুরি বাড়িয়ে নেওয়া যায়। বাবা, এখন থেকে তুমি এসব মার হাতে ছেড়ে দাও। মারও দয়ার শরীর কিন্তু মা তোমার মতো নরম নন। চ্যারিটি করতে চাও চ্যারিটি করো। বলো, আমি দান করলুম। কিন্তু তা তো নয়, এটা হলো দেনাপাওনার ব্যাপার।'

'আমার আপত্তি ছিল। কিন্তু শুনছে কে? সকলের মুখেই এক কথা। কাজটা যেমন হবে মজুরিটাও তেমনি হবে। ভুল কাজের জন্য খেসারত দেবে যে ভুল করেছে সে। উল্টে আমি যদি দিই তবে ওর শিক্ষা হবে কী করে? ও সাবধান হবে কেন?

'আমার লেবার আর্মিতে আমি কড়া হব। নরম হব না।' বরেনদা বলেন। দৃষ্টিক্ষীণতার দরুন মহাঙ্গুকে মোটা কাজ দেওয়া হবে। সূক্ষ্ম কাজ না। কিন্তু কাজ অনুসারেই পাওনা। শ্রমিকদের দিতে

হবে ফ্রুট অব লেবার। তার কমও না, তার বেশীও না। ধনিকরা কম দেয়, সেইজন্যে ধনতন্ত্র খারাপ। কিন্তু ধার্মিকরা যদি বেশী দেয় তবে ধর্মতন্ত্রও কি ভালো? কর্ম অনুসারে ফল কর্মফল। এইটেই শাশ্বত নীতি। এই নীতি কোনো পক্ষই লঙ্ঘন করতে পারবে না।'

'শ্রমিক যদি অন্ধ হয়, অক্ষম হয় তাহলেও না?' আমি আপত্তি জানাই।

'আহা, শোন সবটা।' বরেনদা দাড়িতে হাত বুলোন। 'কর্ম অনুসারে ফল মেনে নিলেও একটা ন্যূনতম মজুরি থাকবে। তার সঙ্গে মিলিয়ে একটা ন্যূনতম খাটুনিও। আলসেমি আমি বরদাস্ত করব না। তোমাকে ডাকবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানবে এটা খাটুনির মধ্যেও পড়ে না অবসরের মধ্যেও না। এটা হচ্ছে আশকারা। চাই ডিসিপ্লিন।'

'ডিসিপ্লিন শুনে আমি শিউরে উঠি। 'তোমরা কি ইন্টেলেকচুয়ালদেরও ডিসিপ্লিন শেখাবে?'

'আলবৎ। তোমাকে আর তোমার মতো সাহিত্যিকদেরও।' বরেনদা হাসেন। 'তবে তোমাদের নিয়ে আরও একটা আর্মি গঠন করা হবে না। তাহলে তো সব ক'টাতেই কোর্ট মার্শাল করতে হয়। তোমাদের নিয়ে রাইটার্স ইউনিয়ন।'

'তার চেয়ে', আমি মিতার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলি, 'ফায়ারিং স্কোয়াডই শ্রেয়।'

'না, শ্রেয় নয়।' তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, 'তুমি লিখতেই ভুলে যাবে। পাস্টেরনাকের মতো।'

এর পরে আমার বিদেশযাত্রা। সে সময় যে নতুন জুতো কেনা হয় সে জুতো পুরানো হতে বেশ কয়েক বছর লাগে। আগেকার পুরানো জুতো আমার মাসেকের অনুপস্থিতিতে কী জানি কেমন করে হাওয়া হয়ে যায়।

বেচারা মাহাঙ্গু! পুরানো জুতো না থাকলে বা নতুন জুতো পুরানো না হলে তো মেরামতির প্রশ্নই ওঠে না। কী নিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাবে? ভুল করারই বা উপলক্ষ কোথায়? নতুন জুতোয় কালি লাগায়, তাও আমারই দেওয়া কালি। বুরুষ করে, তাও আমারই দেওয়া বুরুষ। তার রোজগার আর পাঁচজনের চেয়ে কম নয়, বরং বেশি। কিন্তু কতটুকু বেশি? চার আনার জায়গায় আট আনা। এক টাকা দু টাকা তো নয়। পুরানো জুতোই ছিল লক্ষ্মী। পুরানোর উপর নতুন তালি লাগিয়েই ওর নবান্ন।

রোজগার বাড়ানোর জন্যে রোজ রোজ আসাও আমি পছন্দ করিনে। ওতে আমার কাজের ব্যাঘাত ঘটে। আমিও তো একজন কর্মী। হপ্তায় একবার কি দু বার আসতে বলি। পরে একদিন লক্ষ করি যে তার আর তেমন চাড় নেই। সে কখনো আসে, কখনো কামাই করে, কখনো নিঃশব্দে চলে যায়। যা পায় তার জন্যে অতদূর আসা বা অতক্ষণ থাকা বোধহয় পোষায় না। বিশেষত খরা বর্ষায়।

মাহাঙ্গুর কি অসুখ করেছে, অনেক দিন ওকে দেখিনি। ভজুয়া রুইদাসের মুখে শুনি মাহাঙ্গু আজকাল বোলপুরের আশে পাশে যা পায় তাই দিয়ে দিন গুজরান করে। কমজোরী আদমী। তাকত নেই। মাথা ঘোরে। ইচ্ছা করে ওকে ডেকে পাঠাতে। কিন্তু কোথায় সেসব পুরানো জুতো! আমার হারানিধি! নতুনের তো পুরানো হতে ঢের দেরি। অসময়ে ওর হাতে পড়লে ও ফুঁড়ে ফুঁড়ে নষ্ট করবে।

মাহাঙ্গুর কথা একরকম ভুলেই গেছি। সব শেষের জন বলতে ওই একজনই ছিল আমার সামনে। ওর চেয়ে অক্ষম, ওর চেয়ে অবনমিত, ওর চেয়ে শোষিত মানুষ শত শত আছে কিন্তু একই সঙ্গে অক্ষম তথা অবনমিত তথা শোষিত একটি মানুষকে প্রত্যক্ষ করলে তো বলব, এই আমার সব শেষের জন। তাছাড়া আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই অপরাজিত মানুষ, যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খায়।

কারো কাছে হাত পাতে না। আমার কাছে যা পেত তা ওর মেহনতের ফল। আমার দাক্ষিণ্য নয়। লোভ আমি ওর মধ্যে লক্ষ করিনি। আর আলস্য ? না, আলস্যও নয়। আমাকে বিরক্ত করতে চায় না বলেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মিলটনের উক্তি—"He also serves who stands and waits."

আমাদের পাড়ার বৈজু মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠালেও আসে না। গেট ভাঙা পড়ে রয়েছে। বাগানে গরু ছাগল ঢুকছে। হঠাৎ মিস্ত্রীর দর্শন পেয়ে আমি মন্তব্য করি, 'পূবের সূর্য আজ পশ্চিমে উদয় যে !'

সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'সত্যানাশ হয়ে গেছে হুজুর।'

'কার সত্যানাশ ? তোমার ?' আমি তো হাঁ।

'না, মালিক, আমার নয়। আমার আপনার জেলার ভাই বেরাদরের সত্যানাশ। এখন ওরা খাবে কী ? কেমন করে ওদের পেট চলবে ? সব কটাই তো নাবালোগ। ওই একজনই ছিল রোজগেরে মরদ। জনানালোগ কি ঘর ছেড়ে বেরোতে পারে ? হুজুর ওকে অনুগ্রহ করতেন। এই বিপদে হুজুরই ভরসা।' বৈজু আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে।

'কার কথা বলছ, মিস্ত্রী ?' আমি উদ্বেগে অস্থির।

'কেন, মাহাঙ্গুর। ও হো হো হো। বলা যায় না, হুজুর। বলা যায় না। চোখেও দেখা যায় না। এইমাত্র আমি ওর লাশ দেখে আসছি। চাপা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে কী যে করে রেখে গেছে মোটর লরি ! ও কি মাহাঙ্গু ? মাহাঙ্গু বলে কি চেনা যায় ? পুলিস এসে তদন্ত করছে। নিয়ে যাবে লাশ কাটা ঘরে। আহা রে, বেচারা ! অমন সাচ্চা আদমি আমি দেখিনি, মালিক। ওর কপালে এই ছিল !' মিস্ত্রী আমার পা জড়িয়ে ধরে।

'তা কী করে ঘটনাটা ঘটল ?' আমি সামলে নিয়ে শুধাই।

'হুজুরকে বলতে শরম লাগে। বেশি নয়, মাহাঙ্গু একটু-আধটু শরাব পিত। বেশি নয়, রোজ দশ আনার। কাল ছিল ঝড়-বৃষ্টি

অন্ধকার। কানা মানুষ টলতে টলতে বাড়ি ফিরছিল। নেশার ঘোরে বেহুঁশ। হঠাৎ মোটর লরির সঙ্গে মুখোমুখি। লরির সামনের বাতী দুটো চোখ ধাঁধিয়ে দিল। অন্ধো লোকটা দুই বাহু তুলে হুঙ্কার ছেড়ে লরির দিকেই এগিয়ে গেল। হাঁ হাঁ করে ছুটে এল যাদের একটু হুঁশ ছিল। ওকে টেনে সরিয়ে নেবার আগেই যা হবার তা হয়ে গেছে। ডেরাইভার শালা গাড়ী নিয়ে উধাও। নম্বরটাও কেউ টুকে নেয়নি। ও রাস্তা দিয়ে তো কাঁহা কাঁহা মুলুকের লরি যাওয়া আশা করে। কে জানে কার লরি!' সে এক নিশ্বাসে বলে যায় আর চোখের জল মোছে।

আমার মুখ দিয়ে কথা সরে না। আমি যেন পাথর হয়ে গেছি। এর কি কোনো প্রতিকার আছে? এই অন্যায়ের? ড্রাইভারটাকে ধরতে পারলে বছর দুয়েকের মতো ফাটক। কিন্তু মাহাঙ্গু তো আর প্রাণ ফিরে পাবে না। হায়, হায়, কেন এমন হলো!

'হুজুর তো জজ ছিলেন। হুজুর এক লাইন লিখে দিলেই কাজ হবে। পুলিস ও শালাকে পাকড়িয়ে এনে হাজতে পুরবে। নয়তো আমরাই পাকড়াব আর বদলা নেব। আমরা এখন আজাদী পেয়ে গেছি। আমরাই ওকে ফাঁসিতে লটকাব।' সে রাগে গজরাতে থাকে। মাহাঙ্গুরই সমবয়সী। তেমনি কাঁচাপাকা চুল। কিন্তু বলিষ্ঠ পুরুষ।

আমি ওকে ঠাণ্ডা করি। আশ্বাস দিই যে পুলিস নিশ্চয়ই লোকটাকে পাকড়াবে ও হাকিম নিশ্চয়ই জেলে পাঠাবেন।

'কেন, হুজুর? ফাঁসি হবে না কেন? মানুষ মারবে, নিজে মরবে না? তা হলে বলেছে কেন, যেমন কর্ম তেমনি ফল?' সে জবর প্রশ্ন করে।

আমি এখন এর কী জবাব দিই। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর শুধাই, 'আচ্ছা, বৈজু, দশ আনার মাল টেনে কি অত নেশা হয়? তুমি ঠিক জানো দশ আনা?'

'ঠিক জানি, হুজুর। ও খুব হিসাবী আদমি ছিল। একটুকুও

এদিক ওদিক হতো না। দেশী মালে নেশা বেশী হুজুর।' সে সবজানতার মতো বলে।

আমার মাথায় তখন ঘুরছে, মাহাঙ্গু যে রোজ দশ আনা খরচ করত তার কী পরিমাণ আমার দেওয়া মজুরি? মদ খেয়ে ওড়াবে জানলে কি আমি অমন মুক্তহস্ত হতুম? হয়ে কি ওর ভালো করেছি? আবার ভাবি, ওড়াবে না-ই বা কেন, যদি হকের পাওনা হয়ে থাকে? আমি বিচার করবার কে? জজ হয়েছি বলে কি পাপপুণ্যের জজ হয়েছি?

ওর আত্মার সদ্‌গতি হোক। এপারের পাপ এপারেই পড়ে থাক। এপারের পুণ্য ওপারের সাথী হোক। আমি মনে মনে প্রার্থনা করি।

মাঝে মাঝে ভাবি মাহাঙ্গুর কথা। পরনে খাটো ধুতি, খাটো কুর্তা। তার উপর একটা চাদর জড়ানো। মুখে বসন্তের দাগ। একটা চোখ বোধহয় গেছে মায়ের কৃপায়। বসন্তকে গ্রামের লোক বলে মায়ের কৃপা। মা শীতলার। মাহাঙ্গু তার হ্যাণ্ডিক্যাপ নিয়ে লড়াই করে গেছে আজীবন। এমন যোদ্ধা কজন আছে যাদের পানদোষ নেই? সেইজন্যেই তার প্রাণ যাবে এটা কিন্তু আমি মেনে নিতে পারিনে। কী নিষ্ঠুর নিয়তি!

বিনা প্রেমসে না মিলে

এটা বরযাত্রীদের ডেরা। বিয়ে হয়ে গেছে। বাসি বিয়ের দিন বাসায় একা শুয়ে শুয়ে শান্তিনিকেতনের কথা ভাবছি। বৌভাত সেখানেই হবে। এমন সময় তাঁর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। দেখে চমকে উঠি। আমার ছেলেবেলার হেডমাস্টারমশায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

অবনত হয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করি। সত্যি, এমন মানুষ আর হয় না। নিমন্ত্রণলিপি পাঠানো হয়নি। থাকেন কোন্ সুদূর পল্লীগ্রামে। চিকিৎসার জন্যে মাঝে মাঝে কলকাতা আসেন। কিন্তু আমি তো কলকাতা থেকে দূরে। দেখাসাক্ষাৎ হয় না। ছেলেবেলায় যেমনটি দেখেছি তেমনি ছিপছিপে গড়ন, তেমনি দীর্ঘ সরলরেখা, চলা-ফেরায় তেমনি ফরফরে ভাব। চুলে অবশ্য রুপোর ছোঁয়া লেগেছে, তবে বয়সের অনুপাতে কিছু নয়। গত বিশ বছরের মধ্যে মাত্র একবার দর্শন দিয়েছিলেন, সেও এই কলকাতায়। সেবার তিনি ও আমি সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তাঁরও সময় ছিল না, আমারও না, সেইজন্যে একটা কথা অব্যক্ত রয়ে গেল। স্বর্গে যাবার আগে বাবা তাঁকে আমার সম্বন্ধে ও আমাকে জানাবার জন্যে কী বলেছিলেন। চিঠিপত্রে ঠিকমতো বোঝানো যায় না। সুদিনের অপেক্ষায় ওটা তিনি মনের শিকেয় তুলে রেখে দেন।

নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গেছি বলে বার বার করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করি। বলি, 'স্যার যদি একটা দিন আগে আসতেন তা হলে স্যারকে ধরে নিয়ে গিয়ে বরকর্তার আসনে বসিয়ে দেওয়া যেত। স্যার থাকতে আমার কি ওটা মানায়?' আক্ষেপ করি আমি।

'খবরটা তো সবে আজ সকালে পাই। পুঁটুদের ওখানে। তাছাড়া এই তিয়াত্তর বছর বয়সে ও সব নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার

সাধ্যে কুলোয় না। জানো তো আমি চিরকালই একাহারী। রাত্রে শুধু খইদুধ খাই।' তিনি সহাস্যে বলেন।

মনে ছিল আমাদের উনি শিক্ষা দিয়েছিলেন জীবনযাত্রা সরল ও সাদাসিধে করতে। আমরা খালি পায়ে স্কুলে যেতুম। জামার দরকার কী, ধুতির উপর চাদরই যথেষ্ট। তাও যদি না জোটে তা হলে ধুতির একপ্রান্ত চাদরের মতো জড়ালেও চলবে। তিনিও তাই করতেন। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়। তবে স্কুলটা তো তাঁর নয়। যাঁদের স্কুল তাঁরা অতটা আটপৌরে হতে বারণ করে থাকবেন। কে জানে কখন ইনস্পেকটার সাহেব এসে পড়েন। আমরাও সেই ভয়ে একে একে জামা জুতো পরি। একসপেরিমেণ্টটা যুদ্ধের সময় বছর কয়েক চলেছিল। তাতে আমাদের অভিভাবকদের খরচ বেঁচেছিল। হেডমাস্টারের উপর তাঁরা খুশি।

আমার মনে স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন করেন আমার বাবা। চারাগাছে জল সেচন করেন হেডমাস্টারমশায়। কিন্তু বয়স যতই বাড়ে ততই আমি এঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাই। আমার কথা-বার্তা শুনে কার্যকলাপ দেখে এঁরা আমার ভবিষ্যতের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। স্কুলের পর কলেজের ছ' বছর আমি অন্যত্র পড়াশুনা করি। ছুটিতে বাড়ি আসি। বাবার মনের নাগাল পাইনে। মাস্টার-মশায়কে জিজ্ঞাসা করি, বাবা কী ভাবছেন। তাঁর মুখেই শুনি। তিনিও জানতে চান আমি কী ভাবছি। তাঁকে জানাই। তাঁর মারফত বাবাকে। তিনি আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ বেড়াতে যান। বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বাবা জিজ্ঞাসা করেন, হেমেন-বাবু, আপনার শিষ্যকে কেমন দেখছেন? ও কি শেষকালে আর একটা কালাপাহাড় হবে?' মাস্টারমশায় বলেন, 'হ্যাঁ, আইকোনো-ক্লাস্ট। তবে তলোয়ারের জোরে নয়, কলমের জোরে। আপনি ভাববেন না চন্দ্রবাবু, চারু কেবল ভাঙতে নয়, গড়তেও চায়। গড়তে চায় বলেই ভাঙতে চায়। কালাপাহাড় কি গড়ার জন্যে ভাঙত? না ভাঙার জন্যে ভাঙত?'

কলেজে গিয়ে আমি টুর্গেনেভের 'ফাদারস অ্যাণ্ড সান্‌স' পড়ি। হয়ে উঠি আর একটি বাজারভ। তবে ঠিক নাইহিলিস্ট নয়। অ্যানারকিস্ট। শব্দটার অপব্যবহার হয়েছে। বোমার সঙ্গে রিভলভারের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তরুণ যখন অধৈর্য হয় তখন যে-কোনো উপায়কেই মনে করে ফেয়ার মীনস। তা যদি হয় তবে আনফেয়ার মীন্‌স বলে কিছু থাকে না। না, আনফেয়ার মীনস আমি সমর্থন করিনে। তার বেলা আমি বাপকা বেটা। মাস্টারমশায়কে, তাঁর মারফত বাবাকে, অভয় দিই যে অন্যায় উপায়ে আমি কোনো প্রকার ওলটপালট ঘটাব না। না সমাজের, না রাষ্ট্রের, না ধর্মের, না নীতির। তা বলে নিষ্ক্রিয়ও থাকব না।

এক এক সময় আমার মনে হতো যে বাজারভের মতোই আমার অকালমৃত্যু হবে। কিছুই করে যেতে, কিছুই দেখে যেতে পারব না। ব্যর্থ, পরাজিত গৃহপ্রত্যাগত পুত্র। আমার পিতার নীড়ই আমার শেষ আশ্রয়। প্রিয়া আমাকে ধরা দেবে না, বন্ধুরা যে যার পথ ধরবে, আপনার বলতে আমার আর কে থাকবে! ওই নিষ্ঠাবান প্রৌঢ় বৈষ্ণব। একদিন ওঁরই কোলে মাথা রেখে আমাকে বলতে হবে, 'বাবা, আমি হেরে গেছি। আমি আর বাঁচতে চাইনে।' তখন আর মাস্টারমশায়ের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হবে না। পিতা-পুত্রের মিলন হবে। কিন্তু সে মিলন বিয়োগান্ত।

মা আমার মতিগতি জানতেন, তাই নোটিশ দিয়ে রেখেছিলেন যে আমি কলেজে পড়তে গেলে তিনিও আমার সঙ্গে যাবেন ও কলেজের কাছেই আমাকে নিয়ে বাসা করে থাকবেন। কিন্তু আমার ম্যাট্রিকের পরেই তিনি স্বর্গে চলে যান। আমার তো মনে হলো তিনি আমাকে মুক্ত করে দিয়ে গেলেন। নইলে মাতৃস্নেহের উৎপাত থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারত না। পিতৃস্নেহ সেদিক থেকে উদার। আমি যে আর-একটা কালাপাহাড় হতে চলেছি এতে তিনি দুঃখিত। কিন্তু বাধা দিতে অনিচ্ছুক। কখনো তিনি বলতেন না যে তাঁর মতটাই মেনে নিতে হবে। তর্কের গন্ধ পেলেই তখনকার

মতো চেপে যেতেন। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণের সময় দেখা হলে তাঁর সঙ্গে নিতেন। আমার কথাটা তাঁকে শোনাতেন। নিজের কথাটাও। তাঁকেই বলতেন আমাকে একটু বোঝাতে। তা শুনে আমিও মাস্টারমশায়কে বলতুম বাবাকে একটু বোঝাতে। বোঝা-পাড়া যা হবার সেইভাবেই হতো। নয়তো নয়।

মাস্টারমশায় আমাকে জানাতেন যে আমার কেরিয়ার নিয়ে আমার বাবা আমাকে একটি কথাও বলবেন না। আমি আমার ইচ্ছামতো কেরিয়ার বেছে নেব ও ভুল করলে পস্তাব। তবে আমি যদি পরের চাকর হই তা হলে তিনি মনে কষ্ট পাবেন। উপার্জন যতই সামান্য হোক না কেন স্বাধীন জীবিকাই শ্রেয়। উপার্জন যত বেশীই হোক না কেন পরাধীন জীবিকা হেয়।

আমি বলতুম, 'মতভেদ তো তা নিয়ে নয়, স্যার। বাবাকে আমরা যখনি প্রণাম করি তিনি মালাঝুলিতে হাত গলিয়ে মালা গড়াতে গড়াতে আশীর্বাদ করেন, কৃষ্ণে মতি হোক। আমি ঈশ্বর মানি বলে যে অবতার মানি তা নয়। কেন উনি সোজাসুজি বলেন না যে ঈশ্বরে মতি হোক। মা যেমন বলতেন, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। আমি উপনিষদ পড়ি। তাতে কৃষ্ণ কোথায়? সে যুগে যদি জন্ম নিতুম ঋষিরা কি আশীর্বাদ করতেন, কৃষ্ণে মতি হোক? আমি এখন মনে মনে ব্রাহ্ম হয়ে গেছি, মাস্টার-মশায়। মুসলমানদের সঙ্গে খ্রীস্টানদের সঙ্গে মিল কোথায়, অমিল কেন, এসব চিন্তা করছি। অবতারবাদ নয়, একেশ্বরবাদই আমাদের মেলাবে। কিন্তু বৌদ্ধদের তো একেশ্বরবাদী বলতে পারিনে। ওরা ঈশ্বরবাদীই নয়। বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলাও তো অবতারবাদ। যারা বিষ্ণুই মানে না, তারা কেন স্বীকার করবে যে বুদ্ধ ছিলেন বিষ্ণুর অবতার? তা সত্ত্বেও দেখি বেশ কিছু মিল রয়েছে।'

'তা তো থাকবেই,' তিনি বলতেন, 'চারশো বছর আগেও বাংলাদেশের বহু কায়স্থ পরিবার বৌদ্ধশাস্ত্র ঘরে রাখত। এখনো কায়স্থদের বংশপদবীতে তার রেশ রয়ে গেছে। মাইকেল মধুসূদন

যেমন খ্রীস্টান হয়েও 'দত্তকুলোদ্‌ভব' রাধাকান্ত, কালীপদ, ভূতনাথও তেমনি শাক্ত বা বৈষ্ণব বা শৈব হয়েও ঘোষ বা মিত্র বা পাল বা সেন বা পালিত বা রক্ষিত বা ধর কুলোদ্‌ভব। আর এটা শুধু কায়স্থদের বেলা নয়, বৈদ্য ও নবশাখদের বেলাও লক্ষ করবে। শীল পদবী তুমি উত্তরভারতে পাবে না, পাবে বৌদ্ধগ্রন্থে। সেখানে সেটা পদবী নয়, নামের শেষভাগ। পাল পদবী তুমি বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও দেখবে। যেটা ছিল নামের শেষভাগ সেটাই এখন পদবী। বাঙালীরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ খ্রীস্টান হয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ কুলোদ্‌ভব। তাই বৌদ্ধদের সঙ্গে এত মিল।' মাস্টারমশায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্মিতহাসির সঙ্গে বলতেন।

তাঁর মুখেই শুনতুম একটি সংস্কৃত শ্লোক। তার একাংশ মনে আছে। 'অন্তঃশৈবঃ বহিঃশাক্তঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ।' ভিতরে শৈব, বাইরে শাক্ত, সভায় বৈষ্ণব। বাঙালী জাতি এইভাবেই একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মুসলমানদের বেলা ব্যর্থ হলো। জাতি তখন থেকেই দু'ভাগ। ইতিহাসে দু'ভাগ হলে ভূগোলেও দু'ভাগ হতে হয়। এটা অবশ্য তাঁর উক্তি নয়, আমারই সিদ্ধান্ত। তৎকালীন নয়, পরবর্তীকালীন।

'এখন ফিরে চল তোমার মূল প্রশ্নে। কৃষ্ণে মতি কেন? ঈশ্বরে মতি কেন নয়?' এর উত্তর তোমাদের রবি ঠাকুরই দিয়ে রেখেছেন। 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে মানুষ তার প্রিয় করবে কী করে? তাই তাঁকে সাকার ও সগুণ করতে হয়। প্রথমে চতুর্ভুজ, পরে মানুষ। অন্যদিক থেকেও দেখা যায়। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। কে না তাঁকে ভালোবাসত! যিনি সকলের প্রিয় তিনিই সকলের দেবতা। যেই কৃষ্ণ সেই বিষ্ণু। যেই বিষ্ণু সেই ভগবান। অতএব যেই কৃষ্ণ সেই ভগবান। এ যুক্তি যদি মেনে নাও, এটা যদি বিশ্বাস কর তবে কৃষ্ণে মতি মানে ভগবানে মতি।'

বাবার সঙ্গে আমার মতবিরোধ কেবল এই একটা মূল প্রশ্ন নিয়ে

নয়। সাত্ত্বিক আর রাজসিক আহার ও জীবনধারা নিয়েও দু'জনার দুই মত। আমিষ বলে তিনি শুধু মাছ মাংস নয়, পেঁয়াজ, রসুন, মুসুরের ডাল ইত্যাদি কত রকম খাদ্য বর্জন করেছিলেন। বিধবাদের জন্যে যে বিধান বৈষ্ণবদের জন্যেও সেই বিধান। তার সঙ্গে যদি ব্রহ্মচর্যকেও জুড়ে দেওয়া হয় তবে বিধবায় আর বৈষ্ণবে তফাতটা কোথায়? আমি ছিলুম ব্রহ্মচর্য বিমুখ। একই কারণে গান্ধীজীর সঙ্গেও মতবিরোধ। বৈধব্যসাধনে যে স্বরাজ সে আমার নয়।

॥ দুই ॥

'তোমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে তিনিই হতেন বরকর্তা। খুশি হয়েই হতেন।' সেদিন মাস্টারমশায় আমাকে অবাক করে দেন।

'কিন্তু আমি যতদূর জানি তিনি আমার বিয়েতেই আন্তরিক সুখী হননি, যদিও তাঁর বৌমাকে পরে গ্রহণ করেছিলেন।' আমি মুখ ফুটে বলি।

'ওটা তোমার ভুল ধারণা, চারু।' তিনি মৃদু হেসে তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলেন, 'কত বড়ো একটা ভুল ধারণা এতকাল ধরে পোষণ করছ তুমি! তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে আমার অনেকবার কথা হয়েছিল। তোমার বিবাহ তিনি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বৌমাকে তো তিনি মেয়ের মতোই ভালোবাসতেন। তাঁর মনে কেবল এই একটি আশঙ্কা ছিল যে তোমাদের ছেলেমেয়েদের হিন্দু-সমাজে বিয়ে হবে না। বেঁচে থাকলে দেখে যেতেন তাও কেমন করে সম্ভব হলো। অন্তত তাঁর বড়ো নাতির বেলা।'

'হ্যাঁ, এ নিয়ে তাঁর মনে একটা সত্যিকার দুর্ভাবনা ছিল। ধর্মগত কারণে নয়, বর্ণগত কারণে নয়, দেশগত কারণে নয়, আমার বিয়েতে তাঁর একটিমাত্র কারণে আপত্তি ছিল। 'তোদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হবে কোন্ সমাজে?'

মাস্টারমশায় বলেন, 'শেষের দিকে লক্ষ করেছি তিনি তোমার বিয়েতে সম্পুর্ণ সুখী হয়েছিলেন। তাঁর নাতিরা তাঁর বংশরক্ষা করেছে এতেই তাঁর আনন্দ। ভগবান তাদের বাঁচিয়ে রাখুন, এই তাঁর প্রার্থনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই চির আশীর্বাদ, কৃষ্ণে মতি হোক।'

আমি জানতুম না যে বাবা আমাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছিলেন। কাজটা তো হয়েছিল বিদ্রোহীর মতো। তাঁর মানা না মেনে আত্মীয়স্বজনদের কোনো খবর না দিয়ে। তাদের যোগদানের একটা সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে। পরে আমরা গিয়ে তাঁর পায়ে প্রণাম করেছি, তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি, তাঁর সঙ্গে থেকেছি, তিনিও থেকেছেন আমাদের সঙ্গে, তবু আমি কখনো তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিনি, তিনি কি সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট? মাস্টারমশায়ের কাছে শুনতে পাওয়া যেত, যদি দেখা হতো। যে কারণেই হোক সাক্ষাৎ ঘটেনি। আমার বদলির চাকরি। কদাচ কখনো ছুটি পেলে বাবার সঙ্গে দু'চারদিন কাটিয়ে আসি। মাস্টারমশায়ের খোঁজ নেবার আগেই আমার ছুটি ফুরিয়ে যায়।

'কিন্তু তাঁর মনে অন্য একটা কারণে অশান্তি ছিল, চারু। সেটা পারিবারিক বা সামাজিক কারণ নয়। কারণটা আধ্যাত্মিক।' মাস্টারমশায় আমাকে সংবাদ দেন। এই প্রথম সংবাদ।

'কেন অশান্তি কেন?' আমি বিস্মিত হই।

'হবে না? তুমি নিজে বাপ হয়েছ, বছর কয় বাদে ঠাকুরদা হবে। তুমি কি বোঝ না যে সন্তানকে পিতামাতা যা দিয়ে যান তা কেবল দেহ নয়, প্রাণ নয়, তা গভীরতম বিশ্বাস, নিগূঢ়তম সত্য? তোমার বাবা যখন বলতেন, কৃষ্ণে মতি হোক, তখন তিনি আশা করতেন যে তাঁর জীবনের পরম উপলব্ধি তোমার জীবনেও প্রবাহিত হবে। কৃষ্ণ না হয়ে ঈশ্বর হলেও তার মনে লাগত না, কিন্তু তুমি যখন বিদেশ থেকে ফিরে এলে তখন তোমার বন্ধুদের মুখে তিনি শুনলেন যে তুমি তোমার ঈশ্বরবিশ্বাস হারিয়ে এসেছ। তুমি নাকি

সংশয়বাদী। ঈশ্বর আছেন কি না এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত নও। এটা তো ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের মতো কথা নয়। তিনি আঘাত পান। আমাকে বলেন সূর্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তো কারো সংশয় নেই। যত সংশয় ঈশ্বরকে নিয়ে। বছর কয়েক বাদে তোমার বন্ধুদের মুখে আবার শুনতে পান, তুমি নাকি নিঃসংশয় যে জগৎ সত্য ব্রহ্ম মায়া। এ যে এক উল্টো বেদান্ত! এতে তিনি আরো আঘাত পান। কে যেন ওঁর কানে তোলে যে তুমি নাকি মার্কসবাদী হতে চলেছ। মার্কসবাদীরা নাকি কালাপাহাড়ের চেয়েও খারাপ। কালাপাহাড় ধ্বংস করেছিল মূর্তি। এরা নাকি ধর্ম জিনিসটাকেই ধ্বংস করতে চায়। বলে, ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম। শেষ বয়সে তোমার বাবাও তো আফিম ধরেছিলেন। ওষুধ হিসাবে। এসব শুনে তিনি রীতিমতো শক পান।' মাস্টারমশায় টিপে টিপে হাসেন।

'এই কথা! এর জন্যেই অশান্তি!' আমি তো অবাক।

'হবে না? তুমি নিজেই একদিন বুঝবে। ঈশ্বর না থাকলে আলো নিবে যায়। মানুষ অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ায়। জল শুকিয়ে যায়। মানুষ মাছের মতো ছটফট করে। তোমার বাবা তোমার জন্যে কাঁদতেন। বলতেন, এ কী হলো হেমেনবাবু! ও ছেলে তো অমন ছিল না। বৌটিও তো ভালো। এই কৃষ্ণময় সংসারে কৃষ্ণ যদি না থাকলেন তো আমি ভালোবাসব কাকে? সব ভালোবাসাই তো তাঁকেই ভালোবাসা। মানুষ যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসতে না পারল তবে কেমন করে তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসবে? সর্বজীবকে ভালোবাসবে কী করে? কৃষ্ণহীন সংসার হচ্ছে প্রেমহীন সংসার। হিংসাই সেখানকার নিয়ম। চারু কি তাহলে কংস হয়ে যাবে! তোমার বাবা এই বলে বিলাপ করতেন।' মাস্টারমশায় হাসি চাপেন।

আমি অতীতের দিকে ফিরে তাকাই। আমার পারিবারিক জীবন সুখের ছিল, তবু আমার অন্তরে সুখ ছিল না। সেটা দেশের ও দুনিয়ার ভাবনা ভেবে। দেশের তরুণতরুণীরা নিয়েছে সন্ত্রাস-

বাদের পথ। বিষে বিষক্ষয় এই নীতি অনুসারে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের অ্যান্টিডোট হয়েছে হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিবাদ। যাতে তৃতীয় পক্ষ রক্ষা পায়। আশ্চর্য হয়ে যাই দেখে যে সন্ত্রাসবাদের সমর্থকরা সাম্প্রদায়িকতাবাদেরও সমর্থক হয়ে ওঠে, তার ফলে সাম্প্রদায়িকতাই সন্ত্রাসবাদের চেয়ে প্রবল হয় ও শাসকদের বাঁচায়। ধন্য ধন্য রাজনীতি! বাংলাদেশটাকে থালায় করে তুলে দেওয়া হলো মুসলমানদের পাতে। ওদিকে ইউরোপে যা ঘটে চলেছে তা আরো চমৎকার! বিষে বিষক্ষয় এই নীতি অনুসারে কমিউনিজমের অ্যান্টিডোট হয়েছে ফাসিজম। যাতে তৃতীয় পক্ষ রক্ষা পায়। যারা ফাসিস্টদের সঙ্গে লড়তে চায় তারা সমর্থন পায় না। পায় কিনা যারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়তে চায়। ধন্য ধন্য রাজনীতি! হিটলার মুসোলিনি একটার পর একটা রাজ্য গ্রাস করে। আমার সহানুভূতি গোড়ায় কমিউনিস্টদের উপর ছিল না। কিন্তু ফাসিস্টরা যে ওদের চেয়েও খারাপ এই প্রত্যয় থেকে আমি কমিউনিস্টদের উপর সহানুভূতি বোধ করি। কই, ওরা তো ঈশ্বরবাদী নয়। কী আসে যায় যদি ওদের উদ্দেশ্য মহৎ হয়? কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ হলে কি সাতখুন মাফ? স্টালিনের সাত হাজার খুনও কি মাফ করতে হবে? দারুণ এক নৈতিক সঙ্কটের ভিতর দিয়ে যেতে হয় আমাকে। একই কালে নিদারুণ আধ্যাত্মিক সংকট। ঈশ্বর থাকলে হিটলার থাকে কী করে? মার্কসবাদীরা তো তাঁর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তাহলে তারা ঈশ্বরভক্ত রাশিয়ানদের হারিয়ে দিল তাড়িয়ে দিল কী করে? কারণ ঈশ্বরভক্তিটা হলো আফিম। ভক্তরা যত সব আফিমখোর। পারবে কেন সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে!

সব ধর্মের সারতত্ত্ব অনুসন্ধান করতে করতে আমি উপনীত হই সব ধর্মের অসারত্বে। বাবা আমাকে ছেলেবেলা থেকেই প্রার্থনা করতে ও ধ্যান করতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বাস থাকলে তো প্রার্থনা করব! ধ্যান করব! বিশ্বাসই হারিয়ে ফেলি। একদিনে নয়, একটু একটু করে। প্রথমে হই সংশয়বাদী, তারপরে

নিরীশ্বরবাদী। প্রথমে বন্ধ করে দিই প্রার্থনা। ভগবানকে বলি, তুমি তো অন্তর্যামী। তুমি জানো আমার প্রার্থনাটা কী। মুখ ফুটে জানাতে হবে কেন? তুমি তো তোমার নিয়মের বাইরে যাবে না। কেন তাহলে তোমাকে বলি পাপতাপ ক্ষমা করতে! কেন বলি এটা দিতে ওটা দিতে? প্রার্থনা বন্ধ করলেও ধ্যানটা ছেড়ে দিই নে। যখন সেটাও বন্ধ করার সময় আসে তখন অতি অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি যে একজন আছেন যাঁর সঙ্গে আমার মরমী সম্পর্ক আর সে সম্পর্কটা অহেতুক।

বাবাকে নিয়মিত চিঠি লিখি। শরীরের সমাচার দিই, কিন্তু মনের সমাচার চেপে রাখি। তাঁর মতো প্রাচীনপন্থীদের বোঝানো যাবে না আধুনিক জগতের ব্যাধিটা কী। আর কেনই বা সে ব্যাধি অহিংসা দিয়ে সারানো যাবে না। কেউটে সাপের সামনে প্রেমের বাঁশি বাজানো নিষ্ফল। সে ছোবল মারবে না এটা দুরাশা। হাতিয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধে নামতেই হবে। আমার সেই নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক সঙ্কট আমাকে দিনরাত দহন করছিল। আমি যে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হচ্ছি এটা আমি কেমন করে তাঁকে বোঝাব? বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হলে ভিতরের তাপটা সঞ্চারিত করে দিই। কিন্তু আমার ভিতরে কি শুধু তাপই ছিল? আলো একেবারে ছিল না? ছিল, কিন্তু অতি অস্পষ্ট। ছিল বলেই আমি ঠিক নিরীশ্বরবাদী ছিলুম না। ছিলুম না মার্কসবাদীও। উদ্দেশ্য আর উপায় নিয়ে যে তর্ক তাতে কমিউনিস্টদের সঙ্গে আমি একমত ছিলুম না। যেমন ছিলুম না সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গেও। ইংরেজ আমার চোখে মূর্তিমান সাম্রাজ্যবাদ নয়, আমারই মতো একটা জীবন্ত মানুষ। তেমনি জমিদার বা পুঁজিপতি আমার চোখে মূর্তিমান ফিউডালিজম বা ক্যাপিটালিজম নয়। আমারই মতো একজন জীবন্ত মানুষ। মানুষের সামনে দাঁড়ালে আমি কিছুতেই ভাবতে পারিনে যে, এ মানুষ নয়, কেউটে সাপ। একে প্রেমের বাঁশি বাজিয়ে ভোলানো যাবে না। একে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে হবে।

এক এক সময় মনে হতো বৃহত্তর সংসারের প্রতি আমার কী যেন একটা কর্তব্য আছে। সিদ্ধার্থের মতো আমার সুখের সংসার ফেলে গৃহত্যাগ করা উচিত। কিন্তু তা যদি করি তবে আমার স্ত্রীর, আমার শিশুদের ভার কার উপর দিয়ে যাব? বাবার উপরে? যাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। যাঁর স্বাস্থ্য ভালো নয়। সিদ্ধার্থের তো সে ভাবনা ছিল না। আমার ছিল। যদিও আমার স্ত্রী আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তোমার সিদ্ধান্তে আমি বাধা দেব না।

'প্রাচীনপন্থীদের প্রতি তোমার মনোভাব অসঙ্গত ছিল, চারু।' আমার নিজের জবানীতে আমার অতীতকাহিনী শুনে মাস্টারমশায় বলেন, 'ওঁরা জানতেন যে, মানুষের বহনের অসাধ্য যে ভার সে ভার বিধাতার। যেটুকু তুমি বইতে পারো সেইটুকুই তোমার। তুমি যে ভিতরে ভিতরে দেশের জন্যে বা দুনিয়ার জন্যে জ্বলছ এটা আমরা জানব কেমন করে? জানতুম এই পর্যন্ত যে তুমি ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ে মার্কসের উপর সে বিশ্বাস পাত্রান্তরিত করেছ। তোমার বাবা শুনে অশান্ত হতেন। বলতেন, রাহুলকে বুদ্ধ কী দিয়ে যান! কেবল দেহ নয় প্রাণ নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি তাঁর বোধি। তেমনি চারুকে আমি দিয়ে যেতে চেয়েছি আমার জীবনের সার সত্য, আমার কৃষ্ণে প্রীতি ও জীবে দয়া। ওর বয়সে আমিও তো জীবহিংসা করেছি, মাছ মাংস খেয়েছি। একদিন এককথায় ছেড়ে দিই। যেদিন আমার বাবাকে হারাই। কৃষ্ণকে ভালোবাসলে কৃষ্ণের জীবকেও দয়া করতে হয়। একটা মাছিকেও মারিনে, একটা পিঁপড়েকেও বাঁচিয়ে দিই। দেখলে তো চারু। বুদ্ধের করুণা কেমন করে বৈষ্ণবের জীবে দয়ায় পরিণত হয়েছে। বৈষ্ণব হলেও বাঙালীরা ভিতরে ভিতরে বৌদ্ধ রয়ে গেছে।'

'বাবা আর কী বলেছিলেন, স্যার। আমি বাবার কথাই শুনতে চাই।'

'বাবা বলেছিলেন, কৃষ্ণকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে যদি ভালোবাসতে না পারো তবে তোমার বিদ্যা, তোমার বুদ্ধি, তোমার তর্ক, তোমার যুক্তি

কোনখানেই তোমাকে নিয়ে যাবে না। হিংসা তো নয়ই। ভালোবাসতে পারা চাই। বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা। এখানে যার কথা বলা হচ্ছে তিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নন। তোমার যদি নন্দলালার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস না থাকে তবে তুমি বলতে পারো বিনা প্রেমসে না মিলে পরমাত্মা। না তাতেও তোমার আপত্তি?' মাস্টারমশায় শুধান।

'না, স্যার, পরমাত্মায় আমার আপত্তি নেই। ইতিমধ্যে আমার বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি।' আমি উত্তর দিই। 'কিন্তু যখনকার কথা হচ্ছে তখন পরমাত্মাও মানতুম না। আমার আত্মা আছে আর সে আত্মা শরীরের বিনাশের পরেও যে অবিনশ্বর এসব আমার কাছে মনে হত মিথ্যা মায়া। কিন্তু পুত্রশোকের অনলের আভায় দেখি মায়া যাকে ভাবছি তাই সত্য। তারপর একালের সভ্য মানুষদের কাণ্ডকারখানার সাক্ষী হই সারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জুড়ে। একপ্রকার মোহভঙ্গ থেকে জন্মেছিল ঈশ্বরে অবিশ্বাস, আরেক প্রকার মোহভঙ্গ থেকে জন্মায় ঈশ্বরে বিশ্বাস। এতদিনে আমি বাবার কাছাকাছি এসেছি। তাই বাবার শেষ বয়সের কথা শুনতে এত ভালো লাগছে। আহা, সে সময় যদি শুনতে পেতুম! তা হলে হয়তো ওঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যেত।

'তোমার হয়ে আমিও ওঁকে বুঝিয়েছি, চারু, যে তুমি সত্যিকার নিরীশ্বরবাদী নও। সংশয়বাদীও নও। মানুষকে ভালোবাসো। মানুষকে যে ভালোবাসে সে তার অন্তরে স্থিত ভগবানকেও ভালোবাসে। কেউ ভগবানকে ভালোবাসতে বাসতে মানুষকে ভালোবাসে, কেউ মানুষকে ভালোবাসতে বাসতে ভগবানকে। হরে দরে একই কথা নয় কি? তোমার বাবা শান্ত হন। বলেন, নিরীশ্বরবাদও ঈশ্বরবাদ যদি প্রেম থাকে অনির্বাণ। চারুর ভিতরে যে আগুন জ্বলছে সে আগুন যদি প্রেমের আগুন হয় তবে আর ভাবনা কিসের! প্রেমই ওকে দগ্ধ করতে শেখাবে যে প্রেমময় বলে একজন আছেন। তিনি থাকতে এ জগৎ প্রেমহীন নয়। সব অন্যায়ের প্রতিকার প্রেম দিয়ে

হবে। চারুকে বলবেন একথা।' মাস্টারমশায় আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান।

'তাহলে শান্তিতেই ওঁর জীবনাবসান হয়।' আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

'শান্তিতেই ওঁর জীবনাবসান হয়।' তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন।

'পুত্রের বিরুদ্ধে পিতার আর কোন ক্ষোভ থাকে না?' আমি নিশ্চয়তা চাই।'

'আর কোন ক্ষোভ বা খেদ থাকে না তাঁর।' তিনি আশ্বাস দেন।

আমি ধন্যবাদ দিই মনে মনে ভগবানকে ও মুখ ফুটে মাস্টারমশায়কে।

'যাক, তোমার বাবার বার্তা আমি বিশ বছর ধরে বহন করে এনে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে খালাস হলুম আজ। এখন বল তোমার কোনো বার্তা আছে কি না, যা বয়ে নিয়ে গিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারি। আমি তোমাদের দুজনের মাঝখানে বার্তাবহ। এই আমার ভূমিকা।' তিনি সকৌতুকে বলেন।

'ও কী বলছেন, স্যার।' আমি থতমত খেয়ে বলি, 'বাবাকে আপনি পাবেন কোথায় যে ওঁর কাছে পৌঁছে দেবেন আমার বার্তা?'

এবার তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, 'কেন? পরলোকে। চারুশীল, আমারও তো দিন ফুরিয়ে এল। তাই আমি তোমার মতো প্রিয়-শিষ্যদের সঙ্গে একে একে দেখা করে বিদায় নিচ্ছি। এ জন্মে এই হয়তো শেষ দেখা।'

মনটা বিষাদে ভরে যায়। বলি, 'স্যার, আমি আপনার শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করি। তার আগে যদি আপনি যান ও বার্তা যদি আপনার সঙ্গে যায় তা হলে এই বার্তাই আমি এপার থেকে ওপারে পাঠাতে চাই যে, এ জগৎ যাঁর দেহ তিনি পরমাত্মা। পরমাত্মার সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক অমৃতের সঙ্গে অমৃতের পুত্রের। তাঁর

পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে নেওয়া, তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে নেওয়া, তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টি মিলিয়ে নেওয়া, এই আমার ধর্ম ও এই আমার কর্ম। মেলাতে পারা কিন্তু সহজ নয়, স্যার। কোনটা যে তাঁর ইচ্ছা আর কোনটা নয় কেমন করে জানব?'

মাস্টারমশায় মুচকি হেসে বলেন, 'বড়ো কঠিন প্রশ্ন। আজ আসি। আমার আশীর্বাদ রইল। জানিয়ো তোমার ছেলে বৌমাকে। আর আমার বৌমাকে। জীবন মধুময় হোক তোমদের সকলের।'

সমাপ্ত